প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬০
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ মার্চ ১৯৮৩

বঙ্গানুবাদ ঃ কালিদাস শিকদার

সম্পাদনা ঃ সুনীল মিত্র

প্রকাশক ঃ মনি সান্যাল
মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিঃ
৫৪ এ, হরি ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মুদ্রক ঃ সারদা প্রিন্টার্স
১৪এ, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,
কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

মুখবন্ধ ১

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

দর্শন, তার বিষয়বস্তু ও অন্যান্য বিজ্ঞানের মধ্যে এর স্থান ৭

১ দর্শনের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত ধারণার বিকাশ ১০
২ দর্শনের মৌল প্রশ্ন ১৩
৩ ডায়ালেকটিকস ও অধিবিদ্যা ২১
৪ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের বিষয়বস্তু ও অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্ক ২৩
৫ দর্শনে পক্ষাবলম্বন ২৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

মার্কসীয় দর্শনের উৎপত্তি ও বিকাশ

১ মার্কসবাদ উৎপত্তির সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পূর্বাবস্থা ৩৫
২ ডায়ালেকটিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বগত উৎস ৩৭
৩ মার্কসীয় দর্শন ও উনিশ শতকের মধ্যভাগের বিরাট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ৪০
৪ ডায়ালেকটিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ দর্শনে বিপ্লব এনেছে ৪৩
৫ লেনিনের হাতে মার্কসীয় দর্শনের বিকাশ ৫০

ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ

তৃতীয় অধ্যায়

বস্তু ও তার স্থিতির মৌলিক রূপ

১ বস্তু সম্বন্ধে দার্শনিক ধারণা ৫৯
২ গতি ও তার মূল রূপ ৬৭
৩ দেশ ও কাল ৭১
৪ জগতের ঐক্য ৮০

চতুর্থ অধ্যায়

চেতনা—উন্নত ধরনে সংগঠিত বস্তুর ধর্ম

১ চেতনা : মানব-মস্তিষ্কের ক্রিয়া ৮৫
২ চেতনা—বস্তুজগতের মানসিক প্রতিবিম্বনের উচ্চতম রূপ ৮৮
৩ প্রতিবিম্ব রূপের বিকাশ ৯৬
৪ চেতনা ও বাক্‌শক্তি—তাদের উৎপত্তি ও আন্তঃসম্পর্ক ৯৯
৫ চিন্তার প্রতিরূপ গঠন ১০৩

পঞ্চম অধ্যায়

বিকাশের সার্বিক ডায়ালেকটিক নিয়ম

১ সার্বিক সম্পর্ক ও বিকাশের বিজ্ঞান হিসেবে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস ১০৭
২ পরিমাণগত থেকে গুণগত পরিবর্তন এবং এর বিপরীত নিয়ম ১১২
৩ বিপরীত ঐক্য ও সংঘাতের নিয়ম ১২১
৪ নেতিকরণের নেতিকরণ নিয়ম ১৩১

ষষ্ঠ অধ্যায়

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস-এর মৌলিক প্রত্যয়

১ ডায়ালেকটিকস-এর মৌলিক প্রত্যয়গুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য ১৩৯
২ স্বতন্ত্র, বিশেষ ও সার্বিক ১৪২
৩ কারণ ও কার্য ১৪৭
৪ আবশ্যকতা ও আকস্মিকতা ১৫৪
৫ সম্ভাবনা ও সত্তা ১৫৯
৬ আধেয় ও রূপ ১৬২
৭ মর্ম ও বাহ্যরূপ ১৬৬

সপ্তম অধ্যায়

মানব-জ্ঞানের প্রকৃতি

১ বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞানতত্ত্ব ১৭০
২ জ্ঞাতা ও বিষয় ১৭৪
৩ প্রয়োগ। জ্ঞানের সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রকৃতি ১৭৭
৪ জ্ঞান : বাস্তবতার বৌদ্ধিক অন্তীকরণ। প্রতিবিম্ব সূত্র ১৭৯
৫ ভাষা জ্ঞানের অস্তিত্বের রূপ ; সংকেত ও অর্থ ১৮২
৬ বিষয়গত সত্য ১৮৬
৭ সত্যজ্ঞানের নির্ণায়ক ১৯১

অষ্টম অধ্যায়

জ্ঞান-প্রক্রিয়ার ডায়ালেকটিকস

১ জ্ঞান ঃ যৌক্তিকতা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার ঐক্য ১৯৫
২ জ্ঞানের স্তর ঃ অভিজ্ঞতাজাত ও তত্ত্বগত, বিমূর্ত ও মূর্ত বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের ঐক্য ১৯৯
৩ ঐতিহাসিক ও যৌক্তিক চিন্তার দ্বারা বিষয়ের প্রতিচ্ছবি সৃষ্টির রূপ ২০৫
৪ ডায়ালেকটিকস ও আকারগত তর্কবিদ্যা ২১১
৫ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের গঠন ও বিকাশ। স্বজ্ঞা ২১৩
৬ জ্ঞানের বাস্তব রূপায়ণ ২১৮
৭ জ্ঞান ও মূল্য ২২১

নবম অধ্যায়

বৈজ্ঞানিক গবেষণার পদ্ধতি ও উপায়

১ গবেষণার পদ্ধতিগত ধারণা ২২২
২ অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞানলাভের পদ্ধতি ২২৭
৩ জ্ঞান-বিকাশের পদ্ধতি ২২৯

———

প্রথম ভাগ

মুখবন্ধ

আমরা একটা গতিশীল যুগে বাস করছি। এ যুগ সমাজবিপ্লব ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যুগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় দ্রুত প্রগতির যুগ। সমাজ-জীবনে গভীর পরিবর্তন পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম—এই দুই বিশ্ব-ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রাম, কমিউনিজম-বিরোধিতা, সংশোধনবাদ সমেত বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম, আমাদের মতাদর্শগত বিশ্বাস, আমাদের দার্শনিক সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার উপর আরো বেশী বেশী করে দাবী উপস্থিত করছে। এই কারণেই মার্কসীয় দর্শন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা।

একশ বছরেরও আগে মার্কসীয় দর্শন—ডায়ালেকটিকস ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ জন্ম নিয়েছে। এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন মার্কস ও এঙ্গেলস। ইতিহাসের এক নতুন পর্বের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেনিন এই দর্শনকে আরো বিকশিত করেন। তখন থেকেই এই দর্শন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নামে সুপরিচিত।

ডায়ালেকটিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এর দার্শনিক ভিত্তি। এই মতবাদ হচ্ছে সৃজনশীল, বিপ্লবী মতবাদ। এই মতবাদ ক্রমাগত সমৃদ্ধ হচ্ছে ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার দ্বারা পরীক্ষিত হচ্ছে। এই দর্শন মতান্ধতার বিরোধী এবং বিশ্ব-ইতিহাসে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানে যেসব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হচ্ছে তার সামান্যীকরণের ভিত্তিতে এর ক্রমবিকাশ ঘটছে।

লেনিনের নীতি অনুসরণ করে, বিশ্ব-কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন সমসাময়িক সমাজবিকাশে, শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তির বিপ্লবী অভিজ্ঞতায় যা কিছু মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ তা সবই সঞ্চয় করে। এই অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজম নির্মাণের অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতান্ত্রিক গঠনকর্মের অভিজ্ঞতা কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর তত্ত্বগত কর্মে প্রতিফলিত হয়। এইসব তত্ত্বগত কর্ম এক গভীর দার্শনিক ও সমাজতত্ত্বগত বাণী বহন করে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের মৌলিক প্রশ্ন ও এর প্রধান প্রধান ভাব-ধারার ব্যাখ্যা ছাড়াও, এই গ্রন্থের রচয়িতারা বুর্জোয়া দর্শনের ভাবধারাগুলো বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করতে চেষ্টা করেছেন। সংগ্রামী বস্তুবাদ ও বিপ্লবী

ডায়ালেকটিকস হচ্ছে দর্শনের ক্ষেত্রে বিষয়মুখিতা ও বৈজ্ঞানিকতার সর্বোচ্চ রূপ। ফলে, ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে, দর্শন ও সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে, কমিউনিস্ট ও বুর্জোয়া মতাদর্শের মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদরেখা "মুছে" দেওয়ার জন্যে শোধনবাদী দার্শনিকদের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রাম হচ্ছে আমাদের কাছে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্মত দর্শনের জন্যে যুগপৎ সংগ্রাম।

এই গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে লেখকরা ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে প্রকাশিত "দি ফান্ডামেণ্টালস অব মার্কসিস্ট ফিলসফি" গ্রন্থের নির্দেশগুলো ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে, তা বিচার-বিবেচনা করার চেষ্টা করেছেন। এই বইটি প্রায় ২০ লক্ষ কপি ছাপা হয়েছিল। এটা বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। গ্রন্থটি সম্পর্কে পত্র-পত্রিকা ও শিক্ষকমহলে অনুকূল সাড়া পাওয়া গিয়েছে। এর মৌলিক সূত্রগুলোর তাৎপর্য এখনো আছে। কিন্তু ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশে মার্কসবাদী দার্শনিক চিন্তা ক্রমাগত বিকশিত ও সমৃদ্ধ হচ্ছে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের অধিকতর বিকাশ ও শিক্ষার প্রয়োজনে বিষয়বস্তু ও আকারের দিক থেকে পূর্ববর্তী বইটিকে সংশোধন ও উন্নত করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এই সঙ্গে "দি ফান্ডামেণ্টালস অব মার্কসিস্ট ফিলসফি" ও এই নতুন বইটির লেখকদের তত্ত্বগত সংস্থানের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা আছে।

এই নতুন বইটির প্রথম খসড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের উচ্চতর শিক্ষা সংস্থাগুলোর দর্শন বিভাগে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। বইটি সাধারণভাবে গৃহীত হলেও এর কিছু কিছু অধ্যায় সম্পর্কে সমালোচনামূলক মতামত দেওয়া হয়েছে এবং গঠনমূলক প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। এইসব মতামত ও প্রস্তাব থেকে লেখকরা বইটি সম্পর্কে শিক্ষা নিয়েছেন।

সালের প্রথম দিকে প্রকাশিত "দি ফান্ডামেণ্টালস্ অব মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট ফিলসফি" এখন আর ছাপানো নেই। দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রস্তুত করার সময় রচয়িতারা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্বিংশতিতম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন। চতুর্বিংশতিতম কংগ্রেসের এইসব সিদ্ধান্ত হচ্ছে মার্কসবাদী লেনিনবাদী তত্ত্বের সৃজনশীল বিকাশ এবং সমকালীন পরিস্থিতিতে এর প্রয়োগ। দ্বিতীয় সংস্করণে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠকদের ইচ্ছা, মন্তব্য ও মতামতগুলো গণ্য করা হয়েছে। যাঁরা প্রথম খসড়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন ও তাঁদের সাহায্য করেছেন এবং যেসব কমরেড এই বইয়ের উপর মন্তব্য করেছেন ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের প্রতি এই বইয়ের লেখকরা কৃতজ্ঞ।

বইটির গ্রন্থনায় যে বৈজ্ঞানিক ও সাংগঠনিক কাজ করতে হয়েছে, তার দায়িত্ব পালন করেছেন ফিলসফিক্যাল সায়েন্সের ক্যান্ডিডেট, ভি. এ. ম্যালিনিন। এন. এ. সরোকোমাস্কায়া, ভি. এন. ইয়েরমোলেয়েভা ও টি. ই. ল্যাটিনস্কায়া বিজ্ঞানের দিকটি সম্পাদনা করেছেন।

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

দর্শন, তার বিষয়বস্তু ও অন্যান্য বিজ্ঞানের মধ্যে এর স্থান

দর্শন, অর্থশাস্ত্র ও বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের তত্ত্ব—মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এই তিনটি শাখার সমন্বয়ে গঠিত একটি পুরোপুরি সুসংহত মতবাদ। এই তিনটি শাখার মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক আছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শন—ডায়ালেকটিক (দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী) বস্তুবাদ এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ—মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষার সাধারণ তত্ত্বগত ভিত্তি।

মার্কসবাদ লেনিনবাদের সুসংহতি, সমগ্রতা, অখণ্ডনীয় যুক্তি এবং সঙ্গতি-পূর্ণতা—যাকে এর বিরোধীরাও স্বীকার করে, তা অর্জিত হয়েছে ঐক্যবদ্ধ দার্শনিক ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা। মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে তার দর্শনগত ভিত্তি ছাড়া যথাযথভাবে বোঝা যেতে পারে না।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শন বিশ্বের দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশের ফল ও উচ্চতম পর্যায়। কয়েক শতাব্দী ধরে দর্শনের বিকাশে যা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল, এ তাকে আত্তীকরণ করেছে। এই সঙ্গে এই মতবাদের উদ্ভব দর্শনে একটা গুণগত উৎক্রান্তি, একটা বৈপ্লবিক আলোড়নের সূচনা করে। নবীন বিপ্লবী শ্রেণী হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর মহান ব্রত বুর্জোয়া শাসনের উচ্ছেদ, পুঁজিবাদের উচ্ছেদ এবং নতুন কমিউনিস্ট সমাজ গঠন। আজ পর্যন্ত জগৎ যা দেখেছে তার মধ্যে এটা সবচেয়ে অগ্রগামী এবং ন্যায়পরায়ণ সমাজ। এই শ্রেণীর বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে মার্কস ও এঙ্গেলসের সৃষ্টি মার্কসীয় দর্শনের কাজ শুধু জগৎ সম্বন্ধে একটা যথাযথ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়াই নয়, অধিকন্তু এর রূপান্তরের জন্যে একটি তত্ত্বগত হাতিয়ার হিসেবে সাহায্য করাও।

বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার দ্রুত অগ্রগমনের এই বর্তমান যুগে কিছু লোক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্বশাসিত শাখা হিসেবে দর্শনের অস্তিত্বের অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। দর্শনের এই বিরোধীরা বলেন যে একসময়, প্রাচীন জগতে দর্শন ছিল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান, কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের

বিশিষ্ট শাখাগুলো ঐতিহাসিকভাবে দর্শন থেকেই উদ্ভূত হয়ে স্বতন্ত্র হয়ে যায় এবং স্বাধীনভাবেই বিকশিত হতে আরম্ভ করে। দর্শন সেক্সপীয়ারের রাজা লীয়ারের অবস্থায় নিজেকে দেখে—যিনি বৃদ্ধ বয়সে তাঁর রাজ্য কন্যাকে দিয়ে দিয়েছিলেন এবং তারপর একটা ভিক্ষুকের মত রাস্তায় বিতাড়িত হয়েছিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দর্শন সম্বন্ধে এই মনোভাব ভ্রান্ত। মার্কসবাদ লেনিনবাদে দর্শন ন্যায়সঙ্গতভাবেই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ব্যাপক ক্ষেত্রে, প্রকৃতি ও সমাজ সম্বন্ধে বিজ্ঞানগুলোর সন্নিবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে নিজের বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

এমন অনেক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে যা বিজ্ঞানের কোনো বিশেষ শাখার দ্বারা বিবেচিত হয় না। আমাদের চারিদিকের জগতের মর্মগত বৈশিষ্ট্য কী? অথবা অন্যভাবে বললে, প্রকৃতি ও চিৎ শক্তির মধ্যে, বস্তু ও চৈতন্যের সম্পর্ক কী? মানুষ কী এবং জগতে তার স্থানই বা কোথায়? সে কি জগৎকে জানবার ও পরিবর্তন করবার সামর্থ্য রাখে এবং তাই যদি হয়, কেমন করে তা করতে হবে? এইগুলো এবং আরও অনেক ঐ ধরনের প্রশ্ন সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে গভীরভাবে বিবেচনার বিষয়। স্মরণাতীতকাল থেকে মানুষ এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার জন্যে একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেছে; এইসব নিয়েই গড়ে উঠেছে দর্শনের বিষয়বস্তু।

দর্শন একটা বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি। এর একটা স্বকীয় বিশেষ রূপ ও বিষয়বস্তু রয়েছে। এ এমন একটা বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি যার থেকে এর নীতি ও সিদ্ধান্তের তত্ত্বগত ভিত্তি বেরিয়ে আসে। অবৈজ্ঞানিক, ধর্মীয় বিশ্বদৃষ্টি, যা অতিপ্রাকৃত শক্তির উপর আস্থার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং কল্পনা ও ভাবাবেগের ভেল্কিতে গড়া রূপে বাস্তব জগৎকে প্রকাশ করে, তা থেকে এইটিই দর্শনকে পৃথক করে। দার্শনিক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি হল জগৎ, প্রস্তুতি, সমাজ ও মানুষ সম্বন্ধে একটা ব্যাপক ধরনের সামান্যীকৃত তত্ত্বগত প্রস্থান। দর্শন সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, নান্দনিক এবং জীবনের অন্যান্য দিক সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট অভিমুখিতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

প্রত্যেকেই তার চার পাশের জগৎ সম্বন্ধে নিজের বিশেষ মত গঠন করে, কিন্তু এই মত প্রায়ই কোনরকম তত্ত্বগত ভিত্তি ছাড়াই নানারকম বিপরীত ধ্যান ধারণার খণ্ড-ছিন্ন অংশ নিয়ে গড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিকে দার্শনিক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতি, মানুষ ও জগতে তার স্থান সম্বন্ধে নিছক কতকগুলো ভাব, মত ও ধারণার সমষ্টি নয় বরং কতকগুলো ধ্যানধারণার বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা। এই বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি কেবল তার নীতিগুলোকে ঘোষণা করে মানুষকে সেগুলো বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করে না, এই নীতিগুলোর পক্ষে হেতুবাদী যুক্তি প্রদর্শন করে থাকে।

তবে কোন মতেই তত্ত্বগতভাবে সমর্থিত সকলবিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গিই বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নয়। দার্শনিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত মর্মবস্তু বৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক অথবা বিজ্ঞান-বিরোধীও হতে আরে। কেবলমাত্র যে বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি সমকালীন বিজ্ঞানের লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে তার সিদ্ধান্ত টানে, চিন্তাধারায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং নানা ধরনের বিজ্ঞান-বিরোধী রহস্যময়, ধর্মীয় মত ও কুসংস্কারকে স্থান দেয় না, তাকেই বিজ্ঞানসম্মত বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। অবশ্য বৈজ্ঞানিকতার ধারণাটিকেই ঐতিহাসিক ভাবে বিবেচনা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী বস্তু-বাদীদের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বৈজ্ঞানিক কারণ তাঁদের শিক্ষার মধ্যে পরিবর্তন শীল উপাদানের অতিরিক্ত আরও কিছু উপাদান ছিল যা ঐতিহাসিকভাবে অপরিবর্তনীয় বলে প্রমাণিত হয় এবং সেইটিই আধুনিক বস্তুবাদ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। ভাববাদী দার্শনিক মতবাদীদের প্রস্থানের (যেমন দেকার্ত, লিবনিজ, কাণ্ট, ফিক্টে ও হেগেল) মধ্যেও বৈজ্ঞানিক ভাবধারা ও প্রস্তাবনা ততটাই ছিল যতটা তাঁরা প্রকৃত সম্পর্ক ও সংযোগ সম্বন্ধে সঠিকভাবে ধরতে পেরেছিলেন।

ডায়ালেকটিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল একটা বিজ্ঞানসম্মত দার্শনিক বিশ্ববীক্ষা যা আধুনিক বিজ্ঞানের সাফল্য ও উন্নত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং সেগুলোর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধ হচ্ছে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের বিষয়বস্তু ও তাৎপর্য এবং পূর্ববর্তী দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়, সে সম্বন্ধে উন্নততর ধারণা পেতে হলে দর্শনকে জ্ঞানের একটি বিশেষ রূপ হিসেবে সযত্নে অনুধাবন করতে হবে।

———

১. দর্শনের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত ধারণার বিকাশ

মানুষের আত্মিক জীবন সকল দিকের বিকাশ এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের চিন্তাধারার বিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে দর্শনের বিষয়বস্তুও ঐতিহাসিক ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। "ফিলসফি" (Philosophy) (দর্শন) শব্দটি সৃষ্টি করেছিলেন প্রাচীন গ্রীকরা। এটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা হয় দুটি গ্রীক শব্দ থেকে : Phile (প্রেম) ও Sophia (প্রজ্ঞা)। তাই আক্ষরিক অর্থে দর্শন হল প্রজ্ঞার জন্যে প্রেম। একটা গল্প আছে যে গ্রীক ঋষিদের মধ্যে একজন জ্ঞানী বলে সম্বোধিত হ'তে ইচ্ছুক না হওয়ায় পীড়াপীড়ি করে বললেন যে তিনি জ্ঞানী মানুষ নন্, শুধু প্রজ্ঞাপ্রেমিক অর্থাৎ একজন দার্শনিক (Philosopher)।

কিন্তু যে বৈজ্ঞানিক ধারণাকে ঐ শব্দটি প্রকাশ করছে তার সারমর্মকে প্রকাশ করতে শব্দটির ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করাটাই যথেষ্ট নয়।

প্রাচীন ভারত, চীন ও মিশরে সভ্যতার সূচনাকালে দর্শনের আবির্ভাব হয় কিন্তু প্রথম এটি ধ্রুপদী রূপ পায় প্রাচীন গ্রীসে।

সবচেয়ে প্রাচীন যে বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি দর্শনের ঠিক আগেই ছিল সেটা হল ধর্ম অথবা আরও যথাযথভাবে বললে, পৌরাণিক কাহিনী—বাস্তবতার একটা কাল্পনিক প্রতিবিম্ব ; এটা উদয় হয়েছিল আদিম মানুষের মনে, যারা চারদিকের প্রকৃতিকে প্রাণময় সত্তার অধিকারী বলে মনে করত। কল্পিত আত্মা ও দেবদেবীর উপর আস্থাযুক্ত পৌরাণিক কাহিনীতে জগতের উৎপত্তি ও স্বরূপ সংক্রান্ত প্রশ্নে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হত। দর্শনের জন্ম হল পৌরাণিক কাহিনীসিক্ত ধর্মীয় চেতনার মধ্যে থেকে, আবার তারই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে এবং এইভাবেই সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই জগৎ সম্বন্ধে একটা যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা রূপ লাভ করল।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সূত্রপাত ও তত্ত্বগত অনুসন্ধানের প্রয়োজনের সঙ্গে দর্শনের উৎপত্তি ঐতিহাসিকভাবে মিলে যায়। বাস্তবে, দর্শনই তত্ত্বগত জ্ঞানের প্রথম ঐতিহাসিক রূপ। জগৎ সম্বন্ধে ধর্মীয়-পৌরাণিকী মত যে সমস্ত প্রশ্ন ইতিপূর্বে উপস্থাপিত করেছিল প্রথমে দর্শন তার উত্তর দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই সমস্ত প্রশ্ন বিচারের ক্ষেত্রে দর্শনের পথ ছিল ভিন্ন। এর ভিত্তি ছিল ন্যায়শাস্ত্র ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তত্ত্বগত বিশ্লেষণ।

আদি গ্রীক দার্শনিকরা (থেলস্, এনাক্সিমেনেস, এনাক্সিমেন্ডার, পারমেনাইডেস্, হেরাক্লিটাস ও অন্যেরা) প্রধানতঃ প্রকৃতির বিভিন্ন পরিদৃশ্যমান ঘটনাবলীর উৎপত্তির উপলব্ধিতেই আগ্রহী ছিলেন। প্রাকৃতিক দর্শনই (প্রকৃতি সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদ) দার্শনিক চিন্তাধারার প্রথম ঐতিহাসিক রূপ।

বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সঞ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং চিন্তাবিদরা গবেষণার বিশেষ পদ্ধতি এবং প্রকৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান নিয়মগুলোর ধারণাকে বিকশিত করার মধ্যে দিয়ে শুরু হল ইতিপূর্বের অখণ্ড জ্ঞানরাজ্যে একটা পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া এবং গণিত, ভেষজবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিদ্যা পৃথক হয়ে গেল এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানগুলো প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এই প্রক্রিয়া একপেশে ছিল না। যেহেতু সমস্যার পরিধি হ্রাস পেতে শুরু করল, তার সঙ্গে সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ দার্শনিক ধারণাগুলোও বিকশিত, গভীর ও সমৃদ্ধ হতে থাকল এবং বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব ও দার্শনিক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হল। এই ধরনের দার্শনিক বিদ্যা গড়ে উঠল, যেমন তত্ত্ববিদ্যা—সত্তার অনুশীলন অথবা যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তার সারমর্ম; জ্ঞানতত্ত্ব—জ্ঞানলাভের তত্ত্ব; ন্যায়শাস্ত্র—নির্ভুলরূপে অর্থাৎ সঙ্গতিপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত চিন্তার বিদ্যা; ইতিহাসের দর্শন, নীতিশাস্ত্র, নন্দনতত্ত্ব ও পরে দর্শনও।

নবজাগৃতির (Renaissance) যুগে, এবং বিশেষভাবে ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে এই পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, আইনশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্বতন্ত্র শাখায় পরিণত হয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই শ্রমবিভাজন দর্শনের শেষ লক্ষ্যে, জ্ঞানতন্ত্রে এর স্থানের ক্ষেত্রে, বিশিষ্ট বিজ্ঞানগুলোর সঙ্গে এর সম্পর্কের মধ্যে একটা গুণগত পরিবর্তন আনল। বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, আইন ও ইতিহাস প্রভৃতির বিশেষ সমস্যার সমাধানে নিজেকে নিযুক্ত করবার সামর্থ্য আর দর্শনের রইল না। যদিও তখন পর্যন্ত সাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের, বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত প্রশ্নের, যা প্রায়ই বিশিষ্ট বিজ্ঞানের কাজের মধ্যে নিহিত থাকে কিন্তু যেগুলোকে তাদের নির্দেশক সর্তের (Terms of Reference) মধ্যে এবং তাদের বিশিষ্ট পদ্ধতির দ্বারা সমাধান করা যায় না, তার মোকাবিলা করার জন্যে দর্শন সবচেয়ে পারঙ্গম ছিল।

আমরা ইতিহাস থেকে জানি যে দর্শন এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল খুবই জটিল এবং বিপরীত চরিত্রের, যেহেতু বিশিষ্ট বিজ্ঞানগুলো (গণিত ও বলবিদ্যা ছাড়া) প্রধানতঃ অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক গবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, আর এই বিজ্ঞানগুলো সম্বন্ধে সাধারণ তাত্ত্বিক প্রশ্নগুলোর বিবেচনা করত দর্শন। কিন্তু বিশিষ্ট বিজ্ঞানগুলোর তত্ত্বগত

সমস্যার মধ্যে দর্শনের অনুসন্ধান যথেষ্ট তথ্যাগত মালমসলার উপর ভিত্তি করে হত না (সাধারণতঃ ঐ ধরনের তথ্য তখনও সঞ্চিত হয় নি); এই ধরনের অনুসন্ধান তাই হত কল্পনামূলক ও বিমূর্ত এবং তার ফল বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সর্বাধুনিক তথ্যের সঙ্গে প্রায়ই মিলত না। এইখানে বিরোধ দেখা দিল দর্শনের সঙ্গে বিশিষ্ট বিজ্ঞানগুলোর—যা চরম আকার ধারণ করল ধর্মের সঙ্গে জড়িত দর্শন-তন্ত্রের মধ্যে এবং এরা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ধর্মীয় বিশ্বদৃষ্টির সপক্ষে যুক্তি দেবার চেষ্টা করত।

কয়েকজন দার্শনিক প্রকৃতির দর্শনকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে, বিজ্ঞান হিসেবে ইতিহাসের দর্শনকে ইতিহাসের বিরুদ্ধে অথবা আইনের দর্শনকে আইনের বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার উদ্দেশ্যে দর্শনতন্ত্রের বিশ্বকোষ সৃষ্টি করলেন। এই দার্শনিকরা সাধারণতঃ ধরে নিতেন যে, দর্শন অভিজ্ঞতার সীমার বাইরে যেতে, বিজ্ঞানোত্তীর্ণ জ্ঞান সরবরাহ করতে সক্ষম। এই ধরনের অলীক ধারণা বিশিষ্ট বিজ্ঞানগুলোর বিকাশের দ্বারা খণ্ডিত হল। এরা প্রমাণ করল যে ভৌত সমস্যার সমাধাম করতে পারে কেবলমাত্র পদার্থবিদ্যা, রসায়নের সমাধান রসায়ন বিজ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব, ইত্যাদি।

এই সঙ্গে দর্শনকে বিশিষ্ট বিজ্ঞানের পর্যায়ে পর্যবসিত করার বিপরীত প্রবণতা অনেকগুলো দার্শনিক মতবাদে লক্ষ্য করা গেল। বিশিষ্ট বিজ্ঞান-গুলোর সাফল্য, বিশেষতঃ গণিত ও বলবিদ্যায় যেসব পদ্ধতির দ্বারা ঐসব সাফল্য লাভ হয়েছিল, তার অনুশীলন দার্শনিকদের উৎসাহিত করল, যাতে তাঁরা দেখতে পারেন যে ঐসব পদ্ধতি দর্শনে ব্যবহার করা যায় কিনা। উদাহরণস্বরূপ, দার্শনিকরা দর্শন-প্রস্থান গড়ে তুলতে প্রায়ই গণিতের স্বতঃসিদ্ধ পদ্ধতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন; সাবেকী বলবিদ্যার নীতিগুলোকে সার্বজনীন করবার প্রচেষ্টাও হয়েছিল, যাতে এর উপর নির্ভর করে দর্শন কেবল অজৈব জগতের ঘটনাবলীকেই ব্যাখ্যা করবে না, অধিকন্তু জৈব ও সামাজিক প্রক্রিয়াগুলোও ব্যাখ্যা করবে।

কিন্তু, বিশিষ্ট বিজ্ঞানগুলোর বিকাশ এটা প্রতিপন্ন করল যে এমন সমস্যা আছে যা বিজ্ঞানের মত দর্শনের দ্বারাও আলোচিত হতে পারে। বাস্তবে, এই ধরনের সমস্যাগুলোর সমাধান হতে পারে কেবলমাত্র তাদের যৌথ প্রচেষ্টার দ্বারা। কতকগুলো বিশেষ দার্শনিক সমস্যা আছে যা দর্শন এককভাবেই সমাধান করতে পারে, কিন্তু এখানেও সমাধান পেতে হলে দর্শনকে সমগ্র বৈজ্ঞানিক তথ্য ও উন্নত সামাজিক প্রয়োগের উপর নির্ভর করতে হবে।

২. দর্শনের মৌল প্রশ্ন

দার্শনিক মতবাদগুলো যতই বিভিন্ন ধরনের হোক না কেন, তাদের সবগুলোই, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে **চেতনার সঙ্গে সত্তার, আত্মিকের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্কের প্রশ্নটিকে** তাদের তত্ত্বগত পার্থক্যের বিষয় হিসেবে গণ্য করে। "সমস্ত দর্শনের, বিশেষ করে অতি সাম্প্রতিক দর্শনের সবচেয়ে মৌল প্রশ্নটি হল, চিন্তার সঙ্গে সত্তার সম্পর্ক সম্বন্ধে"।[১]

দর্শনের মৌল প্রশ্নটি আমাদের জীবনের প্রধান বিষয়ের মধ্যেই আছে। হ্যাঁ, বাস্তব ঘটনা আছে, আবার আছে আত্মিক ঘটনা, চেতনা—যা বাস্তব ঘটনা থেকে পৃথক। চিন্তার সঙ্গে সত্তার, বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়ের এই পার্থক্য মানব-চেতনা ও আচরণের যে-কোন কার্যকলাপের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবেশ থেকে নিজেকে পৃথক করে এবং অন্য সবকিছু থেকে নিজের কিছু একটা পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে। যে ঘটনাকে আমরা বিবেচনা করি না কেন, সেটিকে সর্বদাই হয় বাস্তব (বিষয়গত) না হয় আত্মিক (বিষয়ীগত) ক্ষেত্রে উপস্থাপিত করা যায়। তবুও বিষয়গত ও বিষয়ীগতর মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সংযোগ রয়েছে। এই সংযোগটি নজরে আসে যখন আমরা বিবেচনা করি কোনটা প্রাথমিক আর কোনটা দ্বিতীয় স্থানের, জগতে কোনটা চরম: বাস্তব না আত্মিক, বিষয় না বিষয়ী।

মার্কসবাদের পূর্বেকার দার্শনিকদের মধ্যে বস্তুবাদী দার্শনিক ফয়েরবাখ মৌল দার্শনিক প্রশ্নের অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে একটা সঠিক উপলব্ধির কাছাকাছি এসেছিলেন। অতিপ্রাকৃত, অধ্যাত্মশক্তি, ঈশ্বরের দ্বারা জগৎ সৃষ্টির ধর্মীয় মতবাদকে সমালোচনা করে ফয়েরবাখ এই বিপরীত মত উপস্থিত করলেন যে আত্মিকের উদ্ভব হয় বাস্তব থেকে। তবে, এঙ্গেলসই প্রথম—যিনি দর্শনের মৌল প্রশ্নের সঙ্গতিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সূত্রায়ন করেছিলেন।

বাস্তবের সঙ্গে আত্মিকের, বাস্তব জগতের সঙ্গে চেতনার সম্পর্ক কী? এঙ্গেলস লিখেছেন, "এই প্রশ্নের যে উত্তর দার্শনিকরা দিয়েছেন, তা তাঁদের দুটি শিবিরে বিভক্ত করেছে। যাঁরা প্রকৃতির তুলনায় আত্মিককে আদি হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন, তথা শেষ বিচারে ধরে নিয়েছেন কোন না কোন রূপে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, তাঁদের নিয়েই ভাববাদের শিবির। অন্যরা, যাঁরা প্রকৃতিকে আদি বলে গণ্য করেছেন, তাঁরা বস্তুবাদের নানা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।"[২] বিভিন্ন ধরনের

১, ২. কার্লমার্কস ও এফ এঙ্গেলস: সিলেক্টেড ওয়ার্কস (৩ খণ্ডে) মস্কো, ১৯৭৪, ৩৪৫ পৃ.

দার্শনিক সম্প্রদায় ও চিন্তাধারা শেষ পর্যন্ত **হয় বস্তুবাদ, না হয় ভাববাদের** অনুগামী। এই কারণেই বাস্তবের সঙ্গে আত্মিকের সম্পর্কটি হল **দর্শনের মৌল প্রশ্ন।**

যে কোন দার্শনিক প্রশ্নকেই আমরা বিবেচনা করি না কেন এ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করবে আমরা কেমন করে দর্শনের মৌল সমস্যাটির সমাধান করি তার উপর। বাস্তব না আত্মিক, কোনটিকে দার্শনিকরা প্রাথমিক বলে বিবেচনা করেছেন, তার উপর নির্ভর করে তাঁরা জগতের অস্তিত্ব শাশ্বত কিনা অথবা এর কোন কালগত সূচনা ছিল কিনা, অথবা জগৎ দেশে সীমাবদ্ধ কিনা অথবা এর বিপরীত, অসীম কিনা ; সত্য নির্দিষ্ট বিষয়ের যথাযথ প্রতিবিম্ব কিনা, অথবা এটা শুধু আস্থা, একটা মনোগত বিশ্বাস—এইসব প্রশ্নের নানা রকম উত্তর দিয়েছেন।

স্থিতি ও পরিদৃশ্যমান ঘটনাবলীর পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মগুলোর প্রশ্নের সমাধানও নির্ভর করে আমরা কোনটিকে প্রাথমিক বলে মনে করি—বস্তু না চেতনা, তার উওর। বস্তুবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, জগৎ মানুষের চেতনা-নিরপেক্ষভাবে বর্তমান। যদি তাই হয়, তবে বিভিন্ন পরি-দৃশ্যমান ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্কগুলো মানুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং তাদের চেতনা নিরপেক্ষ বাস্তব অস্তিত্ব আছে। এই কারণেই বস্তুবাদীরা আমাদের চারপাশের জগতের ঘটনা ও প্রক্রিয়াগুলোর নিয়ন্ত্রক বিষয়গত নিয়মকে স্বীকার করেন। ভাববাদীরা এই প্রশ্নের সমাধানে সম্পূর্ণ ভিন্ন উত্তর দিয়ে থাকেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন জগৎ তার নিজস্ব নিয়মাধীন ঘটনাবলী সহ অতিপ্রাকৃত প্রতিমূর্তি। অন্যেরা, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কে অধ্যাত্মশক্তিকে প্রাথমিক হিসাবে ধরে নিয়ে এই মত পোষণ করেন যে মানুষ সরাসরি তার আত্ম-চৈতন্যের রূপের সঙ্গেই সম্পর্কিত এবং তার বাইরে অন্য কোনকিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। বাস্তব জগৎকে অস্বীকার করে, বাস্তব উপাদানগুলোকে সংবেদন ও ভাবের সংযুক্তি হিসাবে গণ্য করে এইসব দার্শনিকরা ঘটনাবলীর বিষয়গত; নিয়মাধীন প্রকৃতিকে অস্বীকার করেন। এঁরা প্রকৃতি ও সমাজের নিয়মগুলোকে, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত ঘটনা ও প্রক্রিয়াগুলোর কারণসমূহকে কেবল আমাদের চেতনাস্থিত বিষয়ের নক্সা হিসেবেই গণ্য করেন।

আমরা কেমন করে দর্শনের মৌল প্রশ্নের উত্তর দিই তার উপর নির্ভর করে আমরা বাস্তবতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, ঐতিহাসিক ঘটনার উপলব্ধি, নৈতিক বিধি ইত্যাদি সম্বন্ধে কতকগুলো নির্দিষ্ট সামাজিক সিদ্ধান্ত টানতে বাধ্য। উদাহরণস্বরূপ, যদি ভাববাদীদের মতো চেতনাকে, অধ্যাত্মশক্তিকে প্রধান এবং

পরম বলে মনে করি তাহলে শ্রেণীসমাজে যেসব সামাজিক (নিপীড়ন, দারিদ্র্য, যুদ্ধ ইত্যাদি) শ্রমিকশ্রেণীর প্রচণ্ড দুর্ভোগের কারণ, তার উৎস মানুষের বাস্তব জীবনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে, সমাজের আর্থব্যবস্থার মধ্যে, শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে খুঁজব না, তার সন্ধান করব মানুষের চেতনার মধ্যে, তার ভুল ভ্রান্তি ও দুষ্ট প্রকৃতির মধ্যে। এই ধরনের বিশ্বাস সমাজজীবনের প্রধান দিক পরিবর্তন নির্ধারণ করতে আমাদের কোন সহায়তা করে না।

আজকালকার বুর্জোয়া দার্শনিকরা প্রায়ই প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন যে দর্শনের মৌল প্রশ্নের মোটেই কোন অস্তিত্ব নেই, এটি কল্পিত, উদ্ভাবিত সমস্যা। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে আধ্যাত্ম এবং বাস্তবের মধ্যে পার্থক্যটা সম্পূর্ণ বাচনিক না হলেও, একান্তভাবেই আপেক্ষিক। তাই, ইংরেজ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে এটা মোটেই সুস্পষ্ট নয় যে "বস্তু" ও "চিৎশক্তি" পদগুলোর দ্বারা যা বোঝায় সেরকম কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা। রাসেলের মতে আত্মিক ও বাস্তব নিছক যৌক্তিক কাঠামো। কিন্তু দর্শনের মৌল প্রশ্নটি বাতিলের জন্যে বুর্জোয়া দার্শনিকদের সমস্ত প্রচেষ্টা ধূলিসাৎ হয়েছে কারণ চিন্তা এবং চিন্তার বিষয়ের মধ্যে (উদাহরণস্বরূপ, একটা ভৌত প্রক্রিয়া), সংবেদন এবং যাকে নিয়ে সংবেদন হয়, যাকে চোখ, কান ইত্যাদি দিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করা হয়, তার মধ্যেকার পার্থক্যকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। কোন বিষয়ের ধারণা এক কথা কিন্তু ধারণা-নিরপেক্ষভাবে বিষয়টির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অন্য কথা। আত্মিক ও বাস্তব, বিষয়ীগত ও বিষয়গতর মধ্যে এই পার্থক্যই প্রকাশ পায় দর্শনের মৌল প্রশ্নে।

কোন কোন দার্শনিক প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, মানুষ, মানবজীবন ও তার সমস্ত সমস্যাই দর্শনের মৌল প্রশ্ন। কেউই অস্বীকার করবে না যে মানুষের সামাজিক জীবনের প্রশ্নটি দর্শনের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে আছে, বিশেষতঃ মার্কসীয় দর্শনে। কিন্তু ওগুলোকে বস্তুবাদী ও ভাববাদী উভয় অবস্থান থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। তাই, দর্শনে মৌল প্রশ্নটি হল সেই প্রশ্ন যা তাত্ত্বিকভাবে দার্শনিক অনুসন্ধানের দিক্‌দর্শনকে ঠিক করে দেয়, যা এর পৃথক পথে যাত্রার স্থানটিকে এবং নিয়ন্ত্রণকারী নীতিগুলোকে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করে। এই অর্থেই মার্কসবাদের চিরায়ত রচনাগুলোতে চৈতন্য-বস্তুর সম্পর্কটিকে দর্শনের মৌল প্রশ্ন বলে অভিহিত করা হয়েছে।

দর্শনের মৌল প্রশ্নটির দুটি দিক আছে। প্রথম দিকটি হ'ল **জগতের স্বরূপ এবং তার প্রকৃতির প্রশ্নটি** আর দ্বিতীয় দিকটি হ'ল **একে জানবার সম্ভাবনার প্রশ্নটি।**

প্রথম দিকটিকেই বিবেচনা করা যাক। যেমন আমরা দেখেছি ভাববাদ এই অনুমান থেকে অগ্রসর হয় যে বাস্তব হল চিৎশক্তির সৃষ্টি। বিপরীতভাবে,

বস্তুবাদ এইটা ধরে নিয়ে শুরু করে যে আত্মিক হল বাস্তবের সৃষ্টি। উভয় মতই **অদ্বৈতবাদী** (monistic) চরিত্রের অর্থাৎ বলা যায় যে এরা একটা নির্দিষ্ট সূত্র থেকে অগ্রসর হয়। একটি ক্ষেত্রে বাস্তবকে প্রাথমিক ও নিয়ামক হিসেবে গ্রহণ করা হয়, অন্যটির ক্ষেত্রে আত্মিকই হল প্রাথমিক। কিন্তু কতকগুলো দার্শনিক তত্ত্ব আছে যা উভয় নীতি থেকেই অগ্রসর হয়; এই তত্ত্বগুলো ধরে নেয় যে আত্মিক বাস্তবের উপর নির্ভর করে না অথবা বাস্তব আত্মিকের উপর নির্ভরশীল নয়। এই ধরনের দার্শনিক তত্ত্বকে বলা হয় **দ্বৈতবাদী** (dualistic)। শেষ পর্যন্ত এরা সাধারণতঃ ভাববাদের দিকেই ঝোঁকে। কিছু দার্শনিক ভাববাদের বিবৃতিগুলোকে বস্তুবাদের সঙ্গে যুক্ত করার এবং উল্টোটাও করবার চেষ্টা করেন। এই দার্শনিক অবস্থানটি **সার-সংগ্রহবাদ** (eclecticism) বলে পরিচিত।

বস্তুবাদ ও ভাববাদ বিকাশের এক দীর্ঘপথ পরিক্রমা করেছে এবং এ নানা রূপে বর্তমান।

বস্তুবাদের প্রথম ঐতিহাসিক রূপ ছিল ক্রীতদাস-মালিক সমাজের বস্তুবাদ। এটা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, সরল বস্তুবাদ। এটা প্রকাশ পেয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে (চার্বাকদের দার্শনিক গোষ্ঠী) এবং এর সবচেয়ে উন্নত রূপ দেখা যায় প্রাচীন গ্রীস দেশে। প্রধানতঃ ডেমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের পরমাণুবাদী মত[1]। লেনিন বলেছিলেন, "ডেমোক্রিটাসের পদ্ধতি" ভাব-বাদী "প্লেটোর পদ্ধতি'র বিপরীত।

পুঁজিবাদী সমাজের অভ্যুদয়ের যুগে বুর্জোয়ারা জগতের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয় ভাববাদী বিশ্বদৃষ্টির বিরুদ্ধতা করে, যা ইংরেজ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন এবং টমাস হবস, ওলন্দাজ দার্শনিক স্পিনোজা (১৭শ শতাব্দী) এবং ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদী দার্শনিক লা মেত্রি, হলবাখ, হেলভেটিয়াস এবং দিদারোর রচনাবলীর মধ্যে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। ১৯শ শতাব্দীতে এই ধরনের বস্তুবাদ লুডভিগ ফয়ারবাখের দর্শনে বিকশিত হয়।

১৯শ শতাব্দীর রুশ বিপ্লবী-গণতন্ত্রী হার্জেন, বেলিনস্কি, চের্নিসেভস্কি, দব্রলুবভ ছিলেন বস্তুবাদের দিকপাল প্রতিনিধি।

আধুনিক বস্তুবাদের উন্নততমরূপ হল ডায়ালেকটিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

নানা ধরনের ভাববাদের মধ্যে প্রথমেই অবশ্য **বিষয়গত ভাববাদের** (Objective Idealism) উল্লেখ করতে হয়। (প্লেটো, হেগেল ও অন্যান্যরা)।

এই মত অনুসারে চিৎশক্তি চেতনা-নিরপেক্ষভাবে, বস্তু থেকে সতন্ত্রভাবে, এমনকি তার আগে থেকে "বিশ্ব প্রজ্ঞা", "বিশ্ব ইচ্ছা" অথবা "অচেতন বিশ্বাত্মা" হিসেবে বহির্জগতে বিদ্যমান, যা নাকি বাস্তব প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করছে।

বিষয়গত ভাববাদের বিপরীতে, বিষয়ীগত ভাববাদ (**Subjective idealism**) (বার্কলি, মাখ, এভেনারিয়াস, প্রভৃতি) জোর দিয়ে বলে, আমরা যে বিষয়কে দেখতে পারি, স্পর্শ করতে পারি, ঘ্রাণ নিতে পারি তা আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বাইরে স্বাধীনভাবে নেই এবং ওগুলো কেবলমাত্র আমাদের সংবেদন ও ধারণার জোড়াতালি। এটা দেখা কঠিন নয় যে একজন বিষয়ীগত ভাববাদী যদি সঙ্গতিপূর্ণভাবে নিজের নীতি নিয়ে অগ্রসর হয় তাহলে অবশ্যই তাকে একটা অসম্ভব সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আমি ব্যতিরেকে অন্যান্য মানুষ সমেত যা কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে তা আমার সংবেদন ছাড়া আর কিছুই নয়। এ থেকে এইটেই বেরিয়ে আসে যে শুধু, আমিই আছি! এই বিষয়ীগত ভাববাদী ধারণা "অস্মিতাবাদ" (Solipsism) নামে পরিচিত। একথা বলার প্রয়োজন নেই যে ভাববাদীরা সর্বদাই অস্মিতাবাদী অবস্থানকে এড়ানোর চেষ্টা করে এবং এইভাবেই নিজেদের প্রারম্ভিক প্রতিজ্ঞাকে অপ্রমাণিত করে। উদাহরণস্বরূপ, বার্কলি এই অভিমত পোষণ করতেন যে বর্তমান থাকার অর্থই হল প্রত্যক্ষ হওয়া ; তবুও তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে সংবেদনের সীমার বাইরে ঈশ্বর আছে এবং আমাদের সংবেদনগুলো হল চিহ্ন-খুঁটি যার মাধ্যমে ঈশ্বর তার ইচ্ছাকে আমাদের কাছে প্রেরণ করে।

জগৎ প্রধানতঃ অতিপ্রাকৃতের উপর, আত্মিকশক্তির উপর নির্ভরশীল—বিজ্ঞানের বিকাশ এই ভাববাদী বিশ্বাসকে উৎপাটিত করেছে।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থেকে অগ্রসর হয়ে, সমস্ত বস্তুবাদীই আত্মিক বাস্তবের সৃষ্টি বলে মনে করেন। এই সঠিক দৃষ্টিকোণকে বিকশিত করার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের মৌল প্রশ্নের মার্কসীয় সমাধান ডায়ালেকটিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্বাতন্ত্র্য পৃথক। আত্মিক হল বস্তুর বিকাশের ফল—উন্নত ধরনের সংগঠিত বস্তুর বিকাশের একটি গুণ। এর অর্থ এই যে আত্মিক সর্বদা এবং সর্বত্র থাকে না, বরং এর অভ্যুদয় ঘটে বস্তুর বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে এবং আত্মিক নিজেও ঐতিহাসিক পরিবর্তনের অধীন।

যেমন উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, দর্শনের মৌল প্রশ্নের দ্বিতীয় দিকটি হল জগৎকে জানার সম্ভাবনার সমস্যা। দার্শনিক বস্তুবাদের সমস্ত দৃঢ় এবং সচেতন প্রবক্তাগণ জগতের জ্ঞায়তার নীতিকে রক্ষা করেন এবং প্রমাণ করতে চান। তারা আমাদের জ্ঞান, প্রত্যয় ও ভাবগুলোকে বিষয়গত বাস্তবতার

প্রতিবিম্ব বলে মনে করেন। তবে, কিছু বাস্তববাদী যাঁরা প্রকৃতি-বিজ্ঞানী এবং যাঁদের কোন সংগতিপূর্ণ দার্শনিক অবস্থান নেই, তাঁদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য বিষয়গত জ্ঞানলাভের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করার ঝোঁক আছে। এই দার্শনিক অবস্থানটি অজ্ঞাবাদ (agnosticism) নামে পরিচিত (গ্রীক ভাষায় a অর্থে না, Gonsis অর্থে জ্ঞান বোঝায়)।[১]

ভাববাদের কয়েকজন প্রবক্তা এই অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন যে জগৎকে জানা যায় (যেমন—বিষয়গত ভাববাদী হেগেল—তবে তা সত্ত্বেও তিনি জ্ঞানকে বাহ্য সত্তার প্রতিবিম্ব বলে মনে করতেন না বরং বিশ্বাত্মার স্ব-জ্ঞান হিসেবেই দেখতেন)। অন্যান্য ভাববাদীরা এই অভিমত পোষণ করতেন যে জ্ঞানে (cognition) আমরা কেবল আমাদের সংবেদন, প্রত্যক্ষনের সঙ্গেই সম্পর্কিত এবং জ্ঞানের প্রয়োজকের (Subject), জ্ঞাতার নিজের বাইরে যেতে পারি না (আত্মগত ভাববাদী বার্কলি, মাখ, এভেনারিয়াস প্রমুখ)।

লেনিন উল্লেখ করেছিলেন যে অজ্ঞাবাদী দার্শনিকরা বস্তুবাদ ও ভাববাদের মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণের চেষ্টা করেন, কিন্তু সর্বদাই চেষ্টা করেন বহির্জগৎ এবং মানুষের প্রত্যয় ও ভাবের বিষয়গত আধেয়কে অস্বীকার করার ভাববাদী অবস্থানের দিকে ঝুঁকতে। আধুনিক ভাববাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকটি সাবেকী ভাববাদের মত না হলেও, এর বেশীর ভাগ প্রতিনিধিরা অজ্ঞাবাদী অবস্থান গ্রহণ করে থাকেন।

একবার যদি আমরা দর্শনের মৌল প্রশ্নের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝে নিই তাহলে আমরা দার্শনিক মতবাদের প্রবণতা ও গোষ্ঠীর বৈচিত্র্যের মধ্যে আমাদের পথ খুঁজে নিতে পারি—যেগুলি হাজার হাজার বছর ধরে একটি ক্রমপরম্পরার মধ্যে দিয়ে চলেছে। দর্শনে কেবলমাত্র দুটি প্রধান ধারা আছে—বস্তুবাদ ও ভাববাদ। এর অর্থ যে-কোন দার্শনিক মতবাদ, যতই মৌলিক হোক, শেষ পর্যন্ত আধেয়র (content) দিক থেকে হয় বস্তুবাদী, নয় ভাববাদী।

বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যেকার সংগ্রাম, বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যেকার সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বস্তুবাদ যেহেতু স্পষ্টরূপে ভাববাদ ও ধর্মের বিরোধী, তাই এ ঈশ্বর ও অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করে না; বস্তুবাদ নিরীশ্বরবাদ থেকে অচ্ছেদ্য।

ভাববাদ ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ—তারই তত্ত্বগত প্রকাশ ও ব্যাখ্যা এটি। আত্মগত ভাববাদ, যা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বিষয়গুলোকে

---

১ অতীতেও কখনও কখনও অজ্ঞাবাদ বস্তুবাদের ছদ্মবেশে আবির্ভূত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, বৃটেনে ১৯শ শতাব্দীর কয়েকজন প্রকৃতি বিজ্ঞানী (টমাস হাক্সলি প্রমুখ) নিজেদের খোলাখুলি বস্তুবাদী বলে ঘোষণা না করে অজ্ঞাবাদের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন, কারণ এঁরা ছিলেন বুর্জোয়া সংস্কারে আচ্ছন্ন।

ব্যক্তির সংবেদনে পর্যবসিত করে, তা সত্ত্বেও প্রায়ই অতীন্দ্রিয়, অতিপ্রাকৃত প্রথম কারণকে (অর্থাৎ বলা যায় ঈশ্বরের অস্তিত্বকে) স্বীকার করে। অন্য-দিকে, বিষয়গত ভাববাদীদের বিশ্বপ্রজ্ঞা, আসলে ঈশ্বরেরই একটি দার্শনিক ছদ্মনাম। তবে ভাববাদকে ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখলে ভুল হবে, কারণ ভাববাদ হল ভ্রান্ত তাত্ত্বিক মতবাদের সংস্থিতি (system), যা জ্ঞানের দ্বান্দ্বিক বিকাশের গতিপথে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

ভাববাদী দর্শনের **সামাজিক ও জ্ঞানতত্ত্বগত** উৎস রয়েছে।

যখন আমরা ভাববাদের জ্ঞানতত্ত্বগত উৎসের কথা বলি, তখন আমরা বোঝাতে চাই জ্ঞানের একটা একপেশে মূল্যায়ন—এই জটিল, বহুমুখী এবং অভ্যন্তরীণ স্ব-বিরোধমুক্ত প্রক্রিয়ার একটি দিককে বাড়িয়ে দেখা বা চূড়ান্ত করা। ভাববাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক উৎসকে নির্দেশ করতে গিয়ে মার্কসবাদ এটা জোর দিয়ে বলে যে ভাববাদ অর্থহীন কতকগুলো শব্দের জগাখিচুড়ি নয় বরং বাস্তবতার বিকৃত প্রতিবিম্ব, আর এটি জ্ঞান-প্রক্রিয়ায় কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ও দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত।

লেনিন উল্লেখ করেছেন—ভাববাদ একটি বন্ধ্যা ফুল কিন্তু এমন যা পুষ্পিত হয় ফলদায়ী, শক্তিশালী ও প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত শক্তিমান মানবজ্ঞানের জীবন্ত বৃক্ষের উপর। লেনিন স্পাইরাল বা আবর্তিত সর্পিলগতির সঙ্গে জ্ঞানপ্রক্রিয়াকে তুলনা করেছিলেন। যদি আমরা একপেশে, আত্মমুখী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করি তাহলে আবর্তনের যে কোন অংশ একটা সরলরেখায় পরিবর্তিত হতে পারে এবং সেটা জ্ঞানের প্রধান ধারা থেকে সত্যের বিকৃতি ঘটানোর দিকে নিয়ে যায়।

জ্ঞানের সন্ধানে অবগতির ক্রিয়ার মধ্যে আমরা যে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হই তা বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করে। সেগুলো হতে পারে চিন্তা (প্রত্যয়) ও বাস্তবতার ইন্দ্রিয়গত প্রতিবিম্বের (সংবেদনের) মধ্যে, তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি। ভাববাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক উৎস এইখানে যে, জ্ঞানের একটি বিশেষ দিক অথবা একটি বিশেষ প্রতিজ্ঞাকে এতদূরে বাড়িয়ে বা চূড়ান্ত করে তোলা হল যে তার অস্তিত্বই বিপন্ন হল ও সত্যতা হারিয়ে গেল এবং সেটা ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হল। তাই কিছু ভাববাদী চিন্তার ক্রিয়াশীলতার উপর জোর দেবার সময় এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছন যে, চিন্তার একটি সৃষ্টিশীল শক্তি আছে যা বস্তু-নিরপেক্ষ। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ দ্বারা যাকে বস্তুর গুণ বলে জানি, আত্মগত ভাববাদীরা (Subjective Idealist) তার উপর দাঁড়িয়ে অনুমান করেন যে আমরা শুধু আমাদের এই সংবেদনগুলোকেই জানতে পারি এবং এইগুলোই আমাদের জ্ঞানের স্রষ্টা। "দার্শনিক ভাববাদ একটি দিকের, একটি বৈশিষ্ট্যের, একটি অংশের বিকাশকে (ফুলিয়ে, ফাঁপিয়ে) বস্তু থেকে,

প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে, এবং তাকে অতিরিক্তভাবে মহিমান্বিত করে··· ঋজুরেখ ও একপেশে, নিস্তেজ, প্রস্তরীভূত, বিষয়ীবাদ ও আত্মমুখী অন্ধতাই—ওখানেই দেখ (Voila) ভাববাদের জ্ঞানতত্ত্বগত উৎস।"[১]

ভাববাদ উদ্ভবের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে, জ্ঞানের ভ্রান্তিতে কিছু দর্শন তন্ত্রে পরিণত করার জন্যে কতকগুলো বিশেষ অবস্থার প্রয়োজন। এটা ঘটে যখন জ্ঞানের ভ্রান্তির সঙ্গে কোনো কোনো শ্রেণীর বা সামাজিক গোষ্ঠীর দাবী মিলে যায় এবং তারা ভ্রান্তিগুলো সমর্থন করে। ভাববাদ উদ্ভবের জন্যে যে সামাজিক অবস্থার প্রয়োজন ছিল তাহল কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রমের মধ্যে একটা পার্থক্যের সৃষ্টি, শ্রেণীর উৎপত্তি ও বিকাশ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ। কায়িক শ্রম থেকে মানসিক শ্রম একবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তা আপেক্ষিকভাবে একটা স্বনিয়ন্ত্রিত চরিত্র অর্জন করে এবং সম্পত্তির অধিকারী শোষকশ্রেণীর কাছে তা সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। যাঁরা কায়িক শ্রমকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন সেইসব শ্রেণীর মতাদর্শের প্রবক্তারা এই ভ্রান্ত চিন্তায় আচ্ছন্ন হন যে সমাজের অস্তিত্ব ও বিকাশের ক্ষেত্রে মানসিক ক্রিয়াই নির্ধারক শক্তি।

প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলো সত্যকে জানতে আগ্রহী নয় এবং জ্ঞান-প্রক্রিয়ায় যে ব্যক্তিগত ভাববাদী ভ্রান্তি ঘটে তাকে প্রায়ই আরো শক্তিশালী করে তোলা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের কাঠামোতে পরিণত করা হয়। লেনিন লিখেছিলেন, "মানব জ্ঞান···সরলরেখা নয়, একটা বক্রতা, যা অন্তহীনভাবে অসংখ্য বৃত্ত-পরম্পরার সমীপবর্তী হয়—একটা অবর্তিত সর্পিল গতির মত। এই বক্রতার যে কোন টুকরো, অংশকে রূপান্তরিত (একপেশেভাবে রূপান্তরিত) করা যায় একটা স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ সরলরেখায়, যা তখন (যদি কেউ জঙ্গলে গাছ না দেখে) একটা বন্ধ জলার দিকে নিয়ে যায়, রূপান্তরিত হয় যাজক সম্প্রদায়ের অন্ধ বিশ্বাসে (যেখানে এটাকে শাসকশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থের-নোঙরে বাঁধা হয়)।"[২]

যদিও তিনি ভাববাদকে যাজক সম্প্রদায়ের অন্ধবিশ্বাস নামে অভিহিত করেছিলেন, তবুও লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে ভাববাদকে ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন মনে করাটা অতিসরলীকরণ হবে। দার্শনিক ভাববাদ হল—"মানুষের সীমাহীন জটিল জ্ঞানের (ডায়ালেকটিক) একটি রশ্মির মাধ্যমে"[৩] ধর্মের পথ।

দর্শন ও ধর্ম সামাজিক চেতনার ভিন্ন ভিন্ন রূপের প্রকাশ। ধর্মীয় যুক্তির ভিত্তি অন্ধ আস্থা, আর দর্শনের আবেদন যুক্তির কাছে এবং দর্শন তার প্রতিজ্ঞাগুলোর স্বপক্ষে প্রমাণ দাখিল করতে সচেষ্ট।

---

১ ভি. আই. লেনিন কালেকটেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ৩৬৩ পৃঃ।

২ ভি. আই. লেনিন : কালেকটেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ৩৬৩ পৃঃ।

৩ ঐ

৩ ডায়ালেকটিকস ও অধিবিদ্যা

যেখানে সত্তার সঙ্গে চিন্তার সম্পর্কের প্রশ্নটি দর্শনের সর্বপ্রধান প্রশ্ন, অন্যদিকে দ্বিতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হল এই : জগৎ নিরন্তর পরিবর্তন ও বিকাশের অবস্থায়, একটি সার্বিক সম্পর্কযুক্ত অবস্থায় অথবা এটা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং গভীর গুণগত পরিবর্তন ছাড়া মূলত স্থির ও চক্রাকার পরিবর্তনশীল অবস্থায় আছে কিনা? এ থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে, দর্শনের ইতিহাস শুধু বস্তুবাদ আর ভাববাদের মধ্যে লড়াই নয়, অধিকন্তু ডায়ালেকটিকস ও অধিবিদ্যার মধ্যেকার সংগ্রাম।

ডায়ালেকটিকস[১] বস্তু তার গুণ ও সম্পর্ক, এবং তাদের মানস প্রতিবিম্বকে আন্তঃসংযোগের মধ্যে, গতির মধ্যে, সূত্রপাতে, দ্বান্দ্বিক বিকাশে এবং বিলয়ের মধ্যে বিবেচনা করে। মার্কসবাদের পূর্ববর্তী বস্তুবাদীদের বেশীর ভাগেরই বিরাট দুর্বলতা ছিল ডায়ালেকটিকস সম্বন্ধে তাঁদের অজ্ঞতা। এই জন্যেই, জগৎ সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে সমাজ সম্বন্ধে একটা সঙ্গীতপূর্ণ বস্তুবাদী মত গড়ে তোলা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে। সামাজিক ঘটনাবলীকে বুঝতে গিয়ে মার্কসবাদের পূর্ববর্তী বস্তুবাদীরা, ভাববাদী ইতিহাস ব্যাখ্যার বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও নিজেরাই ভাববাদী অবস্থানের দিকে ঝুঁকেছিলেন।

লেনিন আমাদের বলেছেন মার্কস এবং এঙ্গেলস বৈপ্লবিক চিন্তাধারার ইতিহাসে একটা বিরাট অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন প্রধানতঃ এবং এটাকে ব্যবহার করে ছিলেন দর্শন, অর্থশাস্ত্র ও ইতিহাসকে পুনর্গঠিত করতে এবং শ্রমিক আন্দোলনের নীতি ও কৌশলকে বাস্তবায়িত করতে। লেনিন ডায়ালেকটিকসকে চিহ্নিত করেছিলেন বিকাশের পূর্ণতম, সবচেয়ে সুগভীর, অপক্ষপাতহীন মতবাদ হিসেবে, মানব-জ্ঞানের আপেক্ষিকতার মতবাদ হিসেবে—যা আমাদের চিরন্তন বিকাশশীল বস্তুর প্রতিবিম্ব জোগায়।

ডায়ালেকটিকস-এর সচেতন প্রয়োগ আমাদের সাহায্য করে প্রত্যয়ের সঠিক ব্যবহার করতে, ঘটনাবলীর পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের দ্বান্দ্বিকতা, পরিবর্তনশীলতা এবং একটি দ্বন্দ্বের অপর দ্বন্দ্বে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনা করতে। প্রকৃতি, সামাজিক জীবন ও চেতনার প্রকৃত নিয়মকে কেবলমাত্র ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে উদ্ঘাটিত করা যায়। এইসব নিয়ম ঘটনা-বিকাশের চালক ও ক্রিয়াশক্তি; এগুলোই ভবিষৎ সম্বন্ধে আভাস দেওয়া সম্ভব করে তোলে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী, মানুষের পরিকল্পনা অনুযায়ী এগুলোকে পুনর্গঠিত করার কার্যকরী উপায় আবিষ্কার করা যায়।

১ দ্বন্দ্ব-সমন্বয়বাদ (Dialectics) গ্রীক শব্দ Dialektikos থেকে আহৃত, যার অর্থ তর্ক করা বা যুক্তি দেওয়া। প্রাচীনকালে Dialectics অর্থে বোঝাতো যুক্তি দিয়ে—বিরোধীর চিন্তাধারার মধ্যে দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করে সত্যকে উদ্ঘাটন করা।

জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ডায়ালেকটিক পদ্ধতি এই কারণেই একটা বৈপ্লবিক পদ্ধতি, এতে স্বীকার করা হয় সবকিছুই বদলায়, বিকশিত হয়। এর তাৎপর্য হল, যা কিছু অপ্রচলিত ও ইতিহাসের অগ্রগতির পথে বাধা তার অবসান ঘটবে। এই কারণেই বুর্জোয়াদের মতাদর্শের প্রবক্তারা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ডায়ালেকটিকস এর প্রতি অবজ্ঞা দেখায়।

ডায়ালেকটিক পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত জ্ঞান-পদ্ধতি **অধিবিদ্যক** (metaphysical) পদ্ধতি[১] বলে পরিচিত। অধিবিদ্যকরা বিষয় ও ঘটনাবলীকে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে, বস্তুকে মূলতঃ অপরিবর্তনীয় ও অন্তর্দ্বন্দ্বহীন হিসেবে বিবেচনা করে। অধিবিদ্যকরা একটি বিষয় বা ঘটনার আপেক্ষিক স্থায়িত্ব ও সুনির্দিষ্টতাকে দেখে, কিন্তু তাদের পরিবর্তন ও বিকাশক্ষমতাকে গুরুত্ব দেয় না। বিকাশের উৎস ও প্রধান প্রেরণা শক্তি হিসেবে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের অস্বীকৃতির মধ্যেই অধিবিদ্যক চিন্তার ধরনটি প্রকাশ পায়।

মার্কসবাদের পূর্ববর্তী দর্শনে, বস্তুবাদ (যেমন প্রাচীন গ্রীসে) তার অস্তিত্বের প্রথম পর্যায়ে ডায়ালেকটিকস-এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল, কিন্তু পরে, বিশেষতঃ আধুনিককালে, বহু উপাদানের প্রভাবে, বিশেষতঃ তখনকার সময়ের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার দরুন, এটি অধিবিদ্যক আকার ধারণ করে। অন্যদিকে, ডায়ালেকটিকসকে শুধু বস্তুবাদীরাই বিকশিত করেন নি, অধিকন্তু এটা ভাববাদের কোন কোন বিশিষ্ট প্রবক্তার (যথা হেগেল) দ্বারাও বিকশিত হয়।

ডায়ালেকটিকস-এর ইতিহাসকে নিম্নবর্ণিতভাবে কয়েকটি মূলভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ প্রাচীন দার্শনিকদের স্বতঃস্ফূর্ত, সরল ডায়ালেকটিকস, নব জাগৃতির যুগের বস্তুবাদীদের ডায়ালেকটিকস (জিয়র্দানো ব্রুনো প্রমুখরা), সাবেকী জার্মান দর্শনের ভাববাদী ডায়ালেকটিকস (কাণ্ট, ফিক্টে, শেলিং ও হেগেল), ১৯শ শতাব্দীর বিপ্লবী গণতন্ত্রিদের ডায়ালেকটিকস (বেলিনিস্কি, হার্জেন, চেনির্সেভস্কি ও অন্যান্যরা) এবং সমকালীন ডায়ালেকটিকসের সর্বাপেক্ষা উন্নত রূপ হিসেবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস। মার্কসবাদী দর্শনের মধ্যেই বস্তুবাদ ও ডায়ালেকটিকস-এর ঐক্য বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত এবং সুসঙ্গত রূপ লাভ করেছে।

---

১ মেটাফিজিক্স (অধিবিদ্যা) গ্রীক ভাষার একটি শব্দ। এটি মেটা-টা-ফিজিকা শব্দ থেকে আহৃত যার অর্থ "যা কিছু পদার্থবিদ্যার পরবর্তী"। মার্কসবাদের পূর্বেকার ও আধুনিক বুর্জোয়া সাহিত্যে অধিবিদ্যা নামটি দর্শনের একটি বিশেষ শাখাকে দেওয়া হয়, যেখানে চিন্তাধারা বস্তুর তথাকথিত চিরন্তন পরিবর্তনহীন সারসত্বার মধ্যে প্রবেশ করতে চায় অনুমানের মাধ্যমে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিরায়ত সাহিত্য দর্শনের কোন বিশেষ শাখার সম্বন্ধে, জগতের কোন বিশেষ জ্ঞানের সম্বন্ধে অধিবিদ্যা পদটি প্রয়োগ করেনা বরং প্রয়োগ করে অদ্বান্দ্বিক চিন্তা-পদ্ধতি ও জ্ঞান সম্বন্ধে। এই অর্থেই অধিবিদ্যা শব্দটি বর্তমানে মার্কসীয় দর্শনে ব্যবহৃত হয়।

৪. মার্কসবাদ-লেনিনবাদী দর্শনের বিষয়বস্তু এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্ক

ডায়ালেকটিকস আধুনিক বিজ্ঞানের এবং প্রগতিশীল সামাজিক কর্মের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বুর্জোয়া দার্শনিকরা প্রায়ই দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা টানতে চান, এইটি ধরে নিয়ে যে দর্শন বিজ্ঞান হতে পারে না, এবং এর প্রকৃতি অনুসারে তা হওয়া উচিত নয়। বার্ট্রান্ড রাসেল লিখেছেন, "দর্শন শব্দটি বলতে আমি যা বুঝি তা এমন একটা কিছু যা রয়েছে ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের মাঝামাঝি। ধর্মতত্ত্বের মত, এটি এমনসব ব্যাপারে জল্পনা-কল্পনা করে যে বিষয়টি সম্বন্ধে এখনও সুনিশ্চিত হওয়া যায় নি ; কিন্তু বিজ্ঞানের মত, এর আবেদন হল যুক্তির কাছে—কোন কর্তৃত্বের কাছে নয়—তা সেটি ঐতিহ্যানুসারীই হোক অথবা দৈবপ্রত্যাদেশই হোক। আমি মনে করি, সমস্ত নির্দিষ্ট জ্ঞানই বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ; নির্দিষ্ট জ্ঞানাতিরিক্ত সমস্ত অন্ধ শাস্ত্র-বিশ্বাস ধর্মতত্ত্বের অন্তর্গত। কিন্তু উভয় দিক থেকে আক্রান্ত হবার মত উন্মুক্ত ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গা আছে—এই ফাঁকা জায়গাটাই দর্শন।"[১] এই বর্ণনাটিকে পুরোপুরি ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আধুনিক ভাববাদী দর্শনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু এই ধরনের দর্শন ছাড়াও ডায়ালেকটিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শনের মত সঙ্গতিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক দর্শনও রয়েছে। এঙ্গেলসের কথায়, মার্কসবাদী দর্শন হল, "একটা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি যাকে তার যথার্থ্য প্রতিপন্ন করতে হবে এবং প্রয়োগ করতে হবে প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানগুলোর মধ্যে, পৃথক থেকে বিজ্ঞানের মধ্যে নয়।"[২]

বিশিষ্ট বিজ্ঞানের মতই দর্শন সেই একই জগৎকে অনুশীলন করে। কিন্তু বিশিষ্ট বিজ্ঞানগুলো যেমন ঘটনার কতকগুলো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের অনুশীলন করে, তার পরিবর্তে দর্শনের কাজ হল সবচেয়ে সাধারণ সংযোগ ও সম্বন্ধগুলোর অবলোকন। প্রকৃতি ও সমাজ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের বিকাশ দর্শনকে এই বিশেষ নিয়মগুলোর অনুশীলনের দায় থেকে মুক্তি দিয়েছে। তবে, যার সঙ্গে দর্শন সবসময়ই জড়িত ছিল সেই বিশ্বদৃষ্টির মৌল প্রশ্নটির সমাধানের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায় নি। "জ্ঞানতত্ত্বগত মূল প্রত্যয়গুলোর সঙ্গে বস্তুর কাঠামোর কোন বিশেষ তত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্বের পুরনো সমস্যা—বিষয়গত সত্যের অস্তিত্বের সঙ্গে, বস্তুর

১ বার্ট্রাণ্ড রাসেল : হিস্ট্রি অফ্ ওয়েষ্টার্ণ ফিলসফি এণ্ড ইটস কনেকসন উইথ পলিটিক্যাল এণ্ড সোস্যাল সারকামষ্টানসেস ফ্রম দি আর্লিয়েষ্ট টাইমস টু দি প্রেজেন্ট ডে। লণ্ডন, ১৯৪৮, ১০ পৃঃ।

২ এফ. এঙ্গেলস : অ্যান্টি ডুরিং মস্কো। ১৯৬৯, ১৬৬ পৃঃ।

নতুন দিকের নতুন ধর্মের (যথা ইলেকট্রন) সমস্যার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার"[১] যে কোন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধতা করেছিলেন লেনিন। আমাদের সংবেদনের বিষয়গত উৎস হিসেবে বস্তুর অস্তিত্বের স্বীকৃতির প্রশ্নটি লেনিনের মতে সর্বোপরি জ্ঞানতত্ত্বের প্রশ্ন, ভৌত প্রশ্ন নয়।[২] জ্ঞানতত্ত্ব ও দর্শনের প্রশ্নের মধ্যে এই ধরনের সমস্যাগুলোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ চেতনার সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক কী—তাদের মধ্যে কোনটা প্রাথমিক আর কোনটা দ্বিতীয়? আমাদের সংবেদন, মানসিক প্রতিরূপ এবং প্রত্যয়গুলো কি বিষয়গত জগতের প্রতিবিম্ব? কোন অবস্থায় এই প্রতিবিম্ব বিষয়গত সত্য নিষ্পন্ন করে? সত্যের মানদণ্ড কী? বস্তু কী? এদের অবস্থানের রূপ কী? ইত্যাদি।

প্রত্যেক বিজ্ঞানই গুণগতভাবে নির্দিষ্ট নিয়মতন্ত্রের অনুশীলন করে—যান্ত্রিক, ভৌত, রাসায়নিক, জৈব, আর্থব্যবস্থা ইত্যাদির। এমন কোন বিশিষ্ট বিজ্ঞান নেই যা প্রকৃতি, সমাজ-বিকাশ এবং মানবচিন্তার সাধারণ নিয়মগুলোর অনুশীলন করে। এই বিশ্বজনীন নিয়মগুলোই দার্শনিক জ্ঞান-প্রক্রিয়ার বিষয়-বস্তু সৃষ্টি করে। বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস-এর বিষয়বস্তুর সংজ্ঞা নির্ণয় করে এঙ্গেলস বলেছিলেন যে **প্রকৃতি, মানবসমাজ ও চিন্তার গতি এবং বিকাশের সবচেয়ে সাধারণ নিয়মগুলোই**-এর অন্তর্ভুক্ত। এইসব নিয়মগুলোর অনুশীলনই রয়েছে মার্কসবাদী-দার্শনিক বিশ্ববীক্ষার ভিতরে এবং তা জগৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের সাধারণ পদ্ধতিকেও গড়ে তোলে।

অন্যভাবে বললে, যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তাদের বিকাশের সবচেয়ে সাধারণ নিয়মগুলোর অনুশীলন হিসেবে ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ একই সঙ্গে একটা সাধারণ অনুসন্ধান পদ্ধতি যা প্রত্যেকটি বিশিষ্ট বিজ্ঞানে বিশেষ রূপ ধারণ করবে। প্রত্যেক বিজ্ঞানই কতকগুলো সাধারণ প্রত্যয় (মূল প্রত্যয়) ব্যবহার করে; উদাহরণস্বরূপ, কার্যকারণ সম্বন্ধ, অপরিহার্যতা, নিয়ম, রূপ, আধেয় (content) ইত্যাদি প্রত্যয়। বিশিষ্ট বিজ্ঞানগুলো স্বাভাবিকভাবেই এইসব প্রত্যয়ের একটা ব্যাপক বিচার ও ব্যাখ্যা দেয় না। তাই, রসায়ন-শাস্ত্র অনুসন্ধান করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার, আর জীববিদ্যা অনুশীলন করে জীব-ধারার নিয়ম-গুলো, কেবলমাত্র দর্শনই ঘটনার বিশ্বজনীন সংযোগ হিসেবে নিয়মগুলোর এবং তার অসীম গুণবৈচিত্র্যসম্পন্ন বিশ্বজনীন রূপের অনুশীলন করে।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানে আমাদের এমন সব প্রত্যয় নিয়ে কাজ করতে হয়, যাদের বিষয়বস্তু গবেষণার বিশেষ ক্ষেত্রটিতেই সীমাবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, মূল প্রত্যয় হল পণ্য, অর্থ ও পুঁজি। বিশিষ্ট বিজ্ঞানের সঙ্গে এক্ষেত্রে পার্থক্য হল, দর্শনের প্রত্যয়গুলো, সবচেয়ে সাধারণ প্রত্যয়গুলো যে কোন বিজ্ঞানেই ব্যবহৃত

---

১ ভি. আই. লেনিন কালেকটেড ওয়ার্কস, ১৪শ খণ্ড, ১২১ পৃঃ।
২ ভি. আই. লেনিন ঃ কালেকটেড ওয়ার্কস, ১৪শ খণ্ড, ১২৯ পৃঃ।

হয়। তিনি প্রকৃতিবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ অথবা সাহিত্য সমালোচক যাই হোন না কেন, কোন বৈজ্ঞানিকই এই ধরনের সাধারণ প্রত্যয় ছাড়া কাজ করতে পারেন না। যথা নিয়ম, নিয়মানুগতা, দ্বন্দ্ব, মর্ম (essence) এবং পরিদৃশ্যমান ঘটনা (phenomenon), কারণ, ও কার্য, অপরিহার্যতা, আকস্মিকতা (chance), আধেয় ও রূপ, সম্ভাবনা ও বাস্তবতা ইত্যাদি। দার্শনিক মূল প্রত্যয়গুলো ঘটনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ সংযোগের প্রকাশ এবং একই সঙ্গে আমাদের বিকাশমান জ্ঞানের একটি পর্যায়, মানুষের জাগতিক অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতাগুলোর একটি সামান্যীকরণ, চিন্তার মাধ্যম।

তবে, দর্শনের মূল প্রত্যয়গুলোর অধ্যয়ন বিশিষ্ট প্রক্রিয়াগুলোর অধ্যয়নের বিকল্প নয়। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন বাস্তবতার সবচেয়ে ব্যাপক ক্ষেত্রের জ্ঞানলাভের একটি পথপ্রদর্শক, এবং এই দর্শন এইসব বিশিষ্ট বিজ্ঞানকে অপসারিত করে না এবং করতে পারেও না। যে-সকল প্রশ্ন বিশিষ্ট বিজ্ঞান অনুশীলন করে এ তার সমাধানে কোনো তৈরী-সমাধান জোগায় না; বরং এই দর্শন সঠিক চিন্তাধারার নিয়মের সাহায্যে এবং এইসব সমাধান উদ্ভাবন করার সাধারণ পদ্ধতি দিয়ে ঐ সব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজের ভূমিকা পালন করে।

বাস্তবতার জ্ঞানের সন্ধানে সঠিক পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু জ্ঞানলাভের কোন্ পদ্ধতি সঠিক? সম্ভবতঃ পদ্ধতি বেছে নেওয়াটা বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত রুচির উপর ছেড়ে দেওয়াই কি ভাল নয়?

না, ব্যক্তিগত রুচির উপর ছেড়ে দেওয়াটা কোন কাজের কথা নয়। জ্ঞানলাভের পদ্ধতিটা নিছক প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের সমাহার এবং গবেষণার অভ্যাস বলে গণ্য করা যায় না; এটিকে হতে হবে বাস্তবতার অনুরূপ, অর্থাৎ বাস্তব জগতের নিয়মগুলোর প্রতিবিম্ব। কোনো পদ্ধতিকে যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত হতে হলে, সঠিক জ্ঞান অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে হলে, এই পদ্ধতি চিন্তাকে এমন একটা পথ দেখাবে যা নাকি বাস্তবতারই বিকাশধারার পাশাপাশি চলে। পদ্ধতির মধ্যে ঘটনাবলীর মধ্যেকার প্রকৃত সংযোগ প্রতিবিম্বিত হওয়া চাই বা বিষয়টির মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটছে পদ্ধতিতে তার প্রকাশ পাওয়া চাই।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তার সবচেয়ে সাধারণ নিয়মগুলোর ভিত্তিতেই বিজ্ঞানসম্মত দার্শনিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের নিকট থেকে আমরা এইসব জ্ঞানলাভ করি।

পুরাতন এবং আরও বেশী করে, সমকালীন বুর্জোয়া দর্শনের বিশেষ লক্ষণ হল এই যে এ চিন্তার বিজ্ঞানকে (তর্কবিদ্যা) জ্ঞানতত্ত্ব থেকে এবং উভয়কেই সত্তার (being) (তত্ত্ববিদ্যা) অনুশীলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। অন্যদিকে মার্কসীয় দর্শন তত্ত্ববিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব ও তর্কবিদ্যার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে না।

এর সূত্রগুলো সত্তা ও চিন্তা উভয়কেই তাদের প্রকৃত ঐক্যের মধ্যে ধরে রাখে। মার্কসীয় দর্শন সত্তাকে (প্রাকৃতিক ও সামাজিক) মানুষের, তার চেতনা ও চিন্তার সংগে সম্বন্ধের মধ্যে বিবেচনা করে। একই সংগে মার্কসবাদী দর্শনে জ্ঞানতত্ত্বকে তত্ত্ববিদ্যাগতভাবে প্রমাণ করা হয়, যেহেতু জ্ঞানলাভ ও চিন্তার নিয়মগুলো শেষ পর্যন্ত মানুষের চৈতন্য-জগতে সত্তার সাধারণ নিয়মগুলোরই প্রতিবিম্ব। তার চেয়েও বড় কথা চিন্তা ও চেতনা তার সমস্ত উপাদানকে আহরণ করে বাস্তবতা থেকে ব্যক্তির ব্যবহারিক কাজকর্মের মাধ্যমে এবং সেই জন্যেই মার্কসীয় দর্শনে জানার সমস্যার সমাধান, মানুষের সামাজিক স্বরূপ, তার সত্তার প্রশ্নটির সমাধানের সংগে অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। এই কারণেই লেনিন লিখেছিলেন, "হেগেলের সংগে ঐক্যমতো যেমন মার্কস বুঝেছিলেন —যাকে বলা হয় এখন জ্ঞানতত্ত্ব বা জ্ঞানতন্ত্র, সেটিকে ও তার বিষয়বস্তুকে বিচার করতে হবে ঐতিহাসিকভাবে, জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশের অনুশীলন ও সামান্যীকরণ কোরে, অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানে উত্তীর্ণ হয়ে তাকেও অন্তর্ভুক্ত করে"[১] ডায়ালেকটিকস।

তবে, ডায়ালেকটিকস, তর্কবিদ্যা ও জ্ঞানতত্ত্বের সাধারণ ঐক্যের মধ্যে তাদের পার্থক্যটি সুনির্দিষ্ট। ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে এই সকল পার্থক্য আপেক্ষিক চরিত্রের।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মার্কসীয় দর্শনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি ছাড়া ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টি থাকতে পারে না। মার্কসীয় দর্শনের সকল দিকের ঐক্যের উপর জোর দিয়ে লেনিন বলেছিলেন যে এই দর্শনের মধ্যে, "যেটি এক টুকরো ইস্পাত থেকে ঢালাই করা, আপনি একটি মৌলিক প্রতিজ্ঞাকে, একটি অপরিহার্য অংশকেও বিষয়গত সত্য থেকে সরে না গিয়ে, বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলদের মিথ্যাচারের শিকার না হয়ে, বিনষ্ট করতে পারেন না।"[২] মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের কাঠামো জটিল—আরও বেশী এই কারণে যে জীবন সর্বদাই অজানা সমস্যাকে জানার জন্যে নতুন নতুন লক্ষ্য স্থির করছে, এবং সেইজন্যে দর্শনের বিষয়বস্তুতে পরিবর্তনের সূচনা হয়, এর বিষয়বস্তুর নতুন নতুন দিক সামনে আসে। আজকাল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন একটি দর্শন-প্রস্থান, একটি সন্নিবদ্ধ বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি যা একই সঙ্গে জ্ঞানতত্ত্ব, তর্কবিদ্যা ও একটি সাধারণ সমাজবিদ্যা। এটি নীতিবিজ্ঞান ও নন্দনতত্ত্ব রচনার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করে; অবশ্য ভবিষ্যতে এগুলো দর্শন থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে জ্ঞানের বিশেষ শাখায় পরিণত হতে পারে।

ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় প্রতিপন্ন হয় যে দর্শন তখনই কার্যকর হয়ে ওঠে যখন তার ভিত্তি হয় সমগ্র মানবজ্ঞান। বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েই পরস্পরের

১ ভি. আই. লেনিন: কালেকটেড ওয়ার্কস, ২১শ খণ্ড, ৫৪ পৃঃ।
২ ভি. আই. লেনিন. কালেকটেড ওয়ার্কস, ২১শ খণ্ড, পৃঃ ৩২৬

কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে লাভবান হয়েছে। অনেক ধারণা, যা সমকালীন বিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করেছে, তা প্রথম এসেছিল দর্শনের কাছ থেকে। এক্ষেত্রে বস্তুর পারমাণবিক গঠন সম্বন্ধে লিউসিপ্পাস ও ডেমোক্রিটাসের অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টির কথা উল্লেখ করা যায়। আমরা দেকার্তের পরাবর্ত সম্বন্ধীয় প্রত্যয়, মস্তিষ্ককেন্দ্রের গতিদায়ক প্রতিক্রিয়াগুলো এবং গতির নিত্যতা সংক্রান্ত, (বেগের দ্বারা ভরের গুণের ধ্রুবক) যে-নীতি তিনি সূত্রায়িত করেছিলেন, সেইসব প্রত্যয় গুলোর কথা উল্লেখ করতে পারি। পরমাণু দিয়ে গড়া জটিল কণিকা হিসেবে অণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা বিকশিত হয়েছিল সাধারণ দার্শনিক স্তরে ফরাসী দার্শনিক পিয়েরে গাসেন্দি এবং মিখায়েল লোমনসভের রচনায়। দার্শনিকরাই ঘটনাপুঞ্জের সাধারণ বিকাশ ও পরস্পর সংযোগ, জগতের বাস্তব ঐক্যের নীতি-গুলো সূত্রায়িত করেছেন। লেনিন বস্তুর যে অবিনশ্বরতার নীতিকে প্রকাশ করেছিলেন, তা এখন আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মৌল ধারণায় পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই দর্শনেও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে প্রতিটি বড় বড় নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুবাদের অবয়বে পরিবর্তন ঘটেছে।

তুলনামূলকভাবে হালে আধুনিক বুর্জোয়া দর্শনের একটি ব্যাপক প্রবণতা, নব্য প্রত্যক্ষবাদ এই মত পোষণ করতো যে বিজ্ঞানের আর দর্শনের কোন প্রয়োজন নেই। উদাহরণস্বরূপ, হানস রেইকেনবাখ বলেছেন যে আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দর্শনের সাহায্য না নিয়ে দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। এই সঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন যে বেশীর ভাগ দার্শনিক সমস্যাই অলীক সমস্যা অর্থাৎ তাদের কোন বৈজ্ঞানিক অর্থ নেই। দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যেকার সম্পর্ক সম্বন্ধে এই বিচারকে আজকাল নব্য-প্রত্যক্ষবাদীরাও নিন্দা করছেন, কারণ দেখা গেছে এটা নীতির দিক থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোন কাজে আসবে না; প্রকৃতি-বিজ্ঞান নিজেই দর্শনের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করছে।

আজকাল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পরস্পরের সঙ্গে সন্নিবদ্ধ হওয়ার জোরালো প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই বিজ্ঞান এখন মৌল কণাগুলোর সাধারণ তত্ত্ব, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের বিকাশের সাধারণ চিত্র, সংস্থিতির (system) তত্ত্ব, নিয়ন্ত্রণ তত্ত্ব ইত্যাদির সাধারণ তত্ত্ব অনুসন্ধান করছে। এত উন্নত পর্যায়ে সামান্যীকরণ করা শুধু দার্শনিক জ্ঞানের ব্যাপক সমৃদ্ধির ফলেই সম্ভব। ডায়ালেকটিক পদ্ধতিসহ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন দ্রুত প্রসারমান, গূহায়িত, অসীম বৈচিত্র্যসম্পন্ন জ্ঞান-জগতের সকল দিকের ঐক্য ও পারস্পরিক সম্পর্ককে সুনিশ্চিত করতে সাহায্য করে। বিভিন্ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞানের যুক্তিসিদ্ধ হাতিয়ারকে, তত্ত্বের প্রকৃতিকে, এবং যে উপায়ে এটি গড়ে ওঠে তাকে পরীক্ষা করার, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও তত্ত্বগত জ্ঞানের মধ্যে সম্পর্কের, বিজ্ঞানের

প্রারম্ভিক প্রত্যয় এবং সত্য জ্ঞানলাভের পদ্ধতির বিশ্লেষণ করার নিরন্তর ও ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। এসবই দার্শনিক অনুসন্ধানের প্রত্যক্ষ কর্তব্য।

যে বিজ্ঞানী দার্শনিক চিন্তাধারা আয়ত্ত করেন নি তিনি নতুন তথ্যের ব্যাখ্যা করার সময় প্রায়ই গুরুতর দার্শনিক ও পদ্ধতিগত ভুল করেন। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস তাঁর সময়ে মন্তব্য করেছিলেন যে দর্শন সেইসব প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের উপর প্রতিশোধ নেয় যাঁরা এটিকে অগ্রাহ্য করেন। বহু বিজ্ঞানী, যাঁরা অসম্ভব কুসংস্কার ও অধ্যাত্মবাদে আসক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের উদ্ধৃত করে তাঁর বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে তত্ত্বগত চিন্তাকে অবজ্ঞা করে অনুমান-বীতরাগ অভিজ্ঞতাবাদকে প্রশ্রয় দিলে বিজ্ঞান রহস্যবাদে পরিণত হয়।

আজকালকার দিকপাল বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে দার্শনিক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির প্রচণ্ড মনোভাব-পরিবর্তনকারী তাৎপর্য সম্বন্ধে অনবরত গুরুত্ব দিয়ে চলেছেন। ম্যাকস প্লাঙ্ক বলেন যে বিজ্ঞানীর বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদাই তাঁর গবেষণার দিকনির্ণয় করে। লুই ডি ব্রগ্‌লি দেখিয়েছেন, ১৯শ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও দর্শনের বিচ্ছিন্নতা প্রকৃতিবিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েরই ক্ষতি করে। ম্যাকস বর্‌ন ঘোষণা করেছেন, দার্শনিক পদ্ধতি ও ফলাফল সম্বন্ধে অবহিত হলেই পদার্থবিদ্যা টিকে থাকতে পারে।

বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদ্ধতি হিসেবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এবং নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থার বিকাশের মধ্যেকার নিয়মাধীন সম্পর্ককে বুঝতে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং তাদের প্রযুক্তিগত প্রয়োগের সামাজিক তাৎপর্য এবং সাধারণ সম্ভাবনা সম্বন্ধে গভীর উপলব্ধি অর্জনে সাহায্য করে।

আধুনিক সমাজ-জীবনের গোটা জটিল চিত্র দর্শনের নিকট থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। কলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আবার সামনে আসছে। এর কারণ হল সামাজিক অনুসন্ধানের ফলাফলের বিকাশ ও প্রয়োগ আজকাল তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক তাৎপর্যলাভ করেছে। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব বিস্তৃত হচ্ছে, সমাজ জীবনের কাঠামোই হয়ে উঠছে আরও জটিল, নতুন নতুন মানব-কর্মকাণ্ড আবির্ভূত হচ্ছে এবং সমাজ-জীবনে সমাজ পরিবর্তনের ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ অনবরত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তীব্র মতাদর্শগত সংঘাতের এই পরিস্থিতিতে যাঁরা বিশিষ্ট জ্ঞানের ক্ষেত্রে কাজ করছেন ও বৈজ্ঞানিক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি উপযুক্তভাবে আয়ত্ত করেন নি, তাঁরা প্রায়ই নিজের বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রভাবের সম্মুখে দুর্বল হয়ে পড়েন, এমনকি কখনও কখনও ভাববাদী দর্শনের শিকারে পরিণত হন। "এই সংগ্রামের মধ্যে তাঁর নিজেকে ধরে রাখতে এবং একে সাফল্যমণ্ডিত করতে প্রকৃতি

বিজ্ঞানীদের হতে হবে আধুনিক বস্তুবাদী, মার্কস যার প্রতিনিধিত্ব করেছেন সেই বস্তুবাদের সচেতন অনুগামী অর্থাৎ তাঁকে হতে হবে ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী।"[১]

উৎপাদনী শক্তিগুলো, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিজ্ঞান, রাজনীতি, শ্রেণী এবং জাতীয় সম্পর্ক, বুদ্ধিগত পেশা, সংস্কৃতি এবং প্রাত্যহিক জীবন—আধুনিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র যেমন—উৎপাদনী শক্তি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, রাজনীতি, শ্রেণী ও জাতীয় সম্পর্ক, বৌদ্ধিক অনুসন্ধান, সংস্কৃতি ও দৈনন্দিন জীবন—সবই বিপ্লবী পরিবর্তনের প্রসব বেদনার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। মানুষ নিজেই পরিবর্তিত হচ্ছে। কিসের কারণে এই বিপ্লব ঘটছে যা সমস্ত পৃথিবীকে, মানবজীবনের সকল দিককে পরিবর্তিত করছে? কোন দিক দিয়ে পৃথিবীব্যাপী বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিকগুলো সংযুক্ত ও পরস্পর-নির্ভরশীল? এর চালিকাশক্তি কী? যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব আমরা দেখছি তার সামাজিক পরিণাম কী হবে? মানবজাতি কোথায় চলেছে? জনগণ যেসব সৃষ্টি করে ও সেগুলোকে গতিশীল করে তোলে, সেইসব প্রচণ্ড শক্তি কেন তাদেরই বিরুদ্ধে যায়? যতই বিরাট তাৎপর্যযুক্ত হোক কোনো একটি বিশিষ্ট বিজ্ঞান আমাদের কালের এইসব এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। এগুলো দার্শনিক প্রশ্ন—আমরা কেমন করে জগৎকে দেখবো, সেই সংক্রান্ত প্রশ্ন। এগুলোর উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের মধ্যে।

সকল নিপীড়ন থেকে মানব জাতির মুক্তির সঙ্গে কীভাবে সামাজিক প্রগতি ও আধুনিক সমাজের পরিবর্তন জড়িত—মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন সেই অবস্থান থেকে ওগুলোকে বিচার করে। এই দর্শনের অন্যতম প্রধান নীতি বিপ্লবী মানবতাবাদ। এই মানবতাবাদ মানব ব্যক্তিত্বের পূর্ণ, সর্বাঙ্গীন ও সুষমান্বিত বিকাশের স্বার্থে সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর সম্পর্কে অবহিত করে।

৫. দর্শনে পক্ষাবলম্বন

দার্শনিক বিশ্ব বীক্ষার একটি শ্রেণীগত, পক্ষপাতমূলক চরিত্র আছে। দার্শনিক বিশ্ব-বীক্ষার পক্ষপাতিত্ব বলতে কী বোঝায়? এর অর্থ বস্তুবাদ অথবা ভাববাদ—প্রধান দুটি দার্শনিক পক্ষের একটির প্রতি আনুগত্য।

সমকালীন শোধনবাদীরা এইমত পোষণ করে যে দর্শন সম্পর্কে কমিউনিস্টদের নিরপেক্ষ থাকা উচিত। তাদের কর্মসূচী বস্তুবাদী, ভাববাদী, নিরীশ্বরবাদী অথবা ধর্মীয় কোনটাই হবে না। এই শোধনবাদী প্রচার সমস্ত

১. ভি. আই. লেনিন: কালেকটেড ওয়ার্কস, ৩৩শ খণ্ড, ২৩৩ পৃঃ

শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা হিসেবে উপস্থাপিত করা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে এটি আমাদের বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে সরে যেতে আহ্বান জানাচ্ছে। আর আমরা জানি বুর্জোয়া মতাদর্শ আসলে ভাববাদে পরিপূর্ণ। শোধনবাদীদের বুর্জোয়া মতাদর্শ তোষণের বিপরীতে মার্কসবাদী-লেনিন বাদী দর্শন বস্তুবাদের দৃঢ় সমর্থনে খোলাখুলিভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং পক্ষপাতী। শোধনবাদীরা বলে যে দার্শনিক তত্ত্বের পক্ষপাতিত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে মার্কসবাদীরা দার্শনিকদের বস্তুবাদী ও ভাববাদী—এই দুই শিবিরে বিভক্ত করার অতিসরলীকরণকে প্রশ্রয় দেয়—এবং এইভাবে অনেক দার্শনিক ও সমাজবিদ্যার অন্যান্য বিজ্ঞানীদের বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে, আর নিজেরা অ-মার্কসীয় দর্শন, সমাজবিদ্যা, অর্থনৈতিক তত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদির মধ্যে যা কিছু মূল্যবান তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে। দর্শনকে বস্তুবাদ ও ভাববাদে ভাগ করলে অতিসরলীকরণ করা হয়, শোধনবাদীদের এই অভিযোগ খুবই বিস্ময়কর। মার্কসবাদীরা দর্শনকে বস্তুবাদ ও ভাববাদে বিভক্ত করে নি। স্মরণাতীতকাল থেকেই দার্শনিকরা নিজেদের দুভাগে বিভক্ত করেছেন, এবং ভাগটা আজ পর্যন্ত চলে আসছে। এটা দর্শনের ইতিহাসের একটি বাস্তব ঘটনা। বস্তুবাদ ও ভাববাদ দর্শনের দুটি যুদ্ধমান গোষ্ঠী। তাদের মধ্যেকার সংগ্রাম অতীতে চলেছিল এবং আজও চলছে। লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন যে, অত্যন্ত আধুনিক দর্শনও ২০০০ বছর আগেকার দর্শনের মতই পক্ষপাতী। বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যেকার সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত সমাজের শ্রেণীগুলোর সংগ্রামকেই প্রতিফলিত করে।

সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম বিভিন্ন বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির সংগ্রামের মধ্যে প্রকাশ পায়। এই সংগ্রাম, যা সমস্ত শ্রেণীসমাজের বিকাশের আগাগোড়াই চলেছে, তা ইতিহাসের মোড় ঘোরার সময়ে তীব্র আকার ধারণ করে। তখন প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যেকার সংগ্রাম শুধু রাজনীতি ও অর্থনীতিতেই তীব্র হয়ে ওঠে না, মতাদর্শ ও দর্শনের ক্ষেত্রে তা অনুভূত হয়।

বিশুদ্ধ তত্ত্বগত কাজ ছাড়াও দর্শন সব সময়েই কতকটা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজও করে থাকে।

নবজাগৃতির যুগে যখন সামন্ততন্ত্র ছিল মুমূর্ষু আর পুঁজিবাদ সবে জন্মগ্রহণ করছিল, তখন দার্শনিক বস্তুবাদ এবং মানবতাবাদের ধ্যানধারণাগুলোকে ধর্মীয় বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির আধ্যাত্মিক একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে তুলে ধরা হয়। ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী এনলাইটেনারদের দর্শন ছিল ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের মতাদর্শগত প্রস্তুতি; সাবেকি জার্মান দর্শন জার্মানীতে বুর্জোয়া বিপ্লবের পথ করে দিয়েছিল। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন সমাজতান্ত্রিক

ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবে, নতুন সমাজ সৃষ্টির ব্যবহারিক প্রয়োগে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

এ পর্যন্ত জানা মানবজাতির ইতিহাসে বর্তমান যুগই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তনের দ্বারা চিহ্নিত। এ যুগ শ্রেণী ও জাতীয় সংগ্রামের, পুঁজিবাদ ও প্রাক-পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে মানুষের অগ্রগতির যুগ ; একই সঙ্গে এটি সাম্রাজ্যবাদের শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্র, শান্তি এবং সাচ্চা গণতন্ত্রের তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রামের যুগ ; যে বুর্জোয়া মতাদর্শ মানুষের দ্বারা মানুষকে শোষণের মতাদর্শ ও কার্যকলাপ সমেত অচল পুঁজিবাদী দুনিয়ার ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করে ও তাকে রক্ষা করতে চায় তার বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট মতাদর্শের সংগ্রামের যুগ। ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ গড়ে উঠেছিল অবিচল বিপ্লবী শ্রেণী প্রলেতারিয়েতদের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে, লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের মতাদর্শগত পতাকা হিসেবে। লেনিন মন্তব্য করেছিলেন যে মার্কসের দার্শনিক বস্তুবাদ আত্মিক দাসত্ব থেকে প্রলেতারিয়েতদের মুক্তির পথ দেখিয়েছে।

সমাজ-বিপ্লবের মার্কসীয় তত্ত্ব সমাজজীবনের ঘটনাবলীর বস্তুবাদী বিচারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। একদিকে, সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক অনিবার্যতার মতবাদ ঐতিহাসিক অনিবার্যতার মধ্যে এবং অন্যদিকে, জনগণ ও শ্রমজীবী মানুষের নিয়ন্তার ভূমিকা মার্কসীয় উপলব্ধির মধ্যে দার্শনিকভাবে প্রোথিত। এই সঙ্গে সমাজবিপ্লবের মার্কসীয় তত্ত্ব সামাজিক ঘটনার ডায়ালেকটিক বিচারের সঙ্গে, বিকাশতত্ত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর এই বিকাশতত্ত্ব অনুযায়ী ক্রমাগত পরিমাণগত পরিবর্তন যুক্তিসঙ্গতভাবেই লাফ দিয়ে গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়।

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস যা কিছু গোঁড়া, রক্ষণশীল ও অচল তাকে প্রত্যাখ্যান করে। এই মতবাদে নিরন্তর অগ্রগতির পথ ও জগতের রূপান্তর সাধনে সাহসিকতাপূর্ণ বিপ্লবী সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত এবং তার আলোক-দিশারী। "…তাই এই ডায়ালেকটিক দর্শন সমস্ত চূড়ান্ত, পরম সত্য এবং তার সঙ্গে যুক্ত মানবজাতির চূড়ান্ত অবস্থাগুলির সমস্ত ধারণাকে ভেঙ্গে দেয়। কারণ এর কাছে (ডায়ালেকটিক দর্শন) শেষ, চূড়ান্ত ও পবিত্র বলে কিছু নেই। এ সব জিনিসের এবং সব জিনিসের মধ্যে পরিবর্তনশীল চরিত্রকে উদ্ঘাটিত করে ; শুধুমাত্র নিরন্তর আসা যাওয়া এবং অন্তহীনভাবে নিম্নতর থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণ ছাড়া তার সামনে আর কিছুই টিকতে পারে না। ডায়ালেকটিক দর্শন চিন্তারত মস্তিষ্কে এই প্রতিক্রিয়ার প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।"[১]

১. কার্ল মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস : সিলেকটেড ওয়ার্কস, ৩য় খণ্ড, ৩৩৯ পৃঃ

সমাজ নিম্নতর থেকে উচ্চতর বিকাশ-প্রক্রিয়ার এক নিরন্তর গতির মধ্যে রয়েছে। যে-বুর্জোয়া ধারণায় পুঁজিবাদের শাশ্বত অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি দেখানো হয়, তা শুধু প্রতিক্রিয়াশীলই নয়, স্পষ্টতই বিজ্ঞান-বিরোধী। পুঁজিবাদ অপসারিত হচ্ছে এবং বহু দেশে ইতিমধ্যেই আর একটি নতুন ও উন্নত সামাজিক ব্যবস্থা—সমাজতন্ত্রের দ্বারা অপসারিত হয়েছে।

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিদের কর্মসূচী, রণনীতি, রণকৌশল ও কর্মনীতি এবং তাদের ব্যবহারিক কাজকর্মের দার্শনিক ও পদ্ধতিগত ভিত্তি মার্কসীয় দর্শনের মধ্যে নিহিত। মার্কসবাদের রাজনৈতিক লাইন সর্বদাই "তার দার্শনিক নীতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।"[১]

শোধনবাদীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বুর্জোয়া পণ্ডিতরা তত্ত্বের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নিরপেক্ষকে বস্তুনিষ্ঠতার সমার্থবাচক বলে ঘোষণা করেন। তাঁদের কেউ কেউ এই অভিমত পোষণ করেন যে দার্শনিক তত্ত্ব সমেত সমস্ত তত্ত্বই কোন সামাজিক গোষ্ঠী, শ্রেণী ও দলের ব্যবহারিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে; তাই জ্ঞান—জ্ঞানের জন্যেই, এই তত্ত্বটি প্রতিপন্ন হয়। তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার কার্ল মার্কসের বাণী। তিনি দর্শনকে রাজনীতির সঙ্গে মিলিত হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন "এইটিই একমাত্র যুগলবন্ধন যা একালের দর্শনকে সত্যিকারের দর্শন হতে সক্ষম করে তুলবে।"[২]

রাজনৈতিক পরিবেশে বাস করে তা থেকে কেউ রেহাই পেতে পারে না। সব কিছুই আজকাল রাজনীতির আবর্তে এসে পড়ছে। যদি আমরা দর্শন ও রাজনীতির ঐক্য সম্পর্কে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতিকে দৃঢ় ও অবিচলিত ভাবে রক্ষা করতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই রাজনীতি থেকে দর্শনের বিচ্ছিন্নতাকে এবং দৈনন্দিন রাজনীতির মধ্যে দর্শনকে মিশিয়ে ফেলার সহজ-সরল প্রচেষ্টাকে একেবারে দূর করতে হবে।

বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রবক্তা ও শোধনবাদীরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না হওয়ার তারিফ করে এবং দর্শনে এক "তৃতীয় ধারা" উপস্থাপিত করে—যা নাকি বস্তুবাদ ও ভাববাদ থেকে শ্রেষ্ঠতর।

কিন্তু শ্রেণীসমাজে এমন কোন তত্ত্বজ্ঞ ও চিন্তাবিদ কি থাকতে পারেন যিনি সমস্ত শ্রেণীর ঊর্ধ্বে এবং তাদের স্বার্থকে অগ্রাহ্য করেন? এই ধরনের ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই। বাস্তবে, আমরা সর্বদাই দেখতে পাই যে যারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ না হওয়ার বড়াই করে তারাই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কিছু কম যায় না। তারা একে নির্মূল করতে চায় এবং এর বদলে হাজির করে বুর্জোয়া বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি!

---

১. ভি. আই. লেনিন: কালেকটেড ওয়ার্কস, ১৫শ খণ্ড, ৪০৫ পৃঃ

২. মার্কস-এঙ্গেলস, ওয়েকে: ২৭শ খণ্ড, ডিয়েৎস ভারলাগ, বার্লিন-এস ৪১৭

প্রতিশ্রুতিহীনতার ধারণাটি আসলে ভণ্ডামী। তার বিরুদ্ধে আমরা খোলাখুলিভাবে প্রধান মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পক্ষাবলম্বনের নীতিটিকে দাঁড় করাই। লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে "...শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজে কোন নিরপেক্ষ সমাজবিজ্ঞান থাকতে পারে না।"[১] "কোন জীবিত মানুষই কোন না কোন শ্রেণীর পক্ষ না নিয়ে (একবার যদি সে পারস্পরিক সম্পর্কটিকে বুঝে নেয়), কোন শ্রেণীর সাফল্যে আনন্দিত ও ব্যর্থতায় মর্মাহত না হয়ে, ঐ শ্রেণীর যেসব বিরোধীরা অনগ্রসর ধ্যানধারণা প্রচার করে, ঐ শ্রেণীর অগ্রগতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বাধা দেয়, তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হতে পারে না।"[২]

বুর্জোয়া মতাদর্শীরা মনে করেন যে শ্রেণীগত পক্ষাবলম্বন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেসব শ্রেণী ইতিহাসের দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিচ্ছে, তখন দর্শনে তাদের অবস্থান ও স্বার্থ প্রকাশ এবং রক্ষা করাটা নিশ্চয়ই বিজ্ঞানসম্মত পক্ষাবলম্বন নয়। এটা করতে গিয়ে দর্শন জীবনের সত্য থেকে এর বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন থেকে সরে যায়। বিপরীতভাবে, দর্শন তখনই বিষয়গত (objective) ও বিজ্ঞানসম্মত হয় যদি সে জীবনকে যথাযথভাবে প্রকাশ করে, সমাজের প্রগতিশীল শ্রেণীর অবস্থান, স্বার্থ ও সংগ্রামকে প্রকাশ করে এবং মানবজাতিকে সত্যান্বেষণে উৎসাহ যোগায়।

পক্ষাবলম্বন নানা ধরনের হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীর বস্তুবাদী দর্শন, যা নবজাত বুর্জোয়াশ্রেণীর (তৎকালীন প্রগতিশীল সামাজিক শ্রেণী) স্বার্থকে প্রকাশ করত এবং সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয় বিশ্বদৃষ্টির বিরুদ্ধে লড়াই করত, তা ছিল একটি শ্রেণীর পক্ষে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধভাবে হলেও একই সঙ্গে, বস্তুবাদ বিজ্ঞান ও গোটা সমাজের বিকাশে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এই অবস্থা একেবারে পাল্টে গেল যখন বুর্জোয়ারা আর প্রগতিশীল শ্রেণী রইল না, প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ল। এই বুর্জোয়াদের স্বার্থ হল মানুষের শোষণকে স্থায়ী করা, এবং শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা ; অর্থাৎ ঐ সব স্বার্থ ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ ধারার বিরোধী।

কোন না কোনভাবে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া স্বার্থ প্রকাশ পায় যে আধুনিক বুর্জোয়া দর্শনে সেটাও শ্রেণীগতভাবে পক্ষপাতমূলক, কিন্তু এই পক্ষপাতিত্ব আর বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, কারণ এখানে বাস্তবতার বিকৃতি ঘটে।

প্রকৃতি ও সমাজবিকাশের নিয়মগুলোকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করে

১. ভি. আই. লেনিন : কালেকটেড ওয়ার্কস, ১৯শ খণ্ড, ১৩ পৃঃ
২. ভি. আই. লেনিন : ২য় খণ্ড, ৫৩১ পৃঃ

বৈজ্ঞানিক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি সেই সব শ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা করে যারা প্রগতি ও ভবিষ্যতের পক্ষে দাঁড়ায়। বর্তমান যুগে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সবচেয়ে প্রগতিশীল দর্শন—শ্রমিকশ্রেণীর এবং তার অগ্রগামী অংশ কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের দর্শনের পক্ষপাতিত্ব এইখানেই যে এই দর্শন সচেতন ও সুসংহতভাবে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের মহান কর্তব্যের স্বার্থ পূরণ করে। পক্ষপাতিত্বের নীতি দাবী করে সমাজতন্ত্রের স্বার্থবিরোধী তত্ত্ব ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অবিচলিত ও দুর্জয় সংগ্রাম। দার্শনিক প্রশ্নে কোন সমঝোতা থাকতে পারে না। "একটাই বেছে নিতে হবে, হয় বুর্জোয়া নয় সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ। আর কোন মধ্যম পন্থা নেই (কারণ মানবজাতি তৃতীয় কোন মতাদর্শ সৃষ্টি করে নি, উপরন্তু শ্রেণী-দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ সমাজে কোন নিঃশ্রেণীক বা শ্রেণীর ঊর্ধ্বে মতাদর্শ থাকতে পারে না)। তাই, কোনভাবে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শকে খাটো করা ও এ থেকে বিন্দুমাত্র সরে যাওয়ার অর্থই হবে বুর্জোয়া মতাদর্শকে শক্তিশালী করা।"[১]

"...মার্কসীয় তত্ত্বের পথ অনুসরণ করে আমরা বেশী বেশী করে বস্তুনিষ্ঠ সত্যের নিকটবর্তী হব (কোন দিন এটা নিঃশেষ না করে); কিন্তু অন্য কোন পথ অনুসরণ করে আমরা বিভ্রান্তি ও মিথ্যা ছাড়া আর কিছুতেই পেঁছব না।"[২] বিজ্ঞান ও সামাজিক প্রয়োগের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে লেনিনের এই ধারণার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়।

সমাজের বিপ্লবী রূপান্তরের জন্যে বিপ্লবী তত্ত্বের প্রয়োজন। এই ধরনের তত্ত্ব হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং এর দার্শনিক ভিত্তি হল ডায়ালেকটিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

---

১. ভি. আই. লেনিন: কালেকটেড ওয়ার্কস, ৫ম খণ্ড, ৩৮৪ পৃ:

২. ভি. আই. লেনিন: কালেকটেড ওয়ার্কস, ১৪শ খণ্ড, ১৪৩ পৃ:

দ্বিতীয় অধ্যায়

মার্কসীয় দর্শনের উৎপত্তি ও বিকাশ

ইতিহাসে প্রথম একটা বিজ্ঞান-সম্মত দার্শনিক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গিকে উপস্থাপিত করে ডায়ালেকটিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের জন্মটা ছিল দর্শনের ইতিহাসে একটা বিপ্লব। প্রকৃতি ও সমাজ উভয়ই স্থান লাভ করল এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এবং সমাজের সচেতন কমিউনিস্ট পুনর্গঠনের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হল।

১. মার্কসবাদী উৎপত্তির সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পূর্বাবস্থা

মার্কসবাদকে গড়ে তুলল মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আত্মিক বিকাশের ধারা, বিশেষতঃ পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশ এবং ঐ সমাজের সহজাত স্ববিরোধ, প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াদের মধ্যেকার সংগ্রাম।

ইউরোপের একটির পর একটি দেশে, তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক কালের মধ্যে বুর্জোয়া বিপ্লব সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করল—যে ব্যবস্থা কয়েক শতাব্দী টিকে ছিল এবং মনে হয়েছিল অনড়। বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল পুঁজিবাদের আরও বিকাশের, ১৮শ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করল। এইভাবে অভ্যুদয় ঘটাল, একদিকে বৃহদাকারের যন্ত্রশিল্প এবং অন্যদিকে শিল্পে নিযুক্ত প্রলেতারিয়েতের।

তবে, শ্রমের উৎপাদনী শক্তির এবং সামাজিক সম্পদের প্রচণ্ড বৃদ্ধি শ্রমজীবী জনগণের অবস্থার কোন উন্নতি ঘটাল না। বিপরীতভাবে, সমাজের আর এক মেরুতে, বুর্জোয়াদের হাতে অভূতপূর্ব ধনসম্পদ সঞ্চিত হল, প্রলেতারিয়েতরা হল কাঙাল। ক্ষুদ্র উৎপাদকদের প্রলেতারিয়েতে পরিণতি, নারী ও শিশুসমেত শ্রমিকদের কঠোর শোষণ, শোচনীয় জীবনধারণের পরিবেশ, বেপরোয়া জরিমানা এবং অন্যান্য বিধিনিষেধ এবং বেকারী যা বিশেষ করে বৃদ্ধি পেল অতি-উৎপাদনের পৌনঃপুনিক অর্থনৈতিক সংকটের সময় (১৮২৫ সালে শুরু), এই ছিল পুঁজিবাদের কঠোর বাস্তব রূপ।

১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীর বুর্জোয়া মতাদর্শীরা সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কের বিলোপের কালকে চিত্রিত করতেন এমন কাল বলে যখন মুক্তি, ন্যায়বিচার, সাম্য এমনকি ভ্রাতৃত্বই প্রভাবশালী হয়ে উঠবে; কিন্তু ১৯শ শতাব্দীর পুঁজিবাদী বাস্তবতা এইসব সামাজিক দিবাস্বপ্নকে চুরমার করে দিল।

যে শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়া বিপ্লবের কালে আধিপত্য-বিস্তারকারী সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সাহায্য করেছিল, তারা পুঁজিবাদী সমাজের নতুন অবস্থায় নিজেদেরকে শ্রেণীশত্রু—মালিক-বুর্জোয়াদের সম্মুখীন দেখতে পেল। শ্রমিকদের পুঁজিবাদ বিরোধিতা প্রকাশ পেতে লাগল প্রায়ই বেশী বেশী করে ধর্মঘটের মধ্যে এবং এটা কখনও কখনও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রূপও নিয়েছিল। এই ধরনের অভ্যুত্থানগুলো হল ফ্রান্সের লাইয়ঁতে (১৮৩১ এবং ১৮৩৪), জার্মানীতে সাইলেসিয়ার তাঁতীদের মধ্যে (১৮৪৪), ইংলন্ডে (১৮৩০ এবং ১৮৪০), দেখতে পাওয়া গেল প্রথম বৈপ্লবিক প্রলেতারিতদের আন্দোলন—চার্টিস্টবাদের মধ্যে। সেকালে নিজেদের মুক্তির জন্যে শ্রমিকদের সংগ্রাম ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং অসংগঠিত চরিত্রের, তাদের স্বচ্ছ শ্রেণীচেতনা ও পুঁজিবাদী নিপীড়ন অবসানের পথ ও উপায় সম্বন্ধে বোধের অভাব ছিল।

মার্কস ও এঙ্গেলসই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনের বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁরা প্রমাণ করলেন যে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের স্বতঃস্ফূর্ততা, সংগঠনহীনতা এবং বিচ্ছিন্নতা ইতিহাসের একটা সাময়িক পর্যায় এবং এই অবস্থা কাটানো যেতে পারে শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে একটা বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ করে, গণ-প্রলেতারিয়েত পার্টি সংগঠিত করে। এরাই যে প্রলেতারিয়েতের অগ্রগামী বাহিনী ও নেতা হবে, তা সুনিশ্চিত। তা সত্ত্বেও (১৮৪০ সালেই) সমাজতন্ত্রের বুর্জোয়া সমালোচকরা মার্কসবাদকে প্রলেতারিয়েতের অন্ধ ভক্ত বলে সমালোচনা করেছিল। তবে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র একটা "নতুন ধর্ম", এই বিকৃত ধারণাকে খণ্ডন করে মার্কস ও এঙ্গেলস দেখিয়েছিলেন যে, প্রলেতারিয়েত হল বৃহদায়তন পুঁজিবাদী শিল্পের অনিবার্য সৃষ্টি এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এর সংগ্রাম এই সমাজব্যবস্থারই সহজাত দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক প্রকাশ।

যারাই শোষিত এবং নিপীড়িত তাদের সকলকেই মুক্ত করতে পারে একমাত্র প্রলেতারিয়েতই। সমস্ত প্রকার শোষণের অর্থনৈতিক অবস্থাকে ধ্বংস না করে এরা নিজেদের মুক্ত করতে পারে না। মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজ বিকাশের, প্রধানত ধনতান্ত্রিক বিকাশের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর এই ঐতিহাসিক মুক্তির আদর্শ এবং ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে বিপ্লবী উত্তরণ সম্বন্ধে (পরে শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজে) এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁরা পরিচালিত হয়েছিলেন তাঁদেরই প্রতিষ্ঠিত ডায়ালেকটিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নতুন দর্শনের দ্বারা।

২. ডায়ালেকটিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বগত উৎস

এইভাবেই আমরা দেখতে পাই উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপে যে বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতি গড়ে উঠেছিল সেই প্রেক্ষাপটেই মার্কসবাদের সৃষ্টি সম্ভব ও অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সৃষ্টির জন্যে বাস্তব পরিস্থিতি ছাড়াও আরও কিছুর দরকার হয়। এ জন্যে অপরিহার্য হল বিষয়ীগত ক্রিয়াকলাপ, পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে গ্রহণ বর্জনের মধ্যে দিয়ে আয়ত্ত করা ও তার বিকাশসাধন এবং নতুন নতুন তথ্য ও প্রক্রিয়ার পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

লেনিন বলেছিলেন যে মার্কসের শিক্ষা লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়কে জয় করেছে, কারণ তিনি "...তাঁর রচনাবলীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পুঁজিবাদের আওতায় অর্জিত মানব জ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির উপর।...কিন্তু মানব-চিন্তার যা-কিছু ফসল তার সব কিছুতেই তিনি পুনর্বিচার ও সমালোচনার বিষয়বস্তু করেছিলেন এবং শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে যাচাই করেছিলেন। তারপর সেখান থেকে তিনি যে-সিদ্ধান্ত করেছিলেন—তা বুর্জোয়া সীমাবদ্ধতার মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অথবা বুর্জোয়া সংস্কারের মধ্যে আটক লোকেরা করতে পারবে না।"[১]

মার্কসবাদের তাত্ত্বিক উৎস হল সাবেকী জার্মান দর্শন, ইংলণ্ডের সাবেকী অর্থনীতি এবং ফরাসী ইউরোপীয় সমাজতন্ত্র। এখানে আমরা বিচার করব সাবেকী জার্মান দর্শনকে।

মার্কসীয় দর্শন বস্তুবাদী বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির উচ্চতম রূপ। মার্কস ও এঙ্গেলস পূর্ববর্তী বস্তুবাদী দার্শনিকদের লক্ষ সাফল্যকে, তাঁদের এইসব ধারণাগুলোকে যে„ অতিপ্রাকৃত কারণের সাহায্য না নিয়ে জগতের ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে জগতেরই মধ্যে, বস্তু ও তার স্বকীয় গতির মতবাদ, সত্তার প্রতিবিম্ব হিসেবে জ্ঞানের মতবাদ, তাঁদের নিরীশ্বরবাদ, মানব ইতিহাসকে বাস্তব উপাদান দিয়ে ব্যাখ্যা করার মতবাদ ইত্যাদিকে পুরোপুরি উপলব্ধি করেছিলেন। একই সঙ্গে এই ধরণের বস্তুবাদের সংকীর্ণতার দিকেও তাঁরা অঙ্গুলিনির্দেশ করেছিলেন। মার্কসবাদের পূর্ববতী বস্তুবাদ প্রধানতঃ **যান্ত্রিক ধরণের** ছিল অর্থাৎ বলা যায় যে, এ প্রকৃতি ও সমাজের বহুবিধ ঘটনাকে ব্যাখ্যা করত গতির যান্ত্রিক নিয়ম দ্বারা। যে যান্ত্রিক মতবাদ জগতের ধর্মীয় ব্যাখ্যার বিরোধিতা করত তা ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে ছিল প্রগতিশীল, তখন বিজ্ঞানের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত ছিল বলবিদ্যা (mechanics)। তবে, ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জৈবিক, মানসিক

[১] ভি. আই. লেনিন : কালেকটেড ওয়ার্কস, ৩১শ খণ্ড, ২৮৬-৮৭ পৃঃ

ও সামাজিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার সময়ে বলবিদ্যার অসম্পূর্ণতা প্রকট হয়ে পড়ে।

মার্কসবাদের পূর্ববর্তী বস্তুবাদ প্রধানতঃ **অধিবিদ্যক** ছিল অর্থাৎ বলা যায় এটি প্রকৃতি এবং সমাজকে মূলতঃ পরিবর্তনহীন, রূপান্তরহীন হিসেবে গণ্য করত। এ কথার অর্থ এই নয় যে প্রাক-মার্কসীয় বস্তুবাদ বস্তুর গতিকে অস্বীকার করত এবং সাধারণভাবে পরিবর্তন এবং বিকাশের স্বতন্ত্র ঘটনাকে তারা গ্রহণ করতে অস্বীকার করত। তাদের কেউ কেউ অজৈব প্রকৃতির মধ্যে যেসব পরিবর্তন ঘটে এবং জীবন্ত প্রাণীদের অন্য প্রজাতি থেকে কোন প্রজাতির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কিছু খুবই ভাল ভাল আন্দাজ করেছিলেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে প্রাক-মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শনের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল বিকাশের বিশ্বজনীনতা উপলব্ধি করার অক্ষমতা, কেবলমাত্র যা ছিল তারই হ্রাস-বৃদ্ধি হিসেবে বিকাশকে ব্যাখ্যা করা। এই ধারণা অনুসারে গতিকেও বুঝতে হবে প্রধানত দেশ ও কালে সরে যাওয়া, চিরন্তন পুনরাবৃত্তিতে প্রাকৃতিক ঘটনার চক্রাকার আবর্তন হিসেবে। এটা বলার প্রয়োজন নেই যে শুধু বস্তুবাদীরাই নয়, ভাববাদীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশও তখনকার দিনে অধি-বিদ্যকই ছিল।

পুরনো বস্তুবাদের তৃতীয় ত্রুটি ছিল এই যে প্রকৃতির বস্তুবাদী উপলব্ধির মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখত এবং সেই জন্যে **সমাজজীবন সম্পর্কে বস্তুবাদী ধারণার** জন্ম দিতে পারে নি। এটা স্বীকার করতেই হবে যে প্রাক-মার্কসীয় বস্তুবাদীরা ইতিহাসের ধর্মীয় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধতা করেছিলেন। তাঁরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে অতিপ্রাকৃত নয় বরং প্রাকৃতিক শক্তিই সমাজ জীবনে ক্রিয়াশীল। কিন্তু সামাজিক গতির উৎসকে ওঁরা দেখেছিলেন আত্মিক ও মানসিক উপাদানের মধ্যেঃ ঐতিহাসিক ব্যক্তি, রাজা ও রাষ্ট্রনীতিবিদের সচেতন ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অথবা মানুষের অনুভূতি ও কামনা-বাসনার মধ্যে, যথা সেনাপতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা, স্বার্থপরতা, প্রেম, ঘৃণা অথবা দার্শনিক এবং রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদের নতুন ধ্যান ধারণার মধ্যে। সত্যিই কর্মে এইসব ভাবজাত প্রেরণার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু যেটা প্রাক-মার্কসীয় বস্তুবাদীরা দেখতে পান নি তাহল এইসব ভাবের, অনুভূতির এবং আবেগের বাস্তব উৎস, সামাজিক জীবনের বাস্তব ভিত্তিকে।

১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীর যান্ত্রিক ও অধিবিদ্যক লক্ষণযুক্ত বস্তুবাদের সমালোচনা করেন ১৮শ শতকের শেষ ভাগের এবং ১৯শ শতকের গোড়ার দিকের জার্মানীর সাবেকী দার্শনিকরা, বিশেষতঃ হেগেল। হেগেল এরকম ভাবতেন যে বস্তুবাদ স্বাভাবিকভাবেই যান্ত্রিক ও অধিবিদ্যক এবং সেই জন্যে ডায়ালেকটিকস এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বস্তুবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামে হেগেল ভাববাদী ভিত্তিতে গড়ে তুলেছিলেন বিকাশের ডায়ালেকটিক মতবাদ। এখান থেকেই

তাঁর পার্থক্য সূচিত হল যে, বিকাশ প্রভাবিত হয় ঘটনার মধ্যে সহজাত দ্বন্দ্বের দ্বারা। দ্বন্দ্বের বর্ণনা দিয়ে হেগেল জোরের সঙ্গে বললেন, এটাকে গরমিল হিসেবে ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়! দ্বন্দ্ব হল বিপরীতের মিথস্ক্রিয়া (interaction) এটা হল সকল নিজস্ব গতির নিয়ম।" পরিনামত, একটি জিনিসের জীবন ততক্ষণ আছে, যতক্ষণ তার মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, উপরন্তু সেটাই হল শক্তি যা দ্বন্দ্বের ধারক এবং এর স্থায়িত্ব বিধান করে।"[১]

এতাবৎকালে উপলব্ধ বিকাশ-তত্ত্বের মধ্যে হেগেলের ডায়ালেকটিসই ছিল পূর্ণতম, যদিও একে একে ভ্রান্ত ও ভাববাদী অবস্থান থেকে গড়ে তোলা হয়েছিল। কার্ল মার্কস বলেছিলেন, "হেগেলের হাতে ডায়ালেকটিকস যে রহস্যাচ্ছন্ন হয়েছে, তার ফলে কিন্তু এর সাধারণ রূপটিকে সর্বাঙ্গীণ ও সচেতন-ভাবে সর্বপ্রথম উপস্থাপিত করার পথে কোন বাধা সৃষ্টি হয় নি। তাঁর কাছে এটা মাথার উপর ভর করে দাঁড়িয়েছিল। যদি আপনাকে এর রহস্যাবৃত খোলের মধ্যে থেকে যুক্তিসিদ্ধ শাঁসটিকে আবিষ্কার করতে হয় তাহলে এটাকে আবার সঠিকভাবে উল্টো করে দাঁড় করাতে হবে।"[২]

হেগেলীয় ডায়ালেকটিকস-এর যৌক্তিক নির্যাস হল, বিকাশধারার বিশ্বজনীনতা, মর্ম ও অপরিহার্যতার ধারণা। বিকাশ ঘটে থাকে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের উদ্ভব ও মীমাংসার মাধ্যমে—বিপরীতের পারস্পরিক উত্তরণে, পরিমাণ থেকে গুণগত উল্লম্ফন সদৃশ উত্তরণে, নতুনের দ্বারা পুরাতনের অবলোপে। জগৎ-বিকাশের অবিরাম প্রক্রিয়ার সম্পর্কে হেগেলের দর্শনের মৌল প্রতিপাদ্য বিষয়টি যুক্তিসঙ্গতভাবে এই বিপ্লবী সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিল যে বর্তমান সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মূল রয়েছে নিত্য পরিবর্তন ও বিকাশের সর্বজনীন নিয়মের মধ্যে এবং সেইজন্যেই তা যুক্তিসঙ্গত ও অপরিহার্য।

তবে, হেগেল নিজে, একজন ভাববাদী হিসেবে প্রকৃতি ও সমাজকে আত্মিক ও দৈবী সত্তার নিরপেক্ষ ধারণার প্রতিমূর্তি বলে গণ্য করতেন। হেগেলের মতে বিকাশ ঘটে শুধু চেতনা ও সার্বিক প্রজ্ঞার স্তরে, যার চরম প্রকাশ হ'ল মানব চিন্তা। হেগেল বস্তু ও প্রকৃতির বিকাশকে স্বীকার করতেন না। এগুলো তাঁর কাছে ছিল শুধু নিরপেক্ষ ধারণার বাহ্যিক প্রকাশ।

হেগেলের ভাববাদকে সমালোচনা করবার সময় মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা ফয়ারবাখের বস্তুবাদী দর্শনের উপর ভিত্তি করেছিলেন। হেগেলীয় ভাববাদের বিপরীতে, ফয়ারবাখ নৃতাত্ত্বিক বস্তুবাদের (anthropological materialism) পক্ষ সমর্থন করতেন; যার মতে, চিন্তা কোন দিব্য সত্তাযুক্ত নয়, বরং মস্তিষ্ক থেকে, মানব দেহ থেকে অবিচ্ছেদ্য একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা

১. জি. ডবলু. এফ. হেগেল: ওয়াই সেন স্যাফ্ট ডার লজিক, জোরাইটেস বাণ, নুরেনবার্গ ১৮১৩, ৫৯ এস

২. কার্লমার্কস: ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, ২০ পৃঃ, মস্কো—১৯৫৯

এবং বহির্জগতের ইন্দ্রিয়জ্ঞাত প্রতিবিম্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। ফয়ারবাখ মানুষকে প্রকৃতির চরমতম প্রকাশ বলে গণ্য করতেন; মানুষের মাধ্যমেই প্রকৃতি অনুভব করে, চিন্তা করে, প্রত্যক্ষ করে এবং নিজেকে জানতে পারে। ফয়ারবাখ মানুষ ও প্রকৃতির ঐক্যের উপর জোর দিতেন এবং একই সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে মানুষেয় পার্থক্যকে উদ্ঘাটিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি সঙ্গলিপ্সাকে, অন্যের সঙ্গে একত্র থাকবার আকাঙ্ক্ষাকে মানব-প্রকৃতির অপরিহার্য অঙ্গ বলে দেখতেন। কিন্তু তিনি মানবসমাজের স্বরূপ এবং এর বিকাশের নিয়মগুলো উপলব্ধি করতে পারেন নি, কারণ মানুষের মেলামেশাকে তিনি কেবল প্রেম ও আত্মিক ঘনিষ্ঠতা বলে মনে করতেন। ফয়ার-বাখ হেগেলের ডায়ালেকটিকসকে গুরুত্ব দেন নি এবং এটা বুঝতে পারেন নি যে ভাববাদ থেকে মুক্ত করে ও বস্তুবাদী ভিত্তিতে এর অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব এবং তা রাখতে হবে।

ফয়ারবাখের মতবাদের মধ্যে সামাজিক ঘটনাবলীর বস্তুবাদী ব্যাখ্যার কিছু প্রাথমিক উপাদান ছিল, বিশেষতঃ ধর্ম সম্বন্ধে সমালোচনা তাঁর দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীর নিরীশ্বর-বাদীদের মত ফয়ারবাখ ধর্মের উদ্ভব ও অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতপ্রসূত ও ভাঁওতা বলে মনে করেন নি। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন কীভাবে ধর্মীয় ভাবমূর্তির মধ্যে লোকের জীবন ও দুঃখ দুর্দশা, সুখ-শান্তির আকাঙ্ক্ষা এবং প্রকৃতির উপর তাদের নির্ভরশীলতা প্রকাশ পায়। তবে তিনি এটা দেখতে পান নি যে ধর্মের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল রয়েছে সমাজবিকাশের স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিগুলোর আধিপত্যের মধ্যে, জনগণের দারিদ্র্যের মধ্যে, সামাজিক অসাম্য ও শোষণের মধ্যে। ফয়ারবাখের দর্শনের মধ্যে নিরীশ্বরবাদের সঙ্গে ধর্মীয় ধ্যান ধারণার একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা রয়েছে। মানুষের উপর একটা মানবতাবাদী আস্থার আবশ্যকতাকে তিনি কোন না কোন রকম ধর্মের নিকটআত্মীয় বলে মনে করেন। ফয়ারবাখের বস্তুবাদ সাবেকী জার্মান দর্শনের বিকাশধারার শেষ পর্ব এবং তা অনস্বীকার্যভাবে দার্শনিক বস্তুবাদের পরবর্তী বিকাশধারার একটা সাধারণ ইঙ্গিত দিয়ে যায়। এটা থেকেই মার্কস ও এঙ্গেলসের দার্শনিক মতের উপর তাঁর দর্শনের (হেগেলের মতই) প্রভাব বোঝা যায়।

৩. মার্কসীয় দর্শন ও উনিশ শতকের মধ্যভাগের বিরাট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

পুঁজিবাদের বিকাশ এবং বৃহদাকার শিল্পের অগ্রগতি বৈজ্ঞানিক প্রগতিকে উদ্দীপিত করল এবং পালাক্রমে এগুলো কেবল উৎপাদনেরই উন্নতি ঘটাল না

অধিকন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে ভাববাদী এবং অধিবিদ্যক উপলব্ধিকেও দুর্বল করে দিল। ১৮৩০ এবং ১৮৬০ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে তাৎপর্য-পূর্ণ সাফল্য, যাকে মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের দর্শনের সমর্থন এবং এর বিকাশের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে দেখেছিলেন, তাহল শক্তির রূপান্তরের নিয়মের আবিষ্কার, জীবদেহের কোষগত কাঠামো ও ডারউইনের বিবর্তনবাদ।

প্রাচীনকালের বস্তুবাদীরা এটাকে স্বীকার্য বলে ধরতেন যে, বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ নেই। ১৭শ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক ও বিজ্ঞানী দেকার্ত বিজ্ঞানে গতির পরিমাণের নিত্যতার নীতিটিকে প্রবর্তন করেন। ১৮শ শতাব্দীতে রাশিয়ার মিখায়েল লোমনসভ এবং ফ্রান্সে আন্তোয়ানে লেভইসিয়ার পরীক্ষার মাধ্যমে বস্তু ও গতির পরিমাণের নিত্যতার নীতিকে প্রমাণিত ও সূত্রায়িত করলেন।

১৮৪০ সালের গোড়ায় জার্মান পদার্থবিদ জুলিয়াস রবার্ট মেয়ার শক্তির রূপান্তর ও নিত্যতার সূত্র বিবৃত করেন। এই সূত্র অনুযায়ী কিছু পরিমাণ গতি এর যে কোন রূপে (যান্ত্রিক, তাপীয়) একই পরিমাণে অন্য আর একটি রূপে পরিবর্তিত করা যায়। এই নিয়মটিকে তত্ত্বের দিক থেকে এবং পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন হেলম্‌হোলৎজ ও ফ্যারাডে। আর জোলে ও লেনজ্ তাপের যান্ত্রিক সমতুলকে প্রতিষ্ঠা করেন অর্থাৎ তাঁরা হিসেব করলেন তাপীয় শক্তির এক ইউনিট জোগাতে হলে কতটা পরিমাণ যান্ত্রিক শক্তির প্রয়োজন হবে। এটা প্রমাণিত হল যে তাপ, আলোক ও বস্তুর অন্যান্য অবস্থা—এর গতির এক একটি নির্দিষ্ট গুণগত রূপ এবং এই গতিকে কখনও সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না বরং অবিরাম এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত টানা হল যে গতিকে দেশের মধ্যে কোন পদার্থের নিছক স্থানচ্যুতিতে পর্যবসিত করা যায় না এবং বস্তুর গতির একটি রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হওয়া একটা গুণগত পরিবর্তন সূচিত করে। প্রাক-মার্কসীয় বস্তুবাদীরা শুধু একটুকু ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রকৃতির মধ্যে গতিকে বাইরে থেকে চালান দেওয়া হয় না এটা বস্তুরই অস্তিত্বের ধরন। কিন্তু বস্তু ও গতির মধ্যেকার সম্পর্ক সম্বন্ধে এই দার্শনিক প্রতিপাদ্য বিষয়ের একটা বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ দেওয়া সম্ভব হল এবং একটা ডায়ালেকটিক উপলব্ধিতে পৌছন গেল। এটা স্বীকার করতে হবে মেয়ার বা অন্য কোনো প্রকৃতি বিজ্ঞানী শক্তির রূপান্তরের নিয়ম থেকে কোন দার্শনিক সিদ্ধান্ত টানেন নি ; এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রথম সূত্রায়িত করেছিলেন এঙ্গেল্স্।

জৈব পদার্থের কোষগত কাঠামো আবিষ্কার প্রকৃতি বিজ্ঞানের একটি কম গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি নয়। এটি জৈব-প্রকৃতির ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী উপলব্ধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এমনকি ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতেও বিজ্ঞানীরা কোষের অস্তিত্বের কথা জানতেন, কারণ একক কোষ এবং কোন কোষগুচ্ছ অনবরতই

অনুবীক্ষণের নীচে জৈব দেহের দেহ-কলা (tissue) গুলোকে পরীক্ষা করবার সময় ধরা পড়েছিল। কিন্তু কেবল ১৯শ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা কোষগুলোর শারীরবৃত্তীয় ভূমিকার উপর প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহকলার গঠনতন্ত্রের একক হিসেবে ভূমিকার উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পারলেন। ১৮৩৮-৩৯ সালে জার্মান জীববিজ্ঞানী শ্লেইডেন এবং শোয়ান একটা কোষতত্ত্ব গড়ে তুললেন। বিশেষতঃ শোয়ান এটা প্রতিষ্ঠা করলেন যে প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহকলাগুলোর কাঠামো-বিন্যাস একই এবং একই শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া করে থাকে। কোষ-বিভাজনে বহু হওয়ার মাধ্যমে তাদের অবিরাম নবীকরণে—জন্ম ও মৃত্যুতে জীবের জন্ম ও বিকাশ ঘটে। কোষতত্ত্ব সমস্ত জৈবসত্তার অভ্যন্তরীণ ঐক্যকে প্রমাণ করল এবং পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত দিল তাদের উৎপত্তির ঐক্যের। কোষতত্ত্ব থেকে এঙ্গেলস ডায়ালেকটিক সিদ্ধান্ত টানলেন **অ্যান্টি-ড্যুরিং ও ডায়ালেকটিকস অফ নেচার** বইতে।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের তত্ত্ব তৃতীয় বিরাট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, এটা হয়েছিল ১৯শ শতকের মধ্যভাগে। "দেব সৃষ্টি" হিসেবে প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি আর কোন কিছুর সঙ্গে যুক্ত নয়—ঐশ্বরিক সৃষ্টি অপরিবর্তনীয়, এই মতবাদের অবসান ঘটালেন ডারউইন এবং এই প্রথম তত্ত্বগত জীববিজ্ঞানকে বিজ্ঞানভিত্তিক করে তুললেন। তিনি প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির পরিবর্তনশীলতার এবং তাদের উৎপত্তির ঐক্যের প্রমাণ দিলেন। ডারউইনের অনেক আগেই দার্শনিক ও বিজ্ঞানী উভয়ের দ্বারাই ক্রমবিকাশের ভাবধারা উচ্চারিত হচ্ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৮শ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদী দিদারো প্রজাতির পরিবর্তনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পূর্বসূরীদের মত ডারউইন অনুমানের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি এবং বিরাট পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করে প্রজাতির অভিব্যক্তির অনেকগুলি নিয়ম সূত্রায়িত করেছিলেন। এইভাবে তিনি প্রাণী-জগতের অভিব্যক্তির সাধারণ পরম্পরার মধ্যে মানুষকে উচ্চতম সংযোগ-সূত্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এইভাবে তিনি জগৎ সম্বন্ধে ধর্মীয় মতবাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আঘাত দেন। প্রজাতিগুলোর মধ্যে গুণগত পার্থক্যের উৎপত্তির প্রমাণ দিতে (যা তার তথ্য সংগ্রহে প্রমাণিত হয়েছিল) ডারউইন স্বতঃস্ফূর্ত প্রাকৃতিক নির্বাচনের (মানুষের দ্বারা কৃত্রিম নির্বাচনের সাদৃশ্যের সাহায্যে), উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যে অস্তিত্বের জন্যে সংগ্রামের তত্ত্ব, সর্বাপেক্ষা অভিযোজিত একক জীব ও প্রজাতির টিকে থাকার তত্ত্বগুলো গড়ে তুললেন। এই অবস্থান থেকে ডারউইন এই সংক্রান্ত রহস্যবাদী ব্যাখ্যা বর্জন করে জীবের আপেক্ষিক উদ্দেশ্যমূলক গঠন এবং পরিবেশের সঙ্গে তাদের অভিযোজনের তথ্যকে ব্যাখ্যা করলেন। মার্কস ও এঙ্গেলস ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বকে এর সারমর্মের দিক থেকে ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী বলে মূল্যায়ন করেছিলেন কিন্তু জোর দিয়ে

বলেছিলেন যে ডারউইন সচেতন ডায়ালেকটিকসপন্থী নন। তাই, তাঁদের দার্শনিক শিক্ষাকে সূত্রায়িত ও বিকশিত করতে গিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস কেবলমাত্র সমাজ-বিজ্ঞানের এবং সামাজিক ও ঐতিহাসিক ব্যবহারিক প্রয়োগের সাফল্যের উপরই ভিত্তি করেন নি অধিকন্তু তাঁদের কালের প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিরাট আবিষ্কারগুলোর উপরেও নির্ভর করেছিলেন। এই সব আবিষ্কার সামঞ্জস্যপূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত দর্শন—ডায়ালেকটিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আবশ্যকীয় স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক পূর্বশর্ত সৃষ্টি করেছিল।*

৪ ডায়ালেকটিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ দর্শনে বিপ্লব এনেছে

মার্কস ও এঙ্গেলসের সমস্ত পূর্ববর্তী দর্শনের সমালোচনামূলক পুনর্বিবেচনা এবং তাঁদের প্রবর্তিত দার্শনিক বিপ্লব—এগুলো সব পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। এগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হল বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির গঠন তার প্রতিপাদন ও বিকাশ।

লেনিন উল্লেখ করেছিলেন, মার্কসবাদ পূর্ববর্তী সামাজিক চিন্তার বিরাট সাফল্যের প্রত্যক্ষ উত্তরসূরী হিসেবে উদ্‌ভূত হয়েছে, আর মার্কসের প্রতিভা এইখানেই যে তিনি তাঁর যোগ্য পূর্বসূরীদের উপস্থাপিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন।

অবশ্য, মার্কস ও এঙ্গেলস একবারেই ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ সৃষ্টি করেন নি এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিজ্ঞানসম্মত মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা হন নি। যখন তাঁরা তাত্ত্বিক ও সামাজিক রাজনৈতিক কাজকর্ম প্রথম শুরু করেন তখন তাঁরা ছিলেন ভাববাদী এবং হেগেলীয় গোষ্ঠীর বামপন্থী সভ্যদের (তরুণ হেগেলীয়) সঙ্গে যুক্ত। এঁরা হেগেলের দর্শন থেকে বৈপ্লবিক ও নিরীশ্বরবাদী সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য তরুণ হেগেলপন্থীর বিপরীতে (যাঁরা উদার বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি ছিলেন) মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের প্রথম লেখার মধ্যেই বিপ্লবী গণতন্ত্রী হিসেবে ব্যাপক শ্রমজীবী শ্রেণীর স্বার্থের রক্ষকরূপে প্রতিভাত হন। তাঁদের দর্শনকে সৃষ্টি করার মধ্যে দিয়েই মার্কস ও এঙ্গেলস চূড়ান্তভাবে ভাববাদী বিপ্লবী গণতন্ত্রের অবস্থান থেকে বস্তুবাদ ও কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এই জটিল ও বহুমুখী প্রক্রিয়ার চালিকা শক্তি ছিল শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের জন্যে তাঁদের সংগ্রাম। এই সংগ্রাম তাঁরা পরিচালনা করেছিলেন সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী শোষণের প্রকাশ্য ও গোপন সমর্থকদের বিরুদ্ধে।

১৮৪১ সালে ডক্টরাল থিসিস রচনার সময়ও তিনি ছিলেন ভাববাদী। তবু তিনি সংগ্রামী নিরীশ্বরবাদকে তাঁর দার্শনিক বিশ্বাস বলে ঘোষণা করেন। এই নিরীশ্বরবাদের মর্মার্থ বলে তিনি বুঝতেন, সমস্ত জাগতিক ও স্বর্গীয় দেবতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সংগ্রাম সমস্ত মানবিক ব্যক্তিসত্তার অবমাননার বিরুদ্ধে। ১৮৪২ সালে মার্কস প্রগতিশীল Rheinische Zeitung এর সম্পাদক হন। এটি তাঁর নেতৃত্বে একটা বিপ্লবী মুখপত্রে পরিণত হয়। এই পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধে তিনি জমিদারের হাতে নিপীড়িত কৃষকদের ও প্রুশীয় রাষ্ট্রের কর নীতির ফলে সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া মদ্য উৎপাদকের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন এবং পত্র-পত্রিকার স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকারের পক্ষে কথা বলেছিলেন। এই রাজনৈতিক সংগ্রামই তৎকালীন জার্মানীর সমাজব্যবস্থার শ্রেণীচরিত্র সম্বন্ধে মার্কসকে সচেতন করে তুলেছিল। ১৮৪৩ সালের মধ্যেই তিনি ভাববাদ থেকে বস্তুবাদের দিকে, আদর্শবাদী বিপ্লবী গণতন্ত্রী থেকে কমিউনিজমের দিকে সরে যান। তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন যে, নীতিনিষ্ঠ নিরীশ্বরবাদ ভাববাদের সঙ্গে মেলে না, কারণ ভাববাদ আসলে জগতের ধর্মীয় মতবাদকে সমর্থন করে। যে রাষ্ট্রকে তিনি আগে যুক্তির প্রতিমূর্তি বলে মনে করতেন সেটাকে এখন শ্রমজীবী জনগণের বিরোধী সম্পত্তিবান শ্রেণীর স্বার্থের রক্ষক হিসেবে দেখতে পেলেন।

এঙ্গেলসের দার্শনিক বিশ্বাসের গঠনও অনুরূপ ধারায় চলেছিল। ১৮৪১ সালে এঙ্গেলস রাজনৈতিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ভাববাদী শেলিং-এর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এঙ্গেলস শেলিংকে অতীন্দ্রিবাদ ও ধর্ম প্রচারের জন্যে সমালোচনা করেন এবং সামন্তপ্রভুদের কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে নিন্দা করেন। শেলিং-এর তত্ত্বের পাল্টা আঘাত হিসেবে এঙ্গেলস্ হেগেলীয় দর্শনের বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন। এটা করতে গিয়ে তিনি হেগেলের ডায়ালেকটিক পদ্ধতি, যাতে বাস্তবতাকে নিরন্তর প্রবাহ হিসেবে দেখা হয়, তার সঙ্গে তাঁর রক্ষণশীল দর্শন-প্রস্থানের দ্বন্দ্বকে উল্লেখ করেন। এই দর্শন-প্রস্থান সমাজ-বিকাশের সেই পর্যায়ে বিশ্ব-ইতিহাসের এক চূড়ান্ত পরিণতির কথা ঘোষণা করেছিল—যা কিনা মূলত ইতিমধ্যেই পশ্চিম ইউরোপে পেঁছে গেছে। এঙ্গেলস ১৮৪১ সাল থেকে ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত কাটিয়েছিলেন বৃটেনে ; তখনকার কালে অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে উন্নত দেশ, যেখানে তিনি পুঁজিবাদ বিকাশের সামাজিক ফলাফল লক্ষ্য করেছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি চার্টিস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বৃটেনে এই স্থিতিকাল তাঁর দার্শনিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ গড়ে তুলতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল।

পরস্পর পৃথকভাবে কাজ করলেও মার্কস ও এঙ্গেলস মূলতঃ আন্তঃসম্পর্ক-যুক্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং দার্শনিক মতে উপনীত হন। ১৮৪৪ সালের গোড়ায় প্যারিসে Deutsch-Franzosische Jahrbucher-র প্রথম সংখ্যা

মার্কসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়েরই প্রবন্ধ ছিল। তাঁর রচনায় মার্কস ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ ও বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রারম্ভিক প্রতিজ্ঞাগুলোর ব্যাখ্যা করেন। প্রলেতারিয়েত সমগ্র পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র আনবে, এটা ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত। এই যুক্তি থেকে মার্কস সিদ্ধান্ত টানলেন,…"ঠিক যেমন দর্শন প্রলেতারিয়েতের মধ্যে পেয়েছে তার **বাস্তব** হাতিয়ার, তেমনি প্রলেতারিয়েত দর্শনের মধ্যে পেয়েছে তার **আত্মিক** হাতিয়ার…।"[১] এঙ্গেলসও বৃটেনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বুর্জোয়া অর্থনীতির সমালোচনা করে তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে অনুরূপ মত প্রকাশ করেন।

১৮৪৪ সালে মার্কস ও এঙ্গেলসের মধ্যে মহান বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। ১৮৪৪ সাল থেকে ১৮৪৬ সালের মধ্যে তাঁরা সহযোগিতা করলেন দুটি প্রধান গ্রন্থ ***দি হোলি ফ্যামিলি*** ও ***দি জার্মান আইডিওলজি*** প্রকাশের কাজে। এর মধ্যে তাঁরা ভাববাদী দর্শনের একটা সর্বাত্মক সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করেন এবং ডায়ালেকটিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল সূত্রগুলোকে দাঁড় করান। ***পভার্টি অফ ফিলসফি*** এবং ***ম্যানিফেস্টো অফ দি কমিউনিস্ট পার্টি*** প্রকাশিত হ'ল যথাক্রমে ১৮৪৭ এবং ১৮৪৮ সালে। পরে লেনিন বই দুটিকে পরিণত মার্কসবাদের প্রথম রচনা বলে অভিহিত করেছিলেন। এই ম্যানিফেস্টোর শ্লোগান ছিল মার্কস ও এঙ্গেলসের সেই বিখ্যাত উক্তি "দুনিয়ার মজদুর এক হও।" লেনিন এই প্রসঙ্গে বলেন "প্রতিভাবানের স্বচ্ছতা এবং উজ্জ্বলতা নিয়ে এই বইখানি একটা নতুন বিশ্ববোধ ও সুসঙ্গত বস্তুবাদের রূপরেখা রচনা করে,—যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় সামাজিক জীবন-বিকাশের সবচেয়ে সর্বাঙ্গীণ ও সুগভীর মতবাদ হিসেবে ডায়ালেকটিকস, শ্রেণীসংগ্রাম ও একটা নতুন কমিউনিস্ট সমাজের স্রষ্টা প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব ঐতিহাসিক ভূমিকার তত্ত্ব।"[২]

তাই, যে সমস্ত প্রশ্ন অতীতের দার্শনিকরা উপস্থাপিত করেছিলেন কিন্তু উত্তর দিতে সমর্থ হন নি, সে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রথম অপরিহার্য পদক্ষেপ ছিল সঠিক তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক পার্থক্যের স্থানটিকে নির্দিষ্ট করা। মার্কস ও এঙ্গেলসের কাছে এই পার্থক্যের স্থানটি হল সমস্ত এবং প্রত্যেক ধরনের মানব শোষণের বিরুদ্ধে, সামাজিক পীড়ন এবং অসাম্যের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। শুধুমাত্র মানুষের যে-কোন প্রকার দাসত্ব-বন্ধনের বিরুদ্ধে অবিচলিত বিপ্লবী অবস্থান থেকেই সম্ভব ছিল বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস সৃষ্টি করা। যে বুর্জোয়া বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ধনী-গরীবের মধ্যেকার বিরোধকে টিকিয়ে রাখে তার বিপরীত-

১. মার্কস-এঙ্গেলস : ওয়েৰ্কে, ১ম খণ্ড, ১, ৩৯১ পৃঃ

২. ভি. আই. লেনিন : কালেকটেড ওয়ার্কস, ২১শ খণ্ড, ৪৮

ভাবে ডায়ালেকটিকস "কোন কিছুকেই নিজের উপর চাপাতে দেয় না এবং সারমর্মের দিক থেকে বিচারমূলক ও বৈপ্লবিক।"[১]

শুধু সবচেয়ে বঞ্চিত এবং সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণীর অবস্থান, প্রয়োজন এবং স্বার্থকে পৃথক করে গণ্য করার মধ্যে দিয়েই ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব ছিল, যে-ব্যাখ্যা মানব ইতিহাসে শ্রমজীবী জনতার ও বৈষয়িক উৎপাদনের নির্ধারক ভূমিকাকে উদ্ঘাটিত করল এবং কমিউনিজমের অনিবার্যতা প্রমাণ করল।

কিন্তু বুর্জোয়া দার্শনিক মার্কস ও এঙ্গেলসের ডায়ালেকটিক বস্তুবাদকে হেগেলের ডায়ালেকটিক (কিন্তু ভাববাদী) পদ্ধতি এবং ফয়ারবাখের বস্তুবাদী (কিন্তু অধিবিদ্যক) তত্ত্বের সংযুক্তি হিসেবে উপস্থাপিত করেন। এটা স্পষ্টতঃই অতিসরলীকরণ এবং মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা দর্শনে যে বিপ্লব সম্পন্ন করেন, তার সারমর্ম বুঝতে না পারা। নীতির দিক থেকে ভাববাদ ও বস্তুবাদের মধ্যে, ডায়ালেকটিক ও অধিবিদ্যক পদ্ধতির চিন্তাধারার মধ্যে সংযুক্তি ঘটান অসম্ভব; এগুলো পরস্পরবিরোধী। মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা ফয়ারবাখের দর্শনসমেত আধুনিক যুগের বস্তুবাদী শিক্ষাকে পুনর্বিন্যাস করেছিলেন। তাঁরা পুনর্বিন্যাস করেছিলেন হেগেলের ডায়ালেকটিক পদ্ধতিকে। এই পদ্ধতি তার ভাববাদীরূপ বজায় রেখে প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়াগুলোর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পক্ষে কোন কাজেই লাগত না। একেই তাঁরা বলেছিলেন, ডায়ালেকটিকসকে আবার ঘুরিয়ে দাঁড় করানো অর্থাৎ প্রকৃতি ও সমাজের বিজ্ঞান থেকে সম্পদ আহরণ করে তাই দিয়ে একে ভরিয়ে তোলা।

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসকে শুধু একটা পদ্ধতি এবং দার্শনিক বস্তুবাদকে গবেষণার উদ্দেশ্যে ঐ পদ্ধতিকে প্রয়োগ করার একটা তত্ত্ব বলে ভাবাটা হবে একটা অগভীর উপলব্ধি। অন্য কথায়, **মার্কসীয় পদ্ধতি বস্তুবাদী এবং সেই সঙ্গে ডায়ালেকটিকও, আবার মার্কসীয় তত্ত্ব ডায়ালেকটিক এবং সেই সঙ্গে বস্তুবাদীও।** এর অর্থ এই যে, মার্কসীয় দর্শনে বস্তুবাদ ও ডায়ালেকটিকস পরস্পর-নিরপেক্ষ নয়, বরং একত্র সংযুক্ত, সন্নিবদ্ধ মতবাদ, কারণ বাস্তবতাও একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও ডায়ালেকটিক।

তাই **ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষার** সৃষ্টি, বস্তুবাদকে ডায়ালেকটিক বস্তুবাদে রূপান্তর করা এবং বাস্তব প্রক্রিয়াগুলোর আভ্যন্তরীণ ডায়ালেকটিকস এবং জ্ঞান-প্রক্রিয়ায় তাদের প্রতিফলন, সবগুলোই ছিল দর্শনে মার্কস-এঙ্গেলসের দ্বারা সূচিত বিপ্লবের অংশ।

দার্শনিক বিপ্লবের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা (ঐতিহাসিক বস্তুবাদ) অর্থাৎ সামাজিক জীবনের উপলব্ধির ক্ষেত্রে বস্তুবাদের

১. কার্ল মার্কস: ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, ২৪ পৃঃ

প্রয়োগ। লেনিন মার্কসের শিক্ষা সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "তাঁর **ঐতিহাসিক বস্তুবাদ** বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার একটা বিরাট সাফল্য। যে-বিশৃঙ্খলা ও খামখেয়ালীপনা আগে ইতিহাস ও রাজনীতিতে প্রাধান্য করত তাকে অপসারিত করল একটি আকর্ষণীয় সুসমঞ্জস তত্ত্ব। এই তত্ত্ব দেখিয়ে দিল যে, উৎপাদনী শক্তির বিকাশের ফলে কেমন করে একটি সামাজিক জীবনের বিধিবন্ধ ব্যবস্থা থেকে আর একটি উন্নত ব্যবস্থা বিকশিত হয়ে ওঠে—উদাহরণস্বরূপ, কেমন করে পুঁজিবাদ জন্মায় সামন্ততন্ত্র থেকে।"[১]

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, প্রাক-মার্কসীয় বস্তুবাদীরা সমাজ সম্পর্কে তাঁদের চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ছিলেন ভাববাদী। এটার কারণ ছিল তত্ত্বগত ও শ্রেণীগত সঙ্কীর্ণতা। বস্তু—বাস্তবকে তাঁরা সোজাসুজি মনে করতেন বাস্তব পদার্থ। সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই, তাই, তাঁরা সামাজিক জীবনের বাস্তব ভিত্তি-স্বরূপ বৈষয়িক উৎপাদন এবং বৈষয়িক উৎপাদন-সম্পর্ক পত্যক্ষ করতে পারেন নি। সমাজ জীবনের বস্তুবাদী মর্ম রয়েছে এইটি দেখানোর মধ্যে যে কেমন করে মানব জীবনের সমস্ত রূপই শেষপর্যন্ত সামাজিক উৎপাদনের বিকাশের সঙ্গে বাঁধা। এই সংযোগের আবিষ্কার ও অনুসন্ধান অর্থাৎ মানব ইতিহাসে শ্রমের ভূমিকার ব্যাখ্যাই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পৃথক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি।

প্রাক-মার্কসীয় বস্তুবাদীরা প্রকৃতি ও সমাজের উপর মানুষের নির্ভর-শীলতাকে স্বীকার করতেন এবং এই অভিমত পোষণ করতেন যে সমাজজীবনের সকল ঘটনাই কার্য-কারণ সম্পর্কে বাঁধা। এর থেকে স্বাভাবিকভাবে তারা এই সিদ্ধান্তে পেঁছন যে, যা কিছুই ঘটে গিয়েছিল তা ঘটেছিল এবং ভবিষ্যতেও যা ঘটবে তা অনিবার্য এবং জনগণ তাদের ইচ্ছেমত সেগুলোকে পরিবর্তন করার জন্যে কিছু করতে পারে না। একই সঙ্গে, সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে যা কিছু ঘটে তার পূর্বনির্ধারিত, ধর্মীয়, নিয়তিবাদী ধারণার বিরোধিতা করে তাঁরা সঠিকভাবেই বলেছিলেন যে মানুষ নিজেই তাদের ইতিহাসের স্রষ্টা। কিন্তু এই অধিবিদ্যক বস্তুবাদীরা বস্তুবাদের দিক থেকে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই বিবৃতিকে প্রমাণ করতে পারেন নি এবং তাঁরা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আত্মগত ব্যাখ্যার আশ্রয় নেন। এইসব ঘটনাকে তাঁরা এই ভাবে বিচার করেন যেন সেগুলো ঘটেছিল ব্যক্তির, বিশেষ করে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের ইচ্ছার দ্বারা। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সৃষ্টির ফলে ইতিহাসের অদৃষ্টবাদী ও বিষয়ীগত মতবাদ উভয়েরই পরাজয় সূচিত হয়।

দর্শনে অপর যে-বিপ্লব মার্কস ও এঙ্গেলস এনেছিলেন, তা হল দার্শনিক জ্ঞান ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধের অবসান। এই বিরোধ কম-বেশী সমস্ত পূর্ববর্তী দর্শনেরই বৈশিষ্ট্য ছিল, বিশেষতঃ ভাববাদী দর্শনের। মার্কস ও

১, ভি. আই. লেনিন: কালেকটেড ওয়ার্কস, ১৯শ খণ্ড, ২৪ পৃঃ

এঙ্গেলস যখন দর্শনের অবসানের কথা বলেছিলেন, তখন তাঁরা বিশিষ্ট বিজ্ঞান-লব্ধ ঐতিহাসিকভাবে সীমাবদ্ধ জ্ঞান-নিরপেক্ষ সত্য হিসেবে স্বীকৃত "বিজ্ঞানের বিজ্ঞান" বলে দর্শনের যে-পুরোন অর্থ ছিল, তার অবসানের কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

প্রাক্-মার্কসীয় দার্শনিকরা সাধারণতঃ এটা মনে করতেন যে দর্শন পরম সত্যকে প্রকাশ করে আর বিজ্ঞানের কাজ হল আপেক্ষিক সত্যের আবিষ্কার। তাই তাঁরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে প্রকৃতির দর্শনের (প্রাকৃতিক দর্শন) বিরোধী হিসেবে, মানব ইতিহাসের বিজ্ঞানকে ইতিহাসের দর্শনের বিরোধী হিসেবে, আইনবিদ্যাকে আইনের দর্শনের বিরোধী হিসেবে, শিল্প সমালোচনাকে শিল্প-কলার দর্শনের বিরোধী হিসেবে দেখতেন। যখন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও কলা-শাস্ত্র (ব্যাপক অর্থে সমাজবিজ্ঞান—অনুঃ) রয়ে গিয়েছিল প্রধানত অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ এবং তথ্য সংগ্রহের সঙ্গে জড়িত, তখন ইতিহাসের দর্শন ও প্রকৃতির দর্শনের বিশিষ্ট বিজ্ঞানগুলো থেকে বিচ্ছিন্নভাবে তাত্ত্বিক সংস্থিতি রূপে থাকার একটা ঐতিহাসিক যথার্থতা ছিল এবং তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রের মধ্যে কখনও কখনও চমৎকার অনুমান করতে পারত এবং ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কে তারা অনেক পূর্বাভাস দিয়েছিল। তবে, তত্ত্বগত বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলোর স্বরূপ সম্বন্ধে প্রাকৃতিক দর্শন ও তার বৈশিষ্ট্যসূচক সাধারণ, বিমূর্ত যুক্তিধারা হয়ে উঠল অচল। অনুরূপ ঘটনা ঘটল ইতিহাসের দর্শনে। এঙ্গেলস লিখেছেন, "এখানেও ইতিহাস, অধিকার[১] ও ধর্ম ইত্যাদির দর্শনে ঘটনাবলীর মধ্যে বাস্তব পারস্পরিক সংযোগ দেখানোর বদলে দার্শনিকের মন-গড়া একটা আন্তঃসম্পর্ক প্রতিপন্ন করা হত; এগুলো গড়ে উঠেছিল সমগ্র ইতিহাস ও তার অংশগুলোর উপলব্ধি ও ভাবের ক্রম-রূপায়ণ হিসেবে এবং স্বাভাবিকভাবে সর্বদাই কেবল দার্শনিকের পছন্দসই ধারণাগুলো দিয়েই।"[১]

মার্কস ও এঙ্গেলস দেখিয়েছিলেন যে, নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে অবজ্ঞা করে "বিজ্ঞানের বিজ্ঞান" হওয়া দর্শনের পক্ষে সঙ্গত নয়। বরং দর্শনের হওয়া উচিত বিজ্ঞানের তথ্যগুলোকে সামান্যীকরণ করে এবং প্রকৃতি, মানবজীবন ও জ্ঞান-প্রক্রিয়ার সবচেয়ে সাধারণ নিয়মগুলোকে উদ্ঘাটিত করে একটা বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি।

মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা শুধু এই ধারণা বাতিলই করেন নি যে, দার্শনিক জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিরোধী; তাঁরা প্রাচীন দার্শনিকদের বৈশিষ্ট্যসূচক

অধিকার (Right), মূল জার্মান শব্দ (Recht), যার অর্থ বিধি বা আইন ও অধিকার দুইই। অনুঃ।

কার্ল মার্কস ও এফ, এঙ্গেলস: সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ৩য় খণ্ড, ৩৬৫ পৃঃ।

আধিবিদ্যক মতবাদ এবং তাঁদের বিকাশহীন, পরম, পূর্ণাঙ্গ ও অপরিবর্তনীয় জ্ঞানের দাবীকেও বাতিল করেছেন। বিজ্ঞানসম্মত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি হতে গিয়ে দর্শন পুরোপুরি বিজ্ঞানের অবস্থানে চলে যায়। আর এই অবস্থান সবসময়ই নতুন সিদ্ধান্তের কাছে উম্মুক্ত, সবসময়ই বিকাশলাভ করছে এবং নতুন প্রতিজ্ঞার দ্বারা সমৃদ্ধ হচ্ছে, অচল ধ্যান-ধারণাগুলোকে খারিজ করে দিচ্ছে।

ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ, প্রকল্প, স্বীকার্য, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং বিশেষ প্রক্রিয়াগুলোর সম্ভাব্যতার অনুশীলন সমেত বিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। দার্শনিক জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে এই বিজ্ঞানসম্মত ধারণা এবং হেগেলের ডায়ালেকটিকসেও যাকে পরম জ্ঞান (পরম ভাবের আত্মজ্ঞান) হিসেবে গণ্য করা হত, সেই দার্শনিক জ্ঞানের আধিবিদ্যক ধারণার সঙ্গতিপূর্ণ সমালোচনা, দর্শনের জগতে বিপ্লবের অন্যতম দিক, আর একে সৃষ্টি করেছে মার্কসবাদ। মার্কস ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, "এতাবৎকাল পর্যন্ত দার্শনিকরা সমস্ত ধাঁধাঁর সমাধান তাদের দেরাজের মধ্যে রেখেছিলেন এবং দীক্ষাহীন মূর্খ জগতের হাঁ করা এবং পরম বিজ্ঞানের ঝলসানো মুরগীটাকে কামড়ানো ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।"[১] এর অর্থ এই যে দর্শনকে যতটাই "পরম বিজ্ঞান" বলে গণ্য করা হবে ততটাই সেটা বাস্তবে বিজ্ঞান থাকবে না। বিজ্ঞানসম্মত দর্শন প্রতিভাবানদের উচ্চারিত কোন আপ্তবাক্য নয়।

মার্কস ও এঙ্গেলস ও ধারণারও অবসান ঘটান যে বাস্তব কাজকর্মের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে, দর্শনের করবার কিছু নেই। বহু শতাব্দী ধরে দর্শনকে মনে করা হত নিঃস্বার্থ, নিরাসক্ত ধ্যান এবং নিছক জ্ঞানের জন্যে জ্ঞানের দাবী পূরণের উদ্দেশ্যে সত্যের উপলব্ধি। যদিও অতীতের কিছু প্রগতিশীল দার্শনিক, প্রধানতঃ বস্তুবাদীরা ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে দার্শনিক চিন্তার বিরোধ নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন; কিন্তু তাঁরাও দর্শনের সঙ্গে প্রয়োগের, বিশেষ করে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মপ্রয়োগের মিলন সাধনের কোন বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি দেখাতে পারেন নি।

বহু শতাব্দী ধরে দর্শন ছিল মুষ্টিমেয় কিছু চিন্তাবিদের জগৎ, যাঁরা সাধারণতঃ সম্পত্তির মালিক ও শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এমনকি যখন দার্শনিকরা ঐতিহাসিকভাবে অচল সামাজিক সম্পর্কের বিরোধিতা করছিলেন, তখনও তাঁরা বৈজ্ঞানিকভাবে বলতে পারেন নি কেন এই সব সম্পর্ক পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে দর্শন অংশগ্রহণ করবে।

মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের শুরুতেই সামাজিক বাস্তবতার প্রতি দার্শনিকদের 'নিরপেক্ষ' মনোভাবের বিরোধিতা করেছেন।

১. মার্কস-এঙ্গেলস, সিলেকটেড ওয়ার্কস : ৩য় খণ্ড, ৩৬৫ পৃঃ।

তাঁরা বলেছিলেন, একটা বিশুদ্ধ চিন্তার বিমূর্ত উপাদানের মধ্যে দর্শনের অবস্থান নয়, ঐ ধরণের বিশুদ্ধ চিন্তাও বাস্তব-নিরপেক্ষভাবে বর্তমান থাকে না। এখন থেকে দর্শনের জীবনধারা বইবে প্রলেতারিয়েত ও সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লবী ব্যবহারিক প্রয়োগের খাতে। দর্শনের কর্তব্যের প্রতি মূলতঃ এই নতুন মনোভাবের আলোকে আমরা মার্কসের বিখ্যাত উক্তির তাৎপর্যকে দেখি, "দার্শনিকরা নানাভাবে শুধু জগতের ব্যাখ্যাই করেছেন, কিন্তু আসল বিষয় হল একে পরিবর্তন করা।"[১]

মার্কসবাদের বুর্জোয়া সমালোচকরা এই তত্ত্ব থেকে সিদ্ধান্ত টানেন যে যতক্ষণ দর্শন জগতের পরিবর্তন না করছে ততক্ষণ তা জগৎকে ব্যাখ্যা করুক বা না করুক, মার্কস তার ধার ধারেন নি। বাস্তবে, মার্কসের বক্তব্যের লক্ষ্য সেই দর্শন, যা সাধারণতঃ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে আধিপত্য করে, সেই ধরনের দর্শন যার পক্ষে যা আছে তার ব্যাখ্যায় একথা বলার অজুহাত জোগায় যে এটাই অনিবার্য এবং তাকেই বরদাস্ত করতে হবে। তবে, মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, বাস্তবতাকে পরিবর্তন করার তত্ত্বগত যুক্তি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থেকেই দেওয়া সম্ভব, আর অবশ্যই তা দিতে হবে। সেই অনুসারে জগৎকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা দর্শন ছেড়ে দেবে না বরং বিপ্লবী ব্যবহারিক কাজকর্মের সঙ্গে এই ব্যাখ্যাকে যুক্ত করবে এবং মার্কসবাদী দর্শন যেহেতু জগৎ-পরিবর্তনের সবচেয়ে সাধারণ নিয়মগুলোকে উদ্ঘাটিত করে, সেহেতু তা হয়ে ওঠে মতাদর্শগত হাতিয়ার, যার দ্বারা এই ধরনের পরিবর্তন আনা যেতে পারে।

ডায়ালেকটিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (এবং সমগ্রভাবে মার্কসবাদী দর্শন) বিপ্লবী উদ্যোগের তাৎপর্যব্যঞ্জক এবং অচল ধ্যানধারণা ও ব্যবহারিক কাজকর্ম বরদাস্ত করে না। এই দর্শনের তাৎপর্য হল, সরাসরিভাবে প্রকাশ্য পক্ষাবলম্বন, কঠোর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মতান্ধতা ও তার কট্টর সূত্রগুলোর অবিচল বিরোধিতা, সাহসের সঙ্গে নতুন সমস্যার উত্থাপন এবং এমনভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সৃষ্টিশীল বিকাশ সাধন করা যা শোধনবাদীদের বিকৃতির বিরুদ্ধে আপসহীন। দর্শনে বিপ্লবের মর্মকথা এইসব লক্ষণের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, আর মার্কসবাদই এই বিপ্লবের গতিসঞ্চার করেছিল।

৫. লেনিনের হাতে মার্কসীয় দর্শনের বিকাশ

তাঁদের তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিকাশ ঘটাতে গিয়ে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা প্রায়ই বলতেন যে, এটা অন্ধ মতবাদ নয় বরং কর্মের পথপ্রদর্শক। যে নীতি মার্কসবাদকে অন্যান্য পূর্ববর্তী মতবাদ থেকে পৃথক করেছে, তার কথা মনে করেই লেনিন বলেছিলেন: "আমরা মার্কসের তত্ত্বকে এমন একটা কিছু মনে

১. কার্ল মার্কস ও এফ্. এঙ্গেলস: সিলেকটেড ওয়ার্কস, ১ম খণ্ড, ১৫ পৃঃ।

করি না বা পূর্ণাঙ্গ এবং অলঙ্ঘনীয় ; বরং আমরা নিশ্চিত যে এটি বিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে। যদি সমাজতন্ত্রীরা জীবনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চান, তা হলে তাঁদের একে অবশ্যই সমস্ত দিকে বিকশিত করে তুলতে হবে।"[১] সমগ্র মার্কসবাদী তত্ত্বের বর্তমান পর্যায় এবং বিশেষভাবে ডায়ালেকটিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ লেনিন এবং যাঁরা তাঁর কাছ থেকে শিখেছিলেন এবং তাঁর কাজ চালিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁদের নামের সঙ্গে যুক্ত।

এঙ্গেলস লিখেছিলেন যে, দার্শনিক বস্তুবাদ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন রূপ নিয়েছে এবং তা নেওয়াই স্বাভাবিক। দর্শনের বিকাশের উপর সামাজিক-ঐতিহাসিক পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে।

মার্কস-এঙ্গেলস এমন একটা যুগে তাঁদের তত্ত্বকে গড়ে তুলেছিলেন যখন পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কর্তব্যটি আশু বাস্তব সম্ভাবনা হয়ে ওঠে নি। লেনিন মার্কসবাদের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন একটা নতুন ঐতিহাসিক পরিবেশে, পুঁজিবাদের পতন তার চূড়ান্ত সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে রূপান্তরের যুগে, যে যুগে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের আবির্ভাব। তৎকালীন পরিস্থিতির তাগিদে নতুন সমস্যাগুলোকে বিশ্লেষণ করা হবং শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের রণকৌশল ও রণনীতির গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা মার্কসবাদীদের সামনে কর্তব্য হয়ে উঠেছিল। এটা না করা হলে, মার্কসবাদের দর্শন আর প্রাণবন্ত তত্ত্ব, জ্ঞানের পদ্ধতি ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ড হিসেবে টিকে থাকত না···হয়ে পড়ত নিষ্প্রাণ শাস্ত্রবাক্য, ফলপ্রসূ রূপান্তরের শক্তিহীন একপেশে তত্ত্ব। ঘনীভূত অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের পরিস্থিতির মধ্যে মার্কসবাদের শত্রুরা এর দার্শনিক ভিত্তির উপর তাদের আক্রমণকে তীব্রতর করে তুলেছিল। এই সময়ে একটা শোধনবাদী প্রবণতার ভাব দেখা দেয় যা বিভিন্ন বুর্জোয়া দার্শনিক সম্প্রদায়ের (নব্য কাণ্টীয়, মাখবাদী) সঙ্গে মার্কসবাদের সমন্বয় ঘটাতে চায়।

লেনিন ডায়ালেকটিক ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে রক্ষা করতে মনস্থ করলেন, তার তা করতে গিয়ে তিনি একে নতুন পর্যায়ে তুলে সৃজনশীলভাবে সর্বদিক থেকে বিকশিত করে তুললেন।

একজন তাত্ত্বিক হিসাবে লেনিনের বিশেষ গুণ হল তাঁর বৈপ্লবিক সাহসিকতা, যার সাহায্যে তিনি ইতিহাসের ধারায় উদ্ভূত নতুন তত্ত্বগত সমস্যাগুলোকে উত্থাপন করলেন এবং সেগুলোর সমাধান দিলেন, বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অগ্নি-পরীক্ষায় তত্ত্বগত প্রতিজ্ঞাগুলোকে যাচাই করার ক্ষেত্রে তাঁর দৃঢ়তা, এই পরীক্ষায় ব্যর্থ অচল প্রতিজ্ঞাগুলোকে বাতিল করা এবং শোধনবাদ ও মার্কসবাদের শিক্ষা থেকে সরে যাওয়ার প্রতি বিরোধিতা ও অসহিষ্ণুতা।

১, ভি. আই. লেনিন : কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৪র্থ খণ্ড, ২১১-১২ পৃঃ।

মার্কস ও এঙ্গেলস তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের কালের সব চাইতে প্রভাবশালী ভাববাদী সামাজিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ; তাঁরা নির্ধারক উপাদান হিসেবে প্রধান গুরুত্ব দিয়েছিলেন বৈষয়িক উৎপাদন ও অথ নৈতিক সম্পর্কের উপর। পঁুজিবাদের উপর বিপ্লবী আঘাত হানার যুগে স্বভাবতই মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রথম প্রয়োজন ছিল সামাজিক চেতনা, ভাব ও মতাদর্শ এবং সমাজ বিকাশে বিষয়ীগত উপাদানের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁদের মতকে বিকশিত করা। এটার আরও প্রয়োজন ছিল এই কারণে যে শ্রমিক আন্দোলনে বুর্জোয়া মতাদর্শের অনুগামী ও সুবিধাবাদীরা স্থূল অর্থনীতিবাদের মনোভাব থেকে এই বলে মার্কসবাদের ব্যাখ্যা দিচ্ছিল যে মার্কসবাদ সামাজিক প্রক্রিয়াকে এমন একটা কিছু মনে করে যা মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়াই সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে থাকে। তাঁর প্রথম দিকে লিখিত **"জনগণের বন্ধুরা কে এবং কেমন করে তাঁরা সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের লড়ছেন"** গ্রন্থে লেনিন নারোদনিকদের সামাজিক ঘটনার আত্মগত ব্যাখ্যার সমালোচনা করেন। এঁদের ধারণা ছিল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া "সমালোচনাকারী চিন্তাশীল" ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনি দেখান সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ভিত্তি হিসেবে এক ধরনের উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা আর এক ধরনের উৎপাদন পদ্ধতির অপসারণ সম্পর্কে মার্কসবাদ যা বলেছে তাতে ইতিহাসে জনগণ ও শ্রেণীগুলোর নিয়ামক ভূমিকার কথা বাতিল হয়ে যায় নি ; বরং কোন অবস্থায় বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হবে তার সন্ধান পেতে মার্কসবাদ আমাদের সাহায্য করে।

"নারোদনিকবাদের অর্থনৈতিক মর্মবস্তু এবং মিঃ স্ট্রুভের বইয়ে এর সমালোচনা" শীর্ষক রচনায় দেখালেন যে, মার্কসবাদী দর্শন সমাজ বিকাশের যে বিষয়গত নিয়মকে উদ্ঘাটিত করে তার সঙ্গে বুর্জোয়াদের বাস্তববাদ যা কিনা শ্রেণী ও পার্টিগুলোর সচেতন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ভূমিকাকে অস্বীকার করে, তার কোন সামঞ্জস্য নেই। ..."একদিকে বস্তুবাদীরা বিষয়বাদী ব্যক্তির (objectivist) চাইতে অনেক সঙ্গতিপূর্ণ এবং তাঁরা বাস্তববাদকে আরও বেশী গভীর ও পূর্ণতাদান করে। বস্তুবাদী একটি প্রক্রিয়ার অনিবার্যতার কথা বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং ঠিক কোন্ সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন প্রক্রিয়াটিকে মর্মবস্তু প্রদান করে, ঠিক কোন্ শ্রেণী এই অনিবার্যতাকে নির্ধারণ করে তা নির্ণয় করে...অন্যদিকে, বলতে গেলে, বস্তুবাদ পক্ষাবলম্বনের নীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ঘটনার কোনো মূল্যায়নে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণকে সরাসরি ও খোলাখুলিভাবে গ্রহণের কর্তব্য নির্দেশ করে।"[১]

১. ভি. আই. লেনিন : কালেকটেড ওয়ার্কস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০

লেনিন শ্রমিক আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ততার তত্ত্বের সমালোচনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। মার্কসবাদী পার্টি স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলনে যে-বিপ্লবী তত্ত্ব ও সমাজতান্ত্রিক চেতনা সঞ্চার করেছিল লেনিন তাঁর "কী করতে হবে" ও অন্যান্য রচনাতে তার গুরুত্ব প্রমাণ করেছিলেন। বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া কোন বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন হতে পারে না। লেনিনের এই সিদ্ধান্ত শুধু রাজনৈতিকই নয়, অধিকন্তু এর সাধারণ সমাজবিদ্যাগত তাৎপর্য রয়েছে, কারণ এতে প্রগতিশীল আদর্শে সজ্জিত শ্রেণীর কর্মকাণ্ডের উপর বুনিয়াদী সামাজিক পরিবর্তনের নির্ভরশীলতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

লেনিন তাঁর দার্শনিক রচনা মেটীরিয়ালিজম অ্যান্ড এম্পিরিওক্রিটিসিজম বইটিতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিপ্লবের, বিশেষত এই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে পদার্থবিদ্যায়—যে বিপ্লবের সূত্রপাত হল তেজস্ক্রিয়তা, ইলেকট্রন ও পরমাণুর জটিল গঠনের আবিষ্কারে, যাকে আগে মনে করা হত সর্বশেষ অবিভাজ্য "বিশ্বের ইঁট" বলে, সে সবের একটা সুগভীর বিশ্লেষণ দিয়েছিলেন। এই বিপ্লব বস্তু, গতি, দেশ ও কাল ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক ধারণাকে রীতিমত পাল্টে ছিল। নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারটির সংঘাত সৃষ্টি হল পুরনো ধারণার সঙ্গে। যে পুরনো ধারণাকে মনে করা হত তর্কাতীত এবং এই ধারণা বিজ্ঞানে কয়েক শতাব্দী ধরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে টিকে ছিল। এই তথ্য থেকে বহু বিজ্ঞানী সিদ্ধান্ত করলেন যে ঐ ধারণা গুলোর সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলোরও (পরমাণুরূপ বস্তু, বস্তুর দেশ-কালের গুণ ইত্যাদি) কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই এবং এসব বিষয় নিছক ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষগুলোকে যথাযথভাবে সাজানো ও সমন্বয় সাধন করার বিশেষ মানবিক আত্মগত উপায়মাত্র। কেবল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের জ্ঞানের মূল্য সম্বন্ধেই নয়, মানুষের পক্ষে জগৎকে প্রত্যক্ষ করার সামর্থ্য সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করা হল। পদার্থ বিজ্ঞানের হাল-আমলের আবিষ্কার থেকে টানা ভাববাদী সিদ্ধান্ত-গুলোকে সমালোচনা করে লেনিন বস্তুর ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে বিকশিত করলেন এবং দেখিয়ে দিলেন যে বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত বস্তুর ভৌত, রাসায়নিক ও অন্যান্য ধর্মগুলো চেতনা-নিরপেক্ষ বহির্জগতেও বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য। চেতনা-নিরপেক্ষ বহির্জগতের প্রত্যয়টিকে তার ভৌত এবং অন্যান্য ধর্মে (Property) পর্যবসিত করা যায় না; এইগুলোর ধর্ম-সম্পর্ক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যতই বদলাক না কেন, এটা বস্তুর এমন একটি দার্শনিক সংজ্ঞা যা কখনই বাতিল হতে পারে না।

খুব হালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার থেকে এইসব সাধারণ সিদ্ধান্ত টানবার পর লেনিন ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের জ্ঞানতত্ত্বকে বিকশিত করতে থাকেন। তিনি দেখান যে নতুন আবিষ্কারের প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোর রূপান্তর ঘটার ফলে এইসব ধারণাগুলোর বিষয়গত সত্যতা নষ্ট হয়ে যায়

না বরং এইসব আবিষ্কারের ফলে জ্ঞান-প্রক্রিয়ার জটিল ও দ্বান্দ্বিক বৈশিষ্ট্য এবং আমাদের জ্ঞানের আপেক্ষিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

লেনিনের ফিলসফিক্যাল নোটবুক, যা তাঁর মেটিরিয়ালিজম অ্যান্ড এম্পিরিও ক্রিটিসিজম উপস্থাপিত মৌল প্রতিজ্ঞাগুলোরই বিশদ ধারাবাহিক রূপ তা মার্কসবাদী দর্শনের বিকাশে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মেটিরিয়ালিজম অ্যান্ড এম্পিরিও ক্রিটিসিজম বইটিতে লেনিন দার্শনিক বস্তুবাদের মৌল সমস্যার উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছেন, আর ফিলসফিক্যাল নোটবুকে তিনি আমাদের কতগুলো চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন কেমন করে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের নিয়ম ও মূল-প্রত্যয়গুলো (category) ব্যাখ্যা করতে হয় তার সম্বন্ধে। মার্কসীয় দর্শনে ডায়ালেকটিকস, তর্কবিদ্যা ও জ্ঞানতত্ত্বের ঐক্য সম্বন্ধে সূত্রায়িত তাঁর নীতি, ডায়ালেকটিকসের মূল উপাদানগুলো সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ, জ্ঞানতত্ত্বগতভাবে ভাববাদের মূল, বিমূর্ত বৈজ্ঞানিক ধারণার ক্ষেত্রে বাস্তবতার প্রতি বিম্বের দ্বান্দ্বিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁর শিক্ষা ও বস্তুবাদী ডায়ালেকটিক জ্ঞানতত্ত্বের আরও বিকাশের জন্যে তাঁর কর্মসূচী—এসবই মার্কসীয় দর্শনে সত্যিই তাঁর অমূল্য অবদান। তাঁর "সংগ্রামী বস্তুবাদের তাৎপর্য প্রসঙ্গে" প্রবন্ধে, যেটাকে তাঁর দার্শনিক নির্দেশনামা বলে গণ্য করা যায়, লেনিন ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের আরও সৃষ্টিশীল বিকাশ এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি আরও উন্নত করার জন্যে মার্কসবাদী দার্শনিক এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের মধ্যে ফ্রন্ট গঠনের ভিত্তি তৈরী করেছেন। এটা মনে রেখে লেনিন অতীতের বস্তুবাদী ও ডায়ালেকটিসের উন্নত ঐতিহ্য, বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদীদের নিরীশ্বরবাদী শিক্ষা ও হেগেলের ডায়ালেকটিকসের সমালোচনা-মূলক ও সৃজনশীল আত্তীকরণের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছেন।

বিরোধীর সঙ্গে সংগ্রামে লেনিন ডায়ালেকটিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পক্ষই সমর্থন করেন নি, তিনি শুধু সমস্ত দিক দিয়ে মার্কসীয় দর্শনকে বিকশিতই করেন নি, তিনি নতুন যুগকে সাম্রাজ্যবাদের, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এবং নতুন সমাজ গঠনের যুগকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে এটিকে প্রয়োগও করেছিলেন; পুঁজিবাদের বিকাশ ও বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে থেকে যে-সব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল, তিনি তার উত্তরও দিয়েছিলেন।

লেনিনের বই "সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তর" এবং এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক রচনাগুলোর মধ্যে (প্রথম মহাযুদ্ধ সম্পর্কে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন, জাতিসত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্পর্কে এবং শ্রেণী-শক্তির নতুন বিন্যাস সম্বন্ধে) নতুন যুগ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ ডায়ালেকটিক বিশ্লেষণ রয়েছে, একচেটিয়া পুঁজির বিকাশের নিয়ম ও প্রবণতা উদ্ঘাটিত হয়েছে। এরই ভিত্তিতে লেনিন একটা সিদ্ধান্ত টেনেছেন যা বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ও

কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রথমে কয়েকটি দেশে, এমনকি পৃথকভাবে একটি মাত্র দেশেও জয়যুক্ত হতে পারে, এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিরাট তাৎপর্যসম্পন্ন। নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের নিয়ম, এই প্রক্রিয়ায় রাজনীতি ও অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ ভূমিকা, সমাজতান্ত্রিক চেতনা, কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত নেতৃত্ব এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর কমিউনিস্ট শিক্ষার সম্পর্কে লেনিনের রচনা মার্কসবাদী তত্ত্বে বিশিষ্ট অবদান।

আজকাল শোধনবাদীদের মহলে মার্কসবাদের বিকাশে বিশেষতঃ মার্কসবাদী দর্শনে লেনিনের ভূমিকাকে খাটো করার চেষ্টা হচ্ছে। শোধনবাদীরা মার্কসবাদের ব্যাখ্যায় "লেনিন ও লেনিনবাদের একচেটিয়া অধিকার" অবসানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলছে। তারা লেনিনবাদকে একটি বিশুদ্ধ রুশীয় বিষয় বলে ঘোষণা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু, বাস্তবে লেনিনবাদ সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর অভিজ্ঞতার এবং বাস্তব সংগ্রামের সামান্যীকরণ। লেনিন লিখেছিলেন যে, রাশিয়া প্রচণ্ড সংগ্রামের দুঃখবহনের মধ্যে দিয়ে, অন্য দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজের বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে মার্কসবাদ আয়ত্ত করেছে। তাই লেনিনবাদ মার্কসবাদের অন্যতম সম্ভাব্য "ব্যাখ্যা" নয় বরং সাম্রাজ্যবাদী যুগে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে প্রয়োগের উপযোগী মার্কসবাদের একমাত্র সত্য ও সুসঙ্গত বিকাশ।

যে গভীরতর বিপ্লবী প্রক্রিয়ার মধ্যে পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রের দ্বারা অপসারিত হচ্ছে, ইতিহাসের প্রকৃত স্রষ্টা হিসেবে ঐতিহাসিক দৃশ্যপটে ব্যাপক জনগণের অভ্যুদয় ঘটছে, নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন এবং তার সহজাত নিয়মযুক্ত একটা নতুন সমাজের আবির্ভাব হচ্ছে—এ সবই মার্কসবাদী লেনিনবাদী তত্ত্বের অগ্নিপরীক্ষা। একই সঙ্গে ব্যাপক তত্ত্বগত সামান্যীকরণের প্রবল উদ্দীপনায় এই তত্ত্ব আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়।

সারা দুনিয়ার প্রগতিশীল মানুষের দ্বারা উদ্যাপিত লেনিনের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণে, আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনে এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের বিকাশে কী সাফল্য অর্জন করা গেছে তার একটি সার সংকলন করা হয়েছিল।

৫০ বৎসরের বেশী সময় ধরে সোভিয়েতের অস্তিত্বকালে সোভিয়েত দর্শনশাস্ত্রে ডায়ালেকটিকস এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, দর্শনের ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, নন্দনতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্রের সমস্যার ধারাবাহিক ব্যাখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছে। একই সঙ্গে কমিউনিজম নির্মাণের ক্ষেত্রে যতই সোভিয়েত জনগণের অগ্রগতি ঘটছে ততই তাদের সামনে যে কর্তব্য এসে দাঁড়াচ্ছে তা হল কমিউনিস্ট আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলো, সমগ্র বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়া

এবং মতাদর্শগত সংগ্রাম। আর এইজন্যেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের আরও অগ্রগতির তাগিদ দেখা দিচ্ছে।

সমস্ত বিজ্ঞানের মতই ডায়ালেকটিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মধ্যেও বেশ কিছুসংখ্যক প্রতিজ্ঞা রয়েছে যেগুলোকে আরও মূর্ত করা দরকার, হালের বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির আলোকে যাচাই করা দরকার ; নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটছে বিশেষ করে জ্ঞানতত্ত্ব ও সামাজিক ক্ষেত্রে।

বিকাশের প্রচণ্ড অগ্রগতি, সমকালীন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লব, বিশেষত, কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা, পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা, সাইবারনেটিকস ও মলিকিউলার জীববিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে চিরাচরিত দার্শনিক সমস্যা ও মূল প্রত্যয়গুলো নিয়ে (category) নতুন করে ভাবনা-চিন্তা ও বিকাশ সাধন এবং এগুলোকে আরও মূর্ত করে করে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই সঙ্গে নতুন বিষয়গুলোও ব্যাখ্যা করা জরুরী হযে উঠেছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শনের আরও বিকাশ ছাড়া, এর প্রত্যয়গুলোকে আরও উন্নত না করে সমাজের নতুন সমস্যাগুলোকে গভীরভাবে অনুধাবন করা, বর্তমান যুগের বিশেষ প্রকৃতিকে বোঝা অসম্ভব।

কমিউনিস্ট সমাজ গঠনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সমস্যাগুলো, ব্যক্তি ও সমাজের, সামাজিক ও মনুষ্যসংক্রান্ত ডায়ালেকটিক প্রশ্নগুলো আরও সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মানুষের সমস্যা—সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের পর্যায়ে যার অর্থ ছিল মানুষকে শোষণমুক্ত করা, সেটা বিজয়ী সমাজতন্ত্রের কালে অর্থাৎ কমিউনিজমের নির্মাণের পর্যায়ে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সমাজতান্ত্রিক সমাজে মানুষের স্বাধীনতা ও দায়-দায়িত্বের প্রসার, তার দৃঢ় মতাদর্শগত প্রত্যয় ইত্যাদি নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

তাই আমরা দেখি যে ডায়ালেকটিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সমস্যাগুলো অনবরত নতুন আকারে দেখা দিচ্ছে। পুরোনো ও চিরাচরিত প্রশ্নগুলোর নতুন নতুন দিক উদঘাটিত হচ্ছে, যার ফলে প্রয়োজন হচ্ছে বিশিষ্ট ধরনের গবেষণার। অতীতে তৎকালীন জ্ঞানের নিরিখে যেসব প্রশ্নের সমাধান করা হয়েছিল সেগুলো আবার নতুন করে দেখা দিচ্ছে—তাই প্রয়োজন হচ্ছে নতুন গবেষণার।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন তার সাফল্যভূমিতে থেমে থাকে না—নতুন বৈজ্ঞানিক সমস্যা ও নতুন সমাধানের দিকে নিরন্তর ধারায় এগিয়ে যায়।

———

ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ

তৃতীয় অধ্যায়

বস্তু ও তার স্থিতির মৌলিক রূপ

আমরা এতক্ষণ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের বিষয়বস্তু আলোচনা করলাম এবং দেখলাম কীভাবে এই দর্শনের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে। এখন আমরা এর মূল উপাদানগুলো ধারাবাহিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করব। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের বৈশিষ্ট্য হল চিরন্তন গতি ও বিকাশের মধ্যে বহির্জগৎ ও বস্তুর স্থিতির স্বীকৃতি দান। বস্তু কী? স্থিতির মৌলিক রূপ কী কী?

১ বস্তু সম্বন্ধে দার্শনিক ধারণা

আমাদের চারপাশের জগতে বিভিন্ন ধরনের গুণবিশিষ্ট অসংখ্য বস্তু ও ঘটনা আমরা লক্ষ্য করে থাকি। এই সকল বস্তু ও ঘটনাবলী কী? কিসের ওপর তাদের ভিত্তি।

এই সব প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছিল দর্শন যখন 'সবেমাত্র রূপ নিতে শুরু করে সেই সময়ে। বস্তুবাদ ও ভাববাদ এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী উত্তর দিয়েছে।

ভাববাদী দার্শনিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত পার্থিব বস্তু ও ঘটনার ভিত্তি এক ধরনের মানসিক ধারণার ওপর নির্ভর করে, যাকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়, যথা দৈবী ইচ্ছা, সর্বব্যাপী বিশ্ব-প্রজ্ঞা, পরম ধারণা ইত্যাদি। তাই হেগেলের দার্শনিক পদ্ধতি অনুসারে পরম ধারণার, দৈবস্থ আরোপিত ভাবের, বিচারবুদ্ধিসম্মত নীতির অপর সত্তার পরিণতিই এই জগৎ যা আত্মবিকাশের প্রবাহে প্রকৃতি এবং মানবেতিহাসের মাধ্যমে নিজের স্বরূপকে জানতে পারে। অন্যান্য বিষয়গত ভাববাদীরাও মোটামুটি এই মতই পোষণ করেন। অপরপক্ষে, আত্মগত ভাববাদীরা বাইরের জগতের বস্তুগুলোকে মানুষের অন্তর্জগৎ, সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ থেকে জাত বলে মনে করে। ইংরেজ দার্শনিক বার্কলে লিখেছিলেন "ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যা প্রত্যক্ষ করি উল্লিখিত বস্তুগুলো তা ছাড়া আর কী?" "আর যা প্রত্যক্ষ করি তা আমাদের নিজেদের ধারণা বা সংবেদন ছাড়া আর কী?" তিনি আরও লিখেছেন "কারণ, প্রত্যক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কহীন অচিন্তনীয় বস্তুর নিরপেক্ষ অবস্থান সম্বন্ধে যা বলা হচ্ছে তা আমার

কাছে সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধির অগম্য।"[১] বার্কলের যুক্তির মোদ্দা কথাটা দুই শতাব্দী পরে অস্ট্রিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী মাখ্, সুইস দার্শনিক আভেনারিয়াস ও তাঁদের অনুগামীরা পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। আর তাঁদেরই সমালোচনা করেছিলেন লেনিন মেটিরিয়্যালিজম এণ্ড এম্পিরিওক্রিটিসিজম বইটিতে। মাখ্‌পন্থীরা সমস্ত জিনিসকে সেগুলোর ধর্মের যোগফলে পর্যবসিত করেছিলেন, এগুলোকে তারা বলতেন মৌলিক পদার্থ। আর এগুলোই শেষপর্যন্ত তাঁদের কাছে সংবেদনে পর্যবসিত হয়েছিল।

জগতে ভাববাদী ব্যাখ্যা বাস্তবতার একটি বিভ্রান্তিকর, বিকৃত চিত্র উপস্থিত করে। অন্য পক্ষে, বস্তুবাদী দার্শনিকরা সর্বদাই ঘটনাবলীর স্বাভাবিক ও যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা খুঁজে বের করবার চেষ্টা করেছেন। এঙ্গেলস মন্তব্য করেছিলেন যে, দর্শন হিসেবে বস্তুবাদ মনে করে প্রকৃতির সঙ্গে আর কিছু যোগ না করে ঠিক যেমনটি আছে তেমনিভাবেই তাকে বোঝা উচিত। এই শিক্ষার ভিত্তি হল সমগ্র মানবজাতির সামাজিক-ঐতিহাসিক বাস্তব ক্রিয়াকলাপ; এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের চারপাশের জগৎ নানা ধরনের গতিশীল বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। সমগ্র জগতে এমন কিছুই নেই যা বস্তুর কোন নির্দিষ্ট আকার, নির্দিষ্ট অবস্থা বা ধর্ম এবং নিয়মানুগ পরিবর্তন ও বিকাশ নয়। সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের কথা বাদ দিলেও এমনকি খুবই বিমূর্ত ধারণা এবং প্রত্যয় একটি বস্তুগত দেহযন্ত্রের (মানুষের মগজ) ক্রিয়ার ফল এবং বাস্তব পদার্থের ধর্মাবলীকে প্রতিবিম্বিত করে। বস্তুর ধারণা, যা কিছু পৃথিবীতে আছে, তার এবং বাস্তবের সমস্ত জিনিস ও ঘটনার সবচেয়ে সাধারণ মর্মকে প্রকাশ করে।

জগৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির বিকাশ বস্তু ও তার মৌলিক গুণ ও গতির নিয়ম সম্পর্কে আমাদের বোধ গভীরতর হওয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। মার্কসবাদের পূর্বে বস্তুবাদী দর্শন ও প্রকৃতি বিজ্ঞান বস্তু সম্বন্ধে অনেক গভীর উক্তি করেছিল যা সমকালীন জ্ঞানের আলোকে এখনও তাৎপর্যপূর্ণ। এই গুলো বেশির ভাগই বলা হয়েছে বস্তু সম্বন্ধে যা সমস্ত ঘটনাবলীর সার্বিক বস্তুগত ভিত্তি, যা সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না, কালের মধ্যে যার শাশ্বত অবস্থিতি, যে দেশের মধ্যে অসীম, যার বিষয়গত বাস্তব অস্তিত্ব ও চেতনা-নিরপেক্ষ সত্তা আছে। মার্কসবাদীদের পূর্বসূরীরা, সর্বোপরি ১৮দশ শতকের ফরাসী বস্তুবাদীরা এটা ধরে নেবার মত ভিত্তি দিয়েছিলেন যে গতি ও বস্তু অবিচ্ছিন্ন এবং গতি হল বস্তুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম, তার অবস্থানের ধরন। প্রকৃতির সমস্ত ঘটনাই গণ্য করা হল, একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত শর্তাধীন এবং কতকগুলো প্রাকৃতিক ও অপরীবর্তনীয় নিয়মের অনুসরণকারী বলে। বস্তু এমনই জিনিস যাকে জানা যায়। আর সেগুলোকে যতই জটিল ও

১. ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ১৪শ খণ্ড, ২৫ পৃঃ।

অস্বাভাবিক বলে মনে হোক না কেন, তাদের ধর্ম ও নিয়মকে আবিষ্কার করা যায়। তারপর থেকেই বস্তুবাদী বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির এই সব নীতি ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ ও আধুনিক বিজ্ঞানে গৃহীত হয়েছে।

এই সঙ্গে, মার্কবাদীদের পূর্বসূরীরা তাঁদের সমকালীন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অবস্থা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁরা বস্তু সম্বন্ধে বেশ কিছু আধিবিদ্যক ও আনুমানিক ধারণা চালু করেছিলেন। বিজ্ঞানের পরবর্তী বিকাশের ধারায় এগুলো খণ্ডিত হয়ে গেছে। সর্বোপরি তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে সমস্ত দৃশ্যমান ঘটনাবলীর বাহক বা ভিত্তিস্বরূপ কোন এক ধরনের প্রাথমিক এবং অপরিবর্তনীয় বাস্তব পদার্থ আছে। এটা মনে করা হত যে, যদি বস্তুর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান ঘটে, নানা ধরনের পরিবর্তন হয় এবং তার রূপান্তর ঘটে তাহলে এই পদার্থের মর্ম অবশ্যই তার সমধর্মী ও অপরিবর্তনীয় এবং কেবলমাত্র এর বাইরের আকারটিই পরিবর্তন-যোগ্য। প্রায়ই পদার্থকে চিহ্নিত করা হত অবিভাজ্য, নিরাকার ও অপরিবর্তনীয় পরমাণু হিসাবে। এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে পরমাণুগুলোই জগতের প্রাথমিক অবিনশ্বর মৌলিক পদার্থ, যা শুধু দেশে সংযুক্ত ও পৃথক হতে পারে এবং স্থান পরিবর্তন করতে পারে; আর এইভাবেই এরা সমস্ত ঘটণাপুঞ্জের গুণগত বৈচিত্র্যকে নির্ধারণ করে। তাই পরমাণুর অপরিবর্তনীয়তার ধারণার সঙ্গে জগতের পদার্থগত ভিত্তি হিসাবে বস্তুর ধারণাকে এক করে দেখা হতে লাগল। আর বস্তুর ধ্রুবত্বের সাধারণ দার্শনিক নীতিকে পরমাণুর অবিভাজ্যতার নীতির সঙ্গে একীভূত করে দেখা হল।

বাস্তব পদার্থের গুণগত সমধর্মীতা জগতের এক যান্ত্রিক চিত্রের ভিত্তি গড়ে তুলেছিল। নিউটনীয় বলবিদ্যার নিয়মগুলোকে গণ্য করা হল প্রকৃতির সার্বজনীন নিয়ম হিসাবে, অস্তিত্বের মূল নীতি হিসাবে যা প্রকৃতি ও সমাজের অন্য সমস্ত নিয়মকে নিয়ন্ত্রিত করছে। যদিও রাসায়নিক, জৈবিক এবং সামাজিক প্রক্রিয়াগুলোকে অস্বীকার করা হল না, কারণ তাহলে সেটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যকে অস্বীকার করা হত, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ধরে নেওয়া হল যে, যেহেতু পরমাণু-গঠিত সমস্ত বস্তুদেহই বলবিদ্যার নিয়মের অধীন, তখন সমস্ত প্রকারের গতিকেই শেষপর্যন্ত পরমাণুর যান্ত্রিক গতিতে পর্যবসিত করা যেতে পারে। এর থেকেই এল এই সিদ্ধান্ত যে, যদি আমরা মানসিকভাবে সমস্ত বস্তুদেহকে পরমাণুতে বিশ্লেষণ করতে পারি, তাদের অবস্থান ও গতিবেগকে নির্ধারণ করতে পারি এবং তাদের গতির সমীকরণ নির্মাণ করতে পারি, তাহলে আমাদের নিজেদের চেতনা ও সামাজিক প্রক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণসমেত সমস্ত ঘটনাপুঞ্জ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ সম্ভব হবে।

মার্কস ও এঙ্গেলস পূর্বতন আধিবিদ্যক ও যান্ত্রিক বস্তুবাদের সঙ্কীর্ণতার একটা গভীর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করেছিলেন। উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিক

আবিষ্কার থেকে অগ্রসর হয়ে তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন বস্তু ও তার গতির নিয়ম সম্বন্ধে ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী তত্ত্ব। এই তত্ত্বই গুণগতভাবে জগতের একটি নতুন চিত্র সৃষ্টি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। জগতের যান্ত্রিক চিত্রটির ভিত্তি আরও দুর্বল হয়ে পড়ল উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের শুরুতে তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রতত্ত্ব, তেজস্ক্রিয়তা, পরমাণুর জটিল গঠন-বিন্যাস, বেগবৃদ্ধির ফলে বস্তুদেহে ভরের পরিবর্তন ইত্যাদি তত্ত্বের বিকাশে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিপ্লবের দ্বারা। নতুন আবিষ্কারগুলোকে ব্যাখ্যা করার কাজে বল-বিদ্যার নিয়মগুলোকে ব্যবহার করা যায় না, ভাববাদী দার্শনিকরা কিন্তু এই বিষয়টার ব্যাখ্যা করলেন বস্তুর নিত্যতার সূত্রের ওপর একটা আঘাত এবং "বস্তুর অন্তর্ধানের" প্রমাণ হিসেবে। বস্তুবাদীদের বিশ্বাসের সঙ্গে জগতের যান্ত্রিক চিত্রকে এক করে দেখিয়ে তাঁরা ঘোষণা করলেন যে অতঃপর বস্তুবাদকে উৎখাত করা হল।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নতুন আবিষ্কারগুলো কেবলমাত্র দেখিয়ে দিল যে, আধিবিদ্যক নীতির ভিত্তিতে জগৎ ব্যাখ্যার গলদটা কোথায়। ওগুলো যান্ত্রিক বিশ্বদৃষ্টিকে খণ্ডন করে বস্তু সম্বন্ধে ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী তত্ত্বকে স্বীকৃত দিল। লেনিন লিখেছিলেন "বস্তুবাদ জগতের একটা "যান্ত্রিক" চিত্র আঁকড়ে থেকেছে বা ঘোষণা করেছে আর তড়িচ্চুম্বকীয় বা অন্য কোন ধরনের অপরিমেয় জটিলতা পূর্ণ গতিশীল বস্তু জগতের চিত্রকে নয়, এ কথা বলা অবশ্যই অর্থহীন।" তিনি আরও লিখেছেন "পরমাণুর অবিনশ্বরতা, এর অক্ষয়ত্ব, বস্তুর সকল প্রকার রূপ ও গতির পরিবর্তন সর্বদাই ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল।"[১]

বস্তুর কাঠামোগত বিন্যাসের বহুধর্মীতা, অফুরন্ত রূপ ও তার গতির বিভিন্ন নিয়মের বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে লেনিন বস্তু সম্বন্ধে একটি সামান্যীকৃত দার্শনিক প্রত্যয় সূত্রবদ্ধ করেন। "বস্তু বাহ্যসত্তার অস্তিত্বব্যঞ্জক একটি দার্শনিক প্রত্যয়। একে (বাহ্যসত্তাকে—অনু) মানুষ তার সংবেদনে পায়, এর প্রতিচ্ছবি, চিত্র ও প্রতিবিম্ব আমাদের সংবেদনে ফুটে ওঠে, যদিও বাহ্যসত্তা এগুলো থেকে নিরপেক্ষভাবে বিরাজমান।"[২]

বস্তুর সংজ্ঞা দর্শনের মূল প্রশ্ন সমাধানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এটা দেখিয়ে দিচ্ছে যে বস্তু আমাদের বিষয়গত জ্ঞানের উৎস এবং এমন একটা কিছু যাকে জানা যায়। সেই সঙ্গেই পূর্বেকার দার্শনিক পদ্ধতির বিপরীতে ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ বস্তুকে পদার্থকণা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুদেহধারী পদার্থ প্রভৃতি কোন সুনির্দিষ্ট রূপে পর্যবসিত করে না। বস্তু হল অসংখ্য পৃথক পৃথক বিষয় ও সংস্থিতি যা দেশ ও কালে অস্তিত্ববান ও গতিশীল, যা অফুরন্ত

১. ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ১৪শ খণ্ড, ২৮০-৮১ পৃঃ।
২. ঐ ১৩০ পৃঃ।

বৈচিত্র্যময় গুণের অধিকারী, আমাদের ইন্দ্রিয় কেবলমাত্র বাস্তব অস্তিত্বযুক্ত সকল প্রকার বস্তুর অকিঞ্চিৎকর অংশকেই প্রত্যক্ষ করতে পারে কিন্তু ক্রমবর্ধমান অতি জটিল যন্ত্রপাতি ও পরিমাপ যন্ত্রের কল্যাণে মানুষ দৃঢ়ভাবে জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের সীমাকে প্রসারিত করে চলেছে।

বস্তু সম্বন্ধে লেনিনের সংজ্ঞার মধ্যে শুধুমাত্র বর্তমান বিজ্ঞানের জানা বস্তুগুলোই অন্তর্ভুক্ত হয় নি, যেগুলো ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হবে তাও এর মধ্যে রয়েছে। এই কারণেই পদ্ধতি হিসেবে এটা এত গুরুত্বসম্পন্ন। প্রকৃত অস্তিত্ব সম্পন্ন যে কোন বস্তু ও ঘটনা মানুষের মনে প্রতিবিম্বিত হতে পারে। উপরন্তু, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আমাদের যেসব বস্তুর সঙ্গে পরিচয় ঘটে ভবিষ্যতে তার বিপরীত কোনো অস্বাভাবিক ধর্ম-বিশিষ্ট নতুন বস্তু আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আসবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

যেমন মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যেসব বৃহদাকার পদার্থের সঙ্গে কাজকর্ম করে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত মৌল কণাগুলো সে সব থেকে গুণগতভাবে পৃথক এবং এটা আমাদের বস্তু সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি এনে দেয়।

ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ অপরিবর্তনীয় ও প্রাথমিক পদার্থের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। লেনিন লিখেছিলেন "বস্তু বা 'পদার্থের' স্বরূপও আপেক্ষিক। এটা শুধু মানুষের বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতার মাত্রাকে প্রকাশ করে। যেখানে অতীতে এই জ্ঞানের গভীরতা পরমাণুর ওপরে যায় নি, আর আজকেও তা যায় নি ইলেকট্রন ও ইথারকে ছাড়িয়ে। ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ মানুষের ক্রমবিকাশমান বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান-প্রকৃতির মধ্যেকার এইসব দূরত্ব-জ্ঞাপক চিহ্ন-গুলোর অস্থায়ী, আপেক্ষিক ও মোটামুটি সঠিক চরিত্রের ওপর জোর দেয়। ইলেকট্রনগুলোও পরমাণুর মতই অফুরন্ত—প্রকৃতি অসীম।"[১]

যে কোন আকারের বস্তুই জটিল কাঠামোসম্পন্ন এবং অসংখ্য রকমের ভেতর ও বাইরের সংযোগ ও ধর্মযুক্ত। তাই যে-কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে আরও বাড়ানো ও উন্নত করার জন্যে উন্মুক্ত রাখতে হবে। পরমাণুকে প্রকৃতির মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক জিনিস বলে বিবেচনা করা হত কিন্তু পরে দেখা গেল এগুলোও মৌল কণা দিয়ে গঠিত। জ্ঞানের আরও বিকাশ বস্তুর কাঠামোর মধ্যে আমাদের নিয়ে যাবে। তাই পদার্থের ধারণা মার্কসবাদী দর্শনে একটা মৌলিক নতুন অর্থ পেয়েছে।

সর্বশেষ ও অপরিবর্তনীয় সারসত্তা হিসেবে "আদিম বস্তু"র অস্তিত্ব অস্বীকার করে ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ এই অর্থেই বস্তুর পদার্থময়তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে যে, বস্তুই (চেতনা বা অতিপ্রাকৃত কোনো কিছু নয়) ঘটনাপুঞ্জের

১ ভি, আই, লেনিন: কালেক্টেড ওয়ার্কস, ১৪শ খণ্ড, ২৬২ পৃঃ।

একমাত্র সার্বিক ভিত্তি এবং তা আমাদের চারপাশের জগতের ঐক্যকে নির্ধারণ করছে।

এখানে আমাদের বিবেচনা করতে হবে যে দুইটি অর্থে বস্তুগত শব্দটি দর্শন সংক্রান্ত রচনায় ব্যবহার করা যেতে পারে। এটাকে ব্যবহার করা যেতে পারে বস্তুর কোন নির্দিষ্ট রূপ (যথা পরমাণু, মৌল কণা ইত্যাদি) বা বস্তুর কোন বিশেষ ধর্মের (যথা গতি, দেশ, শক্তি ইত্যাদি) বর্ণনা দিতে গিয়ে। জ্ঞানতত্ত্বের দৃষ্টিকোন থেকে বস্তুগত বলতে বোঝায় মনোজগৎ ও মানব-চেতনার বিপরীত কোন কিছু।

দৈনন্দিন জীবনে বস্তুর প্রত্যয়কে যুক্ত করা হয় পদার্থের প্রত্যয়ের সঙ্গে। এটা ধরে নেওয়া হয় যে, যে সমস্ত বস্তুর একটা 'দৈহিক' আকার আছে তাকেই বস্তু বলে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু তথ্যগতভাবে কেবলমাত্র যে সমস্ত পদার্থের সীমাবদ্ধ স্থিতি-ভর আছে বা বলা যায় যে, যখন কোন পর্যবেক্ষকের সঙ্গে সাপেক্ষভাবে কোন বস্তু-অবয়ব স্থির থাকে, তাকে মাপা যায়, তাকেই বলা যায় পদার্থ।[1] সেই সঙ্গেই এমন আকারের বস্তুর অস্তিত্বও আছে যাদের কোন অর্থেই পদার্থ বলা যায় না (তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্র)। এদের কোন স্থিতি-ভর নেই। তাদের আছে যাকে আমরা বলি ভরবেগ যা নির্ভর করে কণার (কোয়াণ্টা) তেজের উপর। এটা সম্ভব যে আজকের বিজ্ঞানের পরিচিত বস্তুর চেয়ে ভিন্ন রূপের বস্তুও থাকতে পারে।

কখনও কখনও কোনও জিনিসের বর্ণনা দেবার সময় আমরা এদের নানা ধর্মের যোগফল বলে মনে করি। বস্তুকে এভাবে গণ্য করা যায় বটে কিন্তু একে কেবলমাত্র ধর্মে পর্যবসিত করা যায় না। কারণ ধর্মগুলো একটা বস্তুগত ভিত্তি ছাড়া কখনই নিজে নিজেই থাকতে পারে না। তার সর্বদাই কোন না কোন নির্দিষ্ট বস্তুর অন্তর্নিহিত থাকে।

বস্তুর সর্বদাই একটা সংগঠন আছে। নির্দিষ্ট বস্তুগত সংস্থিতির মধ্যেই এর অবস্থান। সংস্থিতি (system) বলতে বোঝায় অভ্যন্তরীণভাবে সংগঠিত ও ঘনিষ্ঠ আন্তঃসম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন উপাদানের (elements) শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ। কোন সংস্থিতির উপাদানগুলোর নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক পরিবেশের অপেক্ষা বা অন্য সংস্থিতির উপাদানের সঙ্গে সম্পর্ক অপেক্ষা অনেক বেশী স্থায়ী ও অভ্যন্তরীণ দিক থেকে অপরিহার্য। কোন সংস্থিতির ভেতরকার কোন উপাদানের মধ্যে কোন পরিবর্তন অন্য উপাদানের অভ্যন্তরেও পরিবর্তন নিয়ে আসে।

সংস্থিতি ও উপাদানের মধ্যে ভাগটা আপেক্ষিক। কোন সংস্থিতি অন্য কোন সংস্থিতির উপাদান হতে পারে, তখন এটা হয়ে দাঁড়ায় তার অংশ। ঠিক একইভাবে কোনো কোনো সংস্থিতির অভ্যন্তরীণ কাঠামো এবং সম্পর্কগুলোকে পরীক্ষা করলে ঐ উপাদানটিও একটি সংস্থিতি হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এই

আপেক্ষিকতা সত্ত্বেও সংস্থিতির ধারণাটি ঘটনাবলীকে শ্রেণীবদ্ধ করার সুবিধার জন্যে মানুষের আবিষ্কৃত বা আত্মগত কল্পনা নয়। সুশৃঙ্খল ও সুসংহত সংগঠনরূপে সংস্থিতির একটা বাস্তব অস্তিত্ব আছে। যেমন—নীহারিকা, নক্ষত্র ও সৌরজগৎ, পৃথিবী (গ্রহ হিসেবে), অণু, পরমাণু ইত্যাদি, নানা ধরনের জৈব ও সামাজিক সংস্থিতি (ব্যবস্থা)। বস্তুকে জানা যায় কেবলমাত্র বস্তুর ধর্ম ও তার সংস্থিতিমূলক সংগঠনের সুনির্দিষ্ট রূপকে অনুশীলন করেই।

বস্তুর মূল রূপকে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় নানা ধরনের গুণাবলী অনুসারে, আর তাদের প্রত্যেকটাই বস্তুকে জানার এক-একটা পন্থার হদিশ দেয়। খুব সাধারণভাবে আমরা বস্তুকে ভাগ করতে পারি অজৈব (জড় পদার্থের সংস্থিতি) ও জৈব ও জীবন্ত বস্তু (সমস্ত জৈব সংস্থিতি) এবং সামাজিকভাবে সংগঠিত বস্তু (মানুষ এবং নানা রকম সমাজব্যবস্থা) হিসেবে। একমাত্র একটাই জৈব ও সামাজিক ব্যবস্থার কথা আমরা জানি যাকে আমরা পৃথিবীতে দেখি ; যদিও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে অসীম বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে অনুকূল ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবেশ যুক্ত গ্রহগুলোতে বস্তুর নিয়মাধীন স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের ফলে উন্নত গঠনের জীব থাকতে পারে।

উল্লিখিত সমস্ত আকারের বস্তুগুলো কী দিয়ে গড়া এটা দেখিয়ে তাদের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য অনুসারেও শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। প্রধানতঃ এগুলো পদার্থ-সৃষ্ট অর্থাৎ সসীম স্থিতি-ভর যুক্ত অতিক্ষুদ্র কণা, বৃহদাকার বস্তু এবং মহাজাগতিক ব্যবস্থার যোগফল। পদার্থের মধ্যে ধরা হয় মৌল কণা, পরমাণুর কেন্দ্রক, পরমাণু, অণু, অতিবিশাল অজৈব পদার্থ, জীবিত বস্তু, মনুষ্য নির্মিত ব্যবস্থাদি, নক্ষত্র, নীহারিকা ও নীহারিকামণ্ডলীগুলোকে।

আধুনিক বিজ্ঞান তথাকথিত অনুনাদকণাগুলো সহ ৩০০ প্রকারেরও বেশী মৌল কণা আবিষ্কার করেছে। এগুলো উচ্চশক্তি সম্পন্ন কণাগুলোর মিথষ্ক্রিয়ার সময় সৃষ্টি হয় এবং দ্রুত ভেঙ্গে গিয়ে স্থায়ী কণাদের মধ্যে মিলিয়ে যায়। বেশীর ভাগ জানা কণাগুলোর অনুরূপ বিপরীত বৈদ্যুতিক আধান বা অন্য ধর্মযুক্ত বিপরীত কণা আছে যথা প্রোটন—বিপরীত প্রোটন ইত্যাদি।

জটিল সংস্থিতি ও বিপরীত কণা তত্ত্বের দিক দিয়ে থাকতে পারে কেবলমাত্র সাধারণ আকারের পদার্থের অনুপস্থিতিতে ; কারণ যদি কণাগুলো বিপরীত-ধর্মী কণাদের সঙ্গে সংঘাতে আসে তাহলে উভয়েই অন্তর্হিত ('ধ্বংস') হয়ে (তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রের কোয়াণ্টা) ফোটনে পরিণত হয়। বর্তমানে বিপরীত কণা গঠিত কোন বৃহৎ পদার্থ আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত আধুনিক পদার্থবিদ্যার নিয়মে এবং বিপরীত কণা যা উচ্চশক্তিসম্পন্ন কণাদের মিথষ্ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত হয় এবং দ্রুত মিলিয়ে যায় তাদের অস্তিত্বের ফলে বিশ্বে এগুলোর অস্তিত্বের সম্ভাবনা আছে। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদিতে বিপরীত কণা যুক্ত বড় বড় অনুমানমূলক পদার্থ খণ্ডকে প্রায়ই "বিপরীত জগৎ"

"বিপরীত বস্তু" অথবা "বিপরীত পদার্থ" হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বাস্তবে কিন্তু জগৎ এক এবং এর কোন বিপরীত পৃষ্ঠ নেই এবং বস্তুর ধারণার মধ্যে বাহির্জগতের সমস্ত রূপই।

কণা ও বিপরীত কণার মধ্যে পার্থক্য খুবই আপেক্ষিক এবং তা কেবলমাত্র বস্তুর কতগুলো বিশেষ ধর্মের সঙ্গেই সম্পর্কিত। যেমন বিদ্যুতের পজিটিভ ও নেগেটিভ আধান, চুম্বক স্তর ইত্যাদি। এগুলোর অন্যান্য ধর্ম একই রকমের। পারমাণবিক, তড়িচ্চুম্বকীয়, মহাকর্ষীয় মিথষ্ক্রিয়ার নিয়মগুলো এবং নানা ধরনের রাসায়নিক যৌগের গঠন, মহাবিশ্বের প্রণালীবদ্ধ ব্যবস্থাদি এবং সম্ভবত পদার্থের জৈব রাসায়নিক বিবর্তনের নিয়মগুলো একই ধরনের। বিপরীত কণা দিয়ে গঠিত ব্যবস্থার মধ্যে সময় পরিবর্তিত হবে কেবল অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে—যেহেতু এর প্রবাহ নির্ধারিত হয় কার্য কারণ সম্পর্কের অনাবর্তনের দ্বারা এবং বস্তু বিকাশের সাধারণ ধারার ফলে। তাই বস্তুর কাল্পনিক রূপ দেখাতে গিয়ে "বিপরীত জগৎ" "বিপরীত বস্তু" এবং "বিপরীত পদার্থ" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে "বিপরীত কণিকার দ্বারা গঠিত পদার্থ" এই পদ ব্যবহার করাই সঙ্গত, কারণ যা সসীম স্থিতি-ভর পদার্থের বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করে তা সমস্ত বিপরীত কণায় (বিপরীত নিউট্রিনো ছাড়া) অন্তর্নিহিত থাকে।

বস্তুর যে-আকারগুলোকে পদার্থ হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা যায় না, সেগুলো হল তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্র (যেমন আলো) এবং যার কোয়াণ্টা কখনই স্থির অবস্থায় থাকে না এবং সদাসর্বদাই আলোর গতিতে ছুটছে (যা বিভিন্ন পদার্থের পরিবেশে এক নয়)। এমন যথেষ্ট তত্ত্বগত সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে যাতে বলা যায় যে, মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রকেও বস্তুর একটি বিশেষ রূপ বলে গণ্য করা উচিত, যদিও মহাকর্ষ ক্ষেত্রের কোয়াণ্টা গ্রাভিটোনের অস্তিত্বের কোন পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় নি। সঠিকভাবে বলতে গেলে, পদার্থের সঙ্গে ক্ষীণ মিথষ্ক্রিয়া-যুক্ত এবং প্রচণ্ড অন্তর্ভেদী শক্তিসম্পন্ন হওয়ার জন্যে নিউট্রিনো ও নানাপ্রকারের বিপরীত নিউট্রিনোকে পদার্থ বলে গণ্য করা উচিত নয়। এগুলো নক্ষত্রদের শক্তির বিরাট অংশকে নিয়ে চলে যায়, সমস্ত দেশান্তরে এরা ছড়িয়ে থাকে এবং এখনো পুরোপুরি জানা না গেলেও বিশ্ব বস্তুর সাধারণ বিকাশে এগুলোর ভূমিকা অবশ্যই বিরাট হতে পারে।

ইদানীং বিজ্ঞানীরা খোদ মৌল কণাগুলোর গঠনবিন্যাসের মধ্যে প্রবেশ করেছেন; দেখা যাচ্ছে এগুলো খুবই নির্দিষ্ট ধরনের এবং অন্যান্য বস্তুগত সংস্থিতির মতো নয়। ক্ষুদ্রাণু জগতের বস্তুগুলোর অনিঃশেষ রূপ ও বস্তুর অসীমতা সম্বন্ধে লেনিনের পর্যবেক্ষণের গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হয়েছে।

বস্তুর ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী তত্ত্ব এবং এর অবস্থানের নিয়ম বাস্তবের সঙ্গে

সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ব্যাখ্যা, সম্নিবদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টির পরিবর্ধন বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে পদ্ধতিগত ভিত্তি জুগিয়ে দিচ্ছে। অধিকন্তু যতই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতি ঘটছে, নতুন নতুন প্রত্যয় ও নিয়ম সূত্রবদ্ধ হচ্ছে ততই বাস্তবতার রূপ ক্রমাগত জটিল ও গভীরতর হচ্ছে। এইসব নিয়ম ও প্রত্যয়গুলো বাস্তবতার আরও সঠিক প্রতিবিম্বনে আমাদের সাহায্য করছে—যা সর্বদাই কিনা আমাদের সবচেয়ে নিখুঁত ধারণার থেকেও জটিলতর।

২ গতি ও তার মূল রূপ

যতই আমরা আমাদের চারপাশের জগৎকে জানতে শুরু করি ততই আমরা দেখি যে তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা চিরস্থির ও অপরিবর্তনীয়। সব জিনিসই আছে গতিশীল অবস্থায় এবং একরূপ থেকে আর এক রূপে। মৌল কণা, পরমাণু এবং অণুগুলো সমস্ত বাস্তব পদার্থে গতিশীল। প্রত্যেক জিনিস তার পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত আর এই মিথস্ক্রিয়া কোন না কোন ধরনের গতির সঙ্গে জড়িত।

যে কোন বস্তুদেহ, এমনকি যে বস্তুদেহ পৃথিবীর সম্পর্কে স্থির তাও সূর্যের চারিদিকে তার সঙ্গে এবং সূর্যের সাথে নীহারিকার অন্যান্য নক্ষত্রদের তুলনায় আবর্তনশীল। নীহারিকা আবার অন্যান্য নক্ষত্রব্যবস্থার তুলনায় গতিশীল—এইভাবেই চলছে। কোথাও চূড়ান্ত ভারসাম্য, স্থিরতা, অচলতা নেই। সমস্ত স্থিরতা এবং ভারসাম্যের অবস্থা আপেক্ষিক, কার্যত গতিশীল অবস্থায় রয়েছে।

খুবই সাধারণভাবে বিচার করলে গতি অর্থে **পরিবর্তন**—এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় পরিবর্তন বোঝায়। **গতি হল বস্তুর সার্বিক ধর্ম, অবস্থানের ধরন। জগতের কোথাও গতিহীন বস্তু নেই। যেমন নেই বস্তুহীন গতি।**

যেহেতু বস্তু গতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত এবং স্বাভাবিক ক্রিয়াসম্পন্ন, সেহেতু বস্তুর গতি সৃষ্টির জন্যে বাইরে থেকে কোনো দৈব ধাক্কার প্রয়োজন করে না ("আদি ধাক্কার" ধারণাটি পোষণ করতেন একসময় কয়েকজন আধিবিদ্যক দার্শনিক, যাঁরা বস্তুকে নিষ্ক্রিয়, গতিহীন জড়পদার্থ বলে মনে করতেন)।

বস্তুই সমস্ত পরিবর্তনের মাধ্যম, জাগতিক প্রক্রিয়ার মর্মগত ভিত্তি। বস্তুবিচ্ছিন্ন গতি বলে কোন জিনিস নেই। "বিশুদ্ধ গতি" বলেও কিছু নেই। বস্তুবিচ্ছিন্ন গতি থাক্যর সম্ভাবনা কল্পনা করেছিলেন তেজবাদের প্রবক্তারা (বিশেষতঃ জার্মান বৈজ্ঞানিক উইলহেলম অসওয়াল্ড, যাঁর মতকে লেনিন সমালোচনা করেছিলেন **মেটিরিয়ালিজম এণ্ড এম্পিরিওক্রিটিসিজম** বইতে)। এই বৈজ্ঞানিকরা মনে করতেন বস্তুবিচ্ছিন্ন, কোন প্রকারের অবাস্তব

"বিশুদ্ধ তেজই" সমস্ত পরিবর্তনের ভিত্তি। বাস্তবে, তেজ বস্তুর ধর্ম। এটা হল গতির পরিমাণগত মাপ যা অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ভিত্তিতে কোন বাস্তব ব্যবস্থার কিছু পরিমাণ কাজ করবার সামর্থ্যকে প্রকাশ করে। তেজ বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না এবং জড়দেহের অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে একত্রে নিজেকে প্রকাশ করে।

তেজবাদের দৃষ্টিভঙ্গি কয়েকজন আধুনিক বৈজ্ঞানিকের যুক্তির মধ্যে দৃঢ়ভাবে টি'কে আছে। তাঁরা কণা ও বিপরীত কণার মিথস্ক্রিয়াজাত তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রের কোয়াণ্টাতে (ফোটন) পরিবর্তিত হওয়ার ঘটনাটি থেকে ভাববাদী সিদ্ধান্ত টানছেন। তাঁদের মতে এটার পরিণাম হল বস্তুর বিনাশ (নিশ্চিহ্ন) এবং বিশুদ্ধ তেজে রূপান্তর। বাস্তবে কিন্তু তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রকে তেজে পর্যবসিত করা যায় না কারণ এটা প্রকৃতপক্ষে বস্তুরই অন্যতম রূপ। কণা ও বিপরীত কণার ফোটনে রূপান্তর বস্তুর নিশ্চিহ্নতা নয় বরং এটা ভর ও শক্তির নিত্যতা, ভর-বেগের ভ্রামক, ঘূর্ণন (কণাগুলোর আবর্তন ভ্রামক), বৈদ্যুতিক আধান ও অন্যান্য ধর্মের নিয়মগুলোর সঙ্গে কঠোর সঙ্গতিপূর্ণভাবে একরূপ থেকে অন্য আকারে রূপান্তর।

আমরা প্রকৃতির মধ্যে নানা ধরনের অসংখ্য গুণগতভাবে পৃথক বাস্তব সংস্থিতির সম্মুখীন হই এবং সেগুলোর প্রত্যেকটিরই বিশেষ ধরনের গতি আছে। এই গতিগুলোর মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের জানা খুব সামান্য সংখ্যককেই মৌলিক আকারের গতি হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সমধরনের বাস্তব পদার্থে অন্তর্নিহিত এক প্রস্থ বস্তু, প্রণালীবদ্ধ ব্যবস্থা ও তার রূপান্তর, যার সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে এবং কতকগুলো সাধারণ নিয়ম মেনে চলে (বিভিন্ন রূপের গতির পার্থক্যের জন্যে)।

মৌলিক গতির রূপগুলোর শ্রেণীবিন্যাস অনেকটাই এসেছে এঙ্গেলসের কাছ থেকে। তিনি তাঁর **ডায়ালেকটিকস অব নেচার গ্রন্থে** জৈবিক ও সামাজিক প্রকৃতির গতির সংজ্ঞা নির্ণয় ও তাদের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করেছিলেন।[১]

যান্ত্রিক স্থানচ্যুতি, তাপ, আলো, বিদ্যুৎ, চুম্বক, রাসায়নিক গতি, জৈবিক (জীবন) এবং সামাজিক গতি, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত চিন্তন,—এই ধরনের নানা রূপের গতি তিনি লক্ষ্য করছিলেন। এই শ্রেণীবিন্যাসের তাৎপর্য আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এটা এগোচ্ছে বস্তুর ঐতিহাসিক বিকাশের নীতি অনুসারে এবং এই ধারণার ওপর যে উচ্চ রূপের গতিকে নিম্ন রূপের গতিতে গুণগতভাবে পর্যবসিত করা যায় না। গত ১০০ বছরে বিজ্ঞান ক্ষুদ্রাণুজগতে, মহাকাশে, জৈব ক্ষেত্রে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বহুবিধ নতুন ঘটনা আবিষ্কার করেছে, যা মৌলিক গতির রূপ সম্বন্ধে আমাদের ধ্যানধারণাকে অনেক প্রসারিত করে।

মৌলিক রূপের গতিগুলোর মধ্যে আমরা সেই গুলোকেই প্রথম আলোচনা

১ ডায়ালেকটিকস অব নেচার, মস্কো, ১৯৭২, ৮৪-৮৬ পৃঃ।

করে নেব যাদের চরিত্র খুবই সার্বজনীন, যাদের দেখতে পাওয়া যায় জ্ঞাত সমস্ত দেশ ও কালের পরিমাপে বস্তুর অতি বিভিন্ন স্তরের কাঠামোতে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত দৈশিক স্থানচ্যুতি, যা যে কোনো পরিবর্তনের অনুগামী। এরা প্রকাশ হতে পারে সমরূপী, ত্বরিত, ঋজুরৈখিক, ঘূর্ণায়মান ও দোলনশীল গতি হিসেবে। এটা গ্রহ-নক্ষত্রের পথে অথবা অন্য পথেও ঘটতে পারে। মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের মাধ্যমে মিথস্ক্রিয়াশীল সমস্ত জ্ঞাত জড়দেহগুলোর প্রবাহই মহাকর্ষ-গতি এবং তারও খুব সার্বজনীন চরিত্র আছে। এই পারস্পরিক ক্রিয়া নির্ধারণ করছে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ব্যবস্থা এবং পদার্থের অতি বিশাল ভরপিণ্ডগুলোর গঠন। তড়িচ্চুম্বকীয় গতি যা তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত মিথষ্ক্রিয়া প্রবাহের অন্তর্ভুক্ত, তা ব্যাপকভাবে প্রকৃতির রাজ্যে দেখা যায়। তড়িচ্চুম্বকীয় মিথষ্ক্রিয়া মৌলিক কণাগুলোর পরমাণুতে, পরমাণুকে অণুতে এবং অণু থেকে অতিকায় পদার্থ পিণ্ডে পরিণত হবার অবস্থা সৃষ্টি করে।

আমাদের অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে, পরমাণু কেন্দ্রকের এবং গঠন বিন্যাসের মৌল কণাগুলোর গতির বিশেষ চরিত্র সম্বন্ধে। সমস্ত ধরনের পারমাণবিক তেজ এই গতিরই নানা রূপের প্রকাশ। কতকগুলো পরমাণুর অন্যটিতে রূপান্তর এবং অণুর গঠনপ্রক্রিয়া সংঘটিত হয় অণুর মধ্যেকার পরমাণুদের যোগাযোগের পরিবর্তনে এবং অণু-পরমাণুর ইলেকট্রনীয় আবরণের পুনর্গঠনে। এই প্রক্রিয়াই হল গতির রাসায়নিক রূপ।

অতি ক্ষুদ্র জড়কণার গতি খুব জটিল ব্যবস্থার মধ্যেও তাদের কাজ চালিয়ে যায়। কিন্তু অতি জটিল সংস্থিতির ধর্ম এবং পরিবর্তনের নিয়মকে এগুলোর গঠনকারী সূক্ষ্ম ব্যবস্থা ও সূক্ষ্ম কণাদের ধর্ম ও গতির নিয়মে পর্যবসিত করা যায় না। এই পার্থক্যই কোন সংস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গতির রূপের গুণগত বৈশিষ্ট্যকে ধরে রাখে।

কোন বৃহৎ সত্তা এবং মহাকাশ জগতের পরিমাপের বৈশিষ্ট্যসূচক গতিগুলো হল তাপ, বস্তুর সমষ্টিগত অবস্থার পরিবর্তন ও কেলাসন প্রভৃতি।

জৈবগতির অন্তর্ভুক্ত প্রক্রিয়াগুলো রয়েছে জৈবদেহ ও উন্নত জৈব সংস্থিতির মধ্যে, যথা পরিবার, জীবাণু উপনিবেশ, প্রজাতি, বায়োজিওসিনোসিস[১] এবং সমস্ত জীবমণ্ডলে। জীবন প্রোটীন দেহ এবং নিউক্লিক এসিডের অবস্থানের একটা ধরন যা গড়ে ওঠে বিপাকক্রিয়ার মধ্যে জীবদেহ ও পরিবেশের সঙ্গে অবিরাম পদার্থের বিনিময়ে, জীবের আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধির প্রয়োজনে প্রতিবিম্বন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে।

১ বায়োজিওসিনোসিস প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির একটি গোষ্ঠী—অর্থাৎ একটি জৈব গোষ্ঠী যা কিনা তার পরিবেশ সমেত সমগ্র পরিবেশের কিছুটা অংশে-বাস করে। জীবমণ্ডল হল এই গ্রহের অধিবাসী সমস্ত জৈবদেহের সমষ্টি, এই জীবেরা বায়ুমণ্ডল, জল অথবা শুষ্ক ভূমি বা পৃথিবীর ভূত্বকে বাস করে।

সমস্ত জৈবদেহই একটা উন্মুক্ত ব্যবস্থা। অবিরাম পরিবেশের সঙ্গে পদার্থ ও তেজ বিনিময় করে জৈবদেহ নিজের গঠন ও ক্রিয়াকে পুনর্গঠন করে এবং আপেক্ষিকভাবে সেগুলোকে স্থিতিশীল করে রাখে। এই বিপাকক্রিয়ার পরিণতি হয় স্বগঠনকারী কোষের নবীকরণে। এটার ভিত্তি হল জৈবদেহে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মরক্ষার যে ধারা চলেছে তার নিয়ম এবং জৈবদেহের অস্তিত্বের শর্তের মধ্যে যে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রতিবিম্বন প্রক্রিয়া চলেছে তার উপর।

মানব সমাজ তার গতির আভ্যন্তরীণ সামাজিক রূপ সমেত পৃথিবীতে গতির সর্বোচ্চ স্তরে পেঁছেছে। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই রূপের গতি অবিরাম জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। এই গতির মধ্যে পড়ে মানুষের সর্বপ্রকারের উদ্দেশ্যমূলক কাজকর্ম, সমস্ত সামাজিক পরিবর্তন, নানা ধরনের সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে মিথস্ক্রিয়া—ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রে এবং সাধারণভাবে সমাজে। ধারণা ও তত্ত্বগুলো হল বাস্তবতার প্রতিবিম্ব-প্রক্রিয়া। এসব গতির সামাজিক রূপের প্রকাশ।

বস্তুর সমস্ত প্রকারের গতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। সর্বোপরি একে দেখতে পাওয়া যায় বস্তুর ঐতিহাসিক বিকাশে এবং আপেক্ষিকভাবে নিম্নতর রূপের ভিত্তিতে উচ্চতর রূপের গতির আবির্ভাবে। উচ্চতর রূপের গতির অন্তর্ভুক্ত হয় রূপান্তরিত নিম্নতর রূপের গতি, যার ভিত্তিতেই ওগুলো সৃষ্টি হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, মানুষের জীবন সক্রিয় থাকে ভৌতরাসায়নিক ও জৈব গতির ওপর এক অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের মধ্যে, আর মানুষ হল নিজে সমস্ত সামাজিক গতির কর্তা ও মাধ্যম।

গতিগুলোর আন্তঃসম্পর্ক অনুধাবন করার সময় নিম্নতর রূপের থেকে উচ্চতর রূপকে পৃথকীকরণ করা এড়াতে হবে। আর সেই সঙ্গে প্রথমটিকে পরেরটিতে যান্ত্রিকভাবে পর্যবসিত করাও চলবে না।

যদি আমরা নিম্নতর রূপ থেকে উচ্চতর রূপকে পৃথক করি তাহলে আমরা উৎসকে ব্যাখ্যা করতে পারব না। উদাহরণস্বরূপ, জীব-বিজ্ঞানে এই ধরনের বিচ্ছিন্নকরণ "প্রাণবাদে" পরিণত হয়। এটি একটি ভাববাদী মতবাদ, যা এই মত পোষণ করে যে সমস্ত জীবের জীবনক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তাদের মধ্যেকার "জীবনীশক্তি" এবং "এনটেলেকি" যেগুলো শেষ বিশ্লেষণে দিব্য শক্তিজাত। প্রাণ সৃষ্টির ঐতিহাসিক উৎস এবং ভৌত রাসায়নিক রূপের গতির ওপর প্রাণ প্রক্রিয়ার নির্ভরতাকে আবিষ্কার করে বিজ্ঞান প্রাণবাদের ওপর একটি আঘাত হেনেছে।

উচ্চতর রূপের গতিতে নিম্নতর রূপের গতিকে নামিয়ে আনা হলে এই রূপগুলোর নির্দিষ্ট ধরন অস্বীকার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক প্রক্রিয়ার কতকগুলো নির্দিষ্ট দিক ও বৈশিষ্ট্য আছে যা জৈব প্রক্রিয়ার সহজাত

নয় ; আর যে-কোন জৈব রূপের গতি আমরা অনুশীলন করি না কেন, তাদের থেকে সামাজিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত টানা যায় না। ঠিক একইভাবে জৈব রূপের গতিকে ভৌত বা রাসায়নিক রূপে পর্যবসিত করা যায় না।

উচ্চতর ও নিম্নতর রূপের গতির মধ্যেকার গুণগত পার্থক্যকে অগ্রাহ্য করলে সেটা যান্ত্রিকতাবাদে পৌঁছায়। যে কেউই যান্ত্রিকতাবাদে পৌঁছয় যখন সে পূর্ববর্তী ও মাঝের স্তরকে হিসেবে না এনে উচ্চতর রূপকে নিম্নতর রূপে নামিয়ে আনে। তাই অনেকে কখনও কখনও সাইবারনেটিক যন্ত্রের মধ্যে যে তথ্য প্রবাহ চলে তার সঙ্গে চিন্তনকে এক করে দেখেন এবং এই মূল ঘটনাটিকে দেখতে পান না যে সাইবারনেটিক যন্ত্রের সমস্ত প্রবাহধারাই ভৌত গতির রূপ। অন্যদিকে চিন্তার কাজটি হয় অত্যন্ত জটিল জৈব ও সামাজিক গতির রূপের মধ্যেকার মিথস্ক্রিয়ার ফলে, চিন্তা সামাজিক বিকাশেরই ফল, আর সেইজন্যেই যা মানব-মস্তিষ্কে প্রতিবিম্বিত হয় তাকে পর্যবেক্ষণ না করে চিন্তাকে বোঝাই যায় না।

বিভিন্ন গতির মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্কের জ্ঞান থেকে জগতের বস্তুগত ঐক্য ও বস্তুর ঐতিহাসিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলোর পদ্ধতিগত চাবিকাঠির সন্ধান পাওয়া যায়। বস্তুর অস্তিত্বের ধর্ম ও নিয়মের অধ্যয়ন অনেকটাই মিলে যায় বস্তুর বিভিন্ন কাঠামোগত স্তর ও বিকাশের স্তরের গতির বৈশিষ্ট্যের অধ্যয়নের সঙ্গে। বস্তুর (জ্ঞানের নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভব, কোন কোন বিজ্ঞানের পদ্ধতি অন্যান্য বিজ্ঞানে প্রয়োগ ইত্যাদি) সমকালীন বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে যে সব জটিল প্রক্রিয়া চলেছে সেগুলোকে ব্যাখ্যা করা এবং বস্তুর নানারকম গতির গবেষণা-সংক্রান্ত বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ করার ক্ষেত্রে বস্তুর গতিসম্পর্কিত বিশেষ গুণ ও তাদের আন্তঃসম্পর্কের সংজ্ঞা নির্ধারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৩. দেশ ও কাল

যে কোন জিনিসেরই বিস্তৃতি আছে, সেটা হতে পারে দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব, প্রশস্ত অথবা সংকীর্ণ, উঁচু বা নিচু। জিনিসগুলো যেখানেই থাকুক না কেন, তারা আরও অন্য জিনিসের মধ্যে থাকবে। বস্তু-দেহের আয়তন ও একটা বাহ্যিক আকার আছে। বস্তুর গতির প্রতিটি রূপই দেহের স্থানচ্যুতির সঙ্গে জড়িত। এ সমস্ত থেকে এটাই প্রকাশ পায় যে বস্তুদেহ, যে-কোন জিনিস দেশে অবস্থিত, আর দেশ হল বস্তুর গতির মৌল অবস্থা।

দেশ হল গতিশীল বস্তুর বাস্তব সত্তার অবস্থানিক রূপ। পদার্থের সহ-অবস্থান ও বিচ্ছিন্নতা, তাদের বিস্তৃতি ও একটির সঙ্গে অন্যটির বিন্যাসক্রম দেশসংক্রান্ত ধারণার মধ্যে প্রকাশ পায়।

বাস্তব প্রক্রিয়াগুলো একটা ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে (একটার পর আর একটা), এই প্রক্রিয়াগুলোর স্থিতিকালের দ্বারা তাদের পার্থক্য করা হয়, আর এদের বিভিন্ন পর্যায় বা স্তর আছে। এর মানে এই যে সমস্ত বস্তুদেহ কালের মধ্যে থাকে।

প্রক্রিয়াগুলোর বিভিন্ন স্তর বিভিন্ন স্থিতিকালের এবং একটি অপরটির কাল-পর্ব থেকে বিচ্ছিন্ন—এই বিষয়টি হল এইসব প্রক্রিয়ার অস্তিত্বের মূল শর্ত। কালের বাইরে বস্তুর গতি অসম্ভব।

কাল হল গতিশীল বস্তুর বাস্তব সত্তার অবস্থানিক রূপ। এটি সূচিত করছে বাস্তব প্রক্রিয়াগুলোর কালক্রম, এদের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পার্থক্য স্থিতিকাল ও বিকাশকে।

লেনিন লিখেছেন, "জগতে গতিশীল বস্তু ছাড়া আর কিছুই নেই, আর গতিশীল বস্তু কাল ও দেশের মধ্যে ছাড়া অন্য কোন ভাবে থাকতে পারে না।"[১]

কোন বাস্তব পদার্থ কালে না থেকে শুধু দেশে থাকতে পারে না অথবা দেশে না থেকে কালের মধ্যেও থাকতে পারে না। একে অবশ্যই সর্বদা এবং সর্বত্র দেশ ও কাল উভয়ের মধ্যে থাকতে হবে। তাই দেশ ও কাল অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

ভাববাদী দার্শনিকরা দেশ ও কালের 'বাহ্য সত্তাকে অস্বীকার করেন; তাঁরা সেগুলোকে মানব চৈতন্যস্থিত অথবা চৈতন্যের কল্যাণে আত্মাসৃষ্ট একটা কিছু বলে বিশ্বাস করেন। তাই কাণ্ট দেশ ও কালকে মনে করতেন ইন্দ্রিয়জাত (এ প্রিয়রি) প্রজ্ঞালব্ধ ধারণা যা আমাদের চেতনার প্রকৃতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। মাখের কাছে দেশ ও কাল আমাদের সংবেদনের সুশৃংখল ধারা মাত্র। হেগেলের দর্শনে দেশ ও কাল হল অনাপেক্ষিক পরম ধারণার সৃষ্টি। এর আবির্ভাব হয় এর বিকাশের কোন একটি স্তরে এমনভাবে যে, দেশ আগে আবির্ভূত হয় আর তার পর আসে কাল।

দেশ ও কালের ভাববাদী ধারণা মানুষের সমস্ত বাস্তব অভিজ্ঞতাও বিজ্ঞানের বিকাশের মধ্যে দিয়ে খণ্ডিত হয়েছে। কেমন করে এই দাবির সঙ্গে একমত হওয়া যায় যে দেশ ও কাল চেতনা বা চিৎশক্তির সৃষ্টি, একটি ধারণাজাত অথবা এরা আছে কেবলমাত্র আমাদের চেতনার মধ্যে। যদিও প্রকৃতি-বিজ্ঞান দেখিয়েছে, মানুষ ও তার চেতনা, শক্তি ও ধারণা সৃষ্টি হওয়ার লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে পৃথিবী দেশে অবস্থিত হয়ে কালের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়েছে। দেশ ও কাল সম্বন্ধে ভাববাদী মতের ত্রুটি দেখানোর জন্যে লেনিন এই তথ্যটি উল্লেখ করেন "লক্ষ লক্ষ বৎসরের মাপে মানুষ ও মানুষের অভিজ্ঞতা আবির্ভাবের বহু পূর্বে প্রকৃতির কালগত অবস্থান দেখিয়ে দিচ্ছে যে ভাববাদীদের তত্ত্ব কত

১. ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ১৪শ খণ্ড, ১৭৫ পৃঃ।

আজগুবী।"[১] বস্তুর প্রকৃত রূপ হিসেবে দেশ ও কাল অনেকগুলি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত। প্রথমতঃ এগুলো বাহ্যসত্তাসম্পন্ন ও চেতনার বাইরে স্বাধীনভাবে বিরাজমান। দ্বিতীয়ত এগুলো নিত্য, কারণ বস্তুর স্থিতিও নিত্য। তৃতীয়ত, দেশ ও কাল সীমাহীন ও অনন্ত; সীমাহীনতা ও অন্তহীনতার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা পার্থক্য টানা হয়।

দেশের সীমাহীনতা বলতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বোঝায়। আমাদের যাত্রাস্থল থেকে যে-কোন দিকে বা যতদূরেই আমরা যাই না কেন, কোথায়ও এমন কোন সীমা থাকবে না, যার ওপারে আমরা আর যেতে পারি না। সর্বত্রব্যাপী দেশ শুধু সীমাহীনই নয়, অনন্তও বটে। যত বিশালই মহাবিশ্বের কোন ব্যবস্থা (যথা নীহারিকা, বিশাল নক্ষত্রপুঞ্জ যার মধ্যে রয়েছে আমাদের সূর্য) হোক না কেন সেটি বৃহত্তর কোন একটি ব্যবস্থার অংশমাত্র। বিজ্ঞান ক্রমশঃই অসীম বিশ্বের গভীরে প্রবেশ করছে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রাদি এমন দূরত্ব পরিমাপ করতে সাহায্য করছে যা আলোর গতিতে সেকেন্ডে ৩০০,০০০ কিলোমিটার বেগে ছুটে ১০ বিলিয়ন (১০ শত কোটি) বা তারও বেশি বৎসরে দূরে যাবে। এই দূরত্ব এমনই বিস্ময়কর যে কল্পনাকে হারিয়ে দেয়। কিন্তু এইগুলিও শেষ সীমা নয়। একটা নক্ষত্রমণ্ডলী আমাদের থেকে যত দূরেই যাক না কেন তার চেয়েও বিশাল আকাশচারী জড়জগৎ এবং মহাকাশীয় পদার্থ অকল্পনীয় দূরত্বে থেকে যাবে। দেশের অসীমতা হল সমস্ত বিশ্বের অগণিত বস্তুদেহের সমষ্টিগত আয়তনেরই অসীমতা।

কালের সীমাহীনতা ও অনন্ততা বলতে কী বুঝি? একটা মুহূর্ত পর্যন্ত কাল যতই বয়ে যাক, এ সব সময়েই বয়ে যাবে কিন্তু কোনদিন এমন সীমায় গিয়ে পৌঁছবে না যার পরে এর আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, নিরন্তর ধারায় প্রবাহিত হবে না এবং তাদের সামগ্রিক অসীম ও অনন্ত স্থিতিকাল থাকবে না। একইভাবে কোন একটা ঘটনা যত আগেই ঘটে থাকুক না কেন, তারও আগে অবশ্যই অসংখ্য ঘটনা পরম্পরার একটা সমষ্টিগত অসীম স্থিতিকাল ছিল। আর তবু কাল বয়ে যায় এমনভাবে যা আর ফিরে আসে না, পুনরাবৃত্তি করে না, কেবলই মুহূর্ত থেকে মুহূর্তান্তরে নিরন্তর ধারায় বয়ে যায়।

"লাল রংএর দিকে সরে যাওয়া" (রেড সিফট) তথ্যটিকে অনেক সময় সীমাহীন দেশ ও কালের ধারণার বিরুদ্ধে একটি যুক্তি হিসেবে খাড়া করা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গেছে যে, নিয়ম অনুযায়ী আমাদের নীহারিকার থেকে দূরে নক্ষত্রপুঞ্জের বর্ণালী (অর্থাৎ আলোক রশ্মি বিশ্লিষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে বিশ্লেষণে উৎপন্ন বিভিন্ন বর্ণের আলোতে ভাগ হয়ে যাওয়া) কতকটা পরিমাণে দীর্ঘ তরঙ্গের (বর্ণালীর লাল রেখা—তাই এর নাম 'রেড

১. ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ১৪শ খণ্ড, ১৭৮ পৃঃ।

সিফট') দিকে সরে যায়। এই বর্ণালী অপসরণ ঘটতে পারে কারণ আলোর উৎস এবং সেটির গ্রহণকারী যন্ত্র একটা নির্দিষ্ট বেগে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যতই বেগ বাড়বে ততই বর্ণালী সরবে। যেহেতু নক্ষত্রপুঞ্জের বর্ণালীর লালের দিকে সরে যাওয়ার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায় নি, তাই কিছু সংখ্যক বৈজ্ঞানিক এই কল্পনা করেছেন যে নক্ষত্রপুঞ্জ আমাদের নীহারিকা থেকে এমন একটা গতিবেগে দূরে সরে যাচ্ছে, এবং যার বেগ দূরত্ব অনুযায়ী মোটামুটি বৃদ্ধি পায়। অন্যভাবে বলতে গেলে নক্ষত্রপুঞ্জ যতই দূরে যাবে আমাদের কাছ থেকে ততই দ্রুত ছুটবে। এই তত্ত্ব থেকে (যেটা বিস্ফারমাণ বিশ্বের তত্ত্ব বলে পরিচিত) মাঝে মাঝে এই সিদ্ধান্ত টানা হয় যে এক সময় বিশ্ব ছিল ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে পুঞ্জীভূত, একটি আদি পরমাণু, যা কালের কোন আদিতম মুহূর্তে হঠাৎ প্রসারিত হতে শুরু করল। এইভাবেই একটা আদি ক্ষুদ্র সত্তা থেকে সূত্রপাত হল 'দেশের বিস্তার'। এই প্রক্রিয়াকে ঈশ্বরের "প্রথম পরমাণু" সৃষ্টি হিসেবে এবং তার ইচ্ছায় এই বিস্তারের সূত্রপাত বলে খোলাখুলি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। এই বক্তব্যের সমর্থনে অবশ্যই কোন বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই।

'বিস্ফারমান বিশ্বের' গাণিতিক ছকগুলো অনন্তের প্রকৃতি ও স্বরূপ, সীমা ও অসীমের সম্বন্ধ ইত্যাদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা উত্থাপন করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গেই এগুলো বিশ্বের রীতি-প্রকৃতির সামান্যতম অংশের প্রাথমিক আন্দাজ মাত্র এবং এর থেকে দেশ ও কালগত কাঠামো সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তের ভিত্তি পাওয়া যায় না।

যদিও দেশ এবং কাল উভয়েই বস্তুর স্থিতির রূপ কিন্তু তাদের মধ্যে রূপগত পার্থক্য আছে। যেমন তাদের সাধারণ গুণ আছে তেমনই তারা পরস্পর থেকে খানিকটা আলাদা।

এঙ্গেলস লিখেছিলেন, কোনো কিছু সৃষ্টি হতে হলে "...এর শুধু দেশগত সহ-অবস্থানের ইতিহাস থাকলেই চলবে না, থাকতে হবে কালের পর্যায়-ক্রমেও।"[১]

দেশের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল তার ত্রিমাত্রা। দেশের ত্রি-মাত্রিক চরিত্র এইখানেই প্রকাশ পায় যে দেশের মধ্যে একটি বিন্দুর অবস্থান নির্ধারিত হয় সেই বিন্দু থেকে যে-কোন তিনটি সূত্র-কাঠামো হিসেবে (ফ্রেম অব রেফারেন্স) বাছাই করা পরস্পর ছেদক সমতলের দূরত্ব দেখিয়ে। আকারবিশিষ্ট যে-কোন বস্তুদেহই অবশ্যই ত্রি-মাত্রিক হবে।

সুষমাও (symmetry) দেশের একটি ধর্ম। বিজ্ঞান নানা ধরনের দেশিক সুষমার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে। দেশের সুষমতার ধর্ম ঠিক তার ত্রি-মাত্রিক অস্তিত্বের মতই মর্মগত।

---

১ ডায়ালেকটিকস অব নেচার, ৩৮পৃঃ।

গণিত ও তত্ত্বগত পদার্থ বিজ্ঞান প্রায়ই "বহুমাত্রিক দেশ" অর্থাৎ বহু, এমনকি অসীম মাত্রাযুক্ত দেশের প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে। এই প্রত্যয়টি কি দেশের ত্রি-মাত্রিক প্রত্যয়ের বিরোধী নয় ? না, তা নয়। ত্রি-মাত্রিক-দেশ বস্তুসত্তাবিশিষ্ট প্রকৃত দেশ, যার মধ্যে সমস্ত বস্তুদেহ বিরাজমান। "বহুমাত্রিক দেশ" বিজ্ঞানে ব্যবহৃত একটি বিমূর্ত প্রত্যয়, এটা বড় ও ছোট পরিমাণের সকল বস্তুর বিস্তৃতি অনুধাবন করার জন্যেই নয়, তাদের রং ইত্যাদি অন্যান্য ধর্মকে বোঝার জন্যেও ব্যবহৃত হয়। এই সমষ্টিগুলোকেই বলা হচ্ছে "দেশসমূহ", কারণ তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে—যা আকারের দিক থেকে প্রকৃত ত্রি মাত্রিক দেশের মধ্যে অবস্থিত মূল জিনিসগুলোর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, তাদের সাদৃশ্য রয়েছে সেই দেশের সঙ্গে যার উপর জ্যামিতির বহু প্রতিজ্ঞা আমরা প্রয়োগ করতে পারি এবং সেগুলোকে আরও গভীরভাবে অনুশীলন করতে পারি।

বহুমাত্রিক দেশসমূহের বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়টিকে কয়েকজন ভাববাদী দার্শনিক ব্যবহার করছেন। তাঁরা বস্তুদেহের দেশহীন স্থিতির সম্ভাবনা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা এই ধারণা পোষণ করেন যে মানুষ ও সাধারণ বস্তুদেহ ত্রি-মাত্রিক আয়তনে থাকে আর বিদেহী, অপার্থিবসত্তা অথবা আত্মা এমন দেশে অবস্থান করে যা সাধারণ জীবের অগম্য। তাই এই যুক্তি অনুসারে সেইসব 'অপার্থিব শক্তি' বাস্তব প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে এবং আমাদের প্রত্যক্ষগোচর না হয়েও সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু "বহুমাত্রিক দেশসমূহে"র প্রত্যয়টিকে এইভাবে ব্যবহার করে বস্তুবাদকে উৎখাত করবার চেষ্টার বাস্তবে কোনও ভিত্তি নেই।

কাল দেশের মত নয়, এক মাত্রিক। এর অর্থ হল এই যে কালের মধ্যেকার যে কোন মুহূর্ত নির্ধারিত হয় হিসেব শুরু করার সময় থেকে বয়ে এসেছে এমন একটি মধ্যবর্তী সময় প্রকাশক সংখ্যার দ্বারা। সমস্ত ঘটনার গতিই একমুখী, অতীত থেকে বর্তমানে এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে। প্রক্রিয়ার এই ধারা বস্তুগত, এটা কোনো নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তির চেতনার উপর নির্ভর করে না। দেশের মধ্যে কেউ ডান থেকে বাঁয়ে বা বাঁয়ে থেকে ডাইনে, উপর থেকে নীচে বস্তুদেহগুলোকে ঘোরাতে পারে কিন্তু যে-সমস্ত প্রক্রিয়া কার্য-কারণ সম্পর্কে বাধা সেগুলোকে আমরা কালের বিপরীতমুখী করতে পারি না, আমরা সেগুলোকে ভবিষ্যৎ থেকে জোর করে ফেরাতে পারি না। সময় বিপরীতমুখী করা যায় না আর এইখানেই দেশ থেকে এর পার্থক্য।

আজকাল সহজবোধ্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলো "চারমাত্রিক জগতের" ধারণাটিকে ব্যবহার করছে। এই প্রত্যয়টিও "বহুমাত্রিক দেশের" মতই ভাববাদী সিদ্ধান্তের ভিত্তি তৈরি করে না। পদার্থ বিজ্ঞানে "চারমাত্রিক" কথাটা বোঝায় যে জগৎ শুধুমাত্র ত্রি-মাত্রিক দেশেই থাকে না, একমাত্রিক

কালেও থাকে এবং যখন কোন সত্যিকারের প্রক্রিয়ার কথা বিবেচনা করা হয় তখন মনে রাখতে হবে বস্তুর অবস্থানের উভয় রূপকেই, যার মাত্রা যোগ করলে দাঁড়াবে চারে। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানীদের "চারমাত্রিক জগৎ" প্রত্যয়টির মধ্যে তাই রহস্যময় ব্যাপার কিছু নেই।

দেশ ও কাল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় নয়। বিজ্ঞান জগতের দেশ ও কাল সম্পর্কিত কাঠামোর আরও গভীর অনুসন্ধান চালাচ্ছে এবং বস্তুর আরও নতুন দৈশিক ও কালগত ধর্ম আবিষ্কার করে চলেছে। কিন্তু দেশ ও কাল সম্পর্কিত ধারণার সংশোধনকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। লেনিন জোর দিয়ে বলেছিলেন আমাদের মনে রাখতে "সেই অপরিবর্তনীয় তথ্যটি যে, মানুষ ও প্রকৃতি কেবল দেশ ও কালের মধ্যেই বিরাজমান। দেশ ও কাল-বহির্ভূত সত্তাগুলো পুরোহিতদের কল্পনা এবং ভাগ্যহত, নিপীড়িত ও অজ্ঞ মানুষদের বিশ্বাস। এগুলো আবোলতাবোল আকাশকুসুম, দার্শনিক ভাববাদের কলাকৌশল এবং পচনশীল সমাজব্যবস্থার বিকৃত সৃষ্টি।"[১]

দেশ ও কাল বস্তু-স্থিতির রূপ—এই প্রতিজ্ঞাটি শুধুমাত্র তাদের বিষয়গত বাহ্য সত্তারই পরিচয় দেয় না, তা এটাও দেখিয়ে দেয় যে ওগুলো গতিশীল বস্তুর সঙ্গে অচ্ছেদ্য। **যেমন দেশ ও কালের বাইরে বস্তু নেই তেমনি বস্তুর বাইরে কোন দেশ বা কাল নেই বা থাকতে পারে না।**

দেশ ও কাল আছে শুধু বাস্তব পদার্থের মধ্যে, বাস্তব পদার্থের মাধ্যমে এবং কেবল তাদেরই জন্যে। এঙ্গেলস দেখিয়ে দিয়েছেন "বস্তুর অবস্থানের দ্বৈত রূপ স্বাভাবিকভাবেই বস্তুকে বাদ দিয়ে কিছুই নয়, শূন্যগর্ভ প্রত্যয়, একটা বিমূর্তন যা কেবল মনের মধ্যেই থাকে।"[২] কেউ যদি দেশ ও কালকে বস্তু থেকে পৃথক করে এবং জোর করে বলে যে ওগুলো বস্তু ছাড়াই আছে, তাহলে সে অস্তিত্বহীনতার উপরে একটা স্বাধীন অস্তিত্ব আরোপ করবে যা কেবল আমাদের চেতনার মধ্যেই আছে। কিন্তু এর অর্থ হল ভাববাদের অবস্থানকে অবলম্বন করা, যে-মত অনুসারে আমাদের চিন্তার ফলাফলকে স্বাধীন সারসত্তা-যুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়। সেইজন্যে লেনিন বলেছিলেন "পার্থিব বস্তুর বাইরে কাল-ঈশ্বর।"[৩]

দেশ, কাল ও বস্তু অবিচ্ছেদ্য—এই সূত্রটি ডায়ালেকটিক বস্তুবাদকে আধিবিদ্যক বস্তুবাদ থেকে মূলগতভাবে পৃথক করেছে। আধিবিদ্যক বস্তুবাদ দেশ ও কালের বাহ্য সত্তা স্বীকার করে ও মনে করে যে এগুলোর বস্তুনিরপেক্ষ সার-সত্তা রয়েছে এবং এগুলো হল বস্তুদেহ ও প্রক্রিয়ার শূন্য আধার। জার্মান গণিতজ্ঞ হেরম্যান ওয়েল ব্যাপারটাকে এইভাবে প্রকাশ করেছেন, "এটা যেন

১ ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ১৪শ খণ্ড, ১৮৫ পৃ.
২ এঙ্গেলস, ডায়ালেকটিকস অব নেচার, ৩১২ পৃঃ
৩ ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ৭০ পৃঃ

ভাড়াটে কামরা" যা যে-কোন ভাড়াটে দখল করতে পারে আর যদি কাউকে না পাওয়া যায় তবে খালি পড়ে থাকবে।

এই ধরনের একটি মত পোষণ করতেন সাবেকী বলবিদ্যার প্রবর্তক নিউটন। তিনি মনে করতেন দেশ ও কালের গতিশীল বস্তুনিরপেক্ষ, অপরিবর্তনীয় ও পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন সত্তা আছে। তিনি ওগুলোকে বলতেন "নিরপেক্ষ"। "নিরপেক্ষ দেশ ও কাল" সম্পর্কে নিউটনের ধারণা বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত মানা হত।

যখন আপেক্ষিকতার তত্ত্বের কল্যাণে বৈজ্ঞানিকরা অবশেষে বুঝলেন যে গতিশীল বস্তুর থেকে দেশ ও কালকে পৃথক করা ঠিক নয় তখন এটা বর্জিত হয়।

অ-ইউক্লিদীয় জ্যামিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রুশীয় গণিতজ্ঞ নিকোলাই লোবাচেভস্কি গতিশীল বস্তু, দেশ ও কালের সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়টির ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে অনেক কিছু করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে দেশের ধর্ম সর্বত্র সমান নয় বরং বস্তুর ধর্ম অনুসারে ও বস্তুদেহের ভৌত প্রক্রিয়ার দ্বারা ঐ ধর্ম পরিবর্তিত হয়।

বাস্তব পরিবেশের পরিবর্তনে দেশের রূপ, বস্তুর প্রসার এবং জ্যামিতিক নিয়মের চরিত্র বদলায়।

প্রাচীন গ্রীসের ইউক্লিদের আবিষ্কৃত জ্যামিতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি জ্যামিতি লোবাচেভস্কি আবিষ্কার করেছিলেন। এই জ্যামিতির একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে একটি ত্রিভুজের কোণগুলোর যোগফল সর্বদাই ১৮০ ডিগ্রি থাকে না বরং পার্শ্বের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলায় এবং সর্বদাই এই যোগফল ১৮০ ডিগ্রির কম। বার্ণহার্ড রেইম্যান পরে আর একটি অ-ইউক্লিদীয় জ্যামিতি সৃষ্টি করেন, যাতে ত্রিভুজের কোণগুলোর যোগফল হল ১৮০ ডিগ্রির বেশি।

অ-ইউক্লিদীয় জ্যামিতির সৃষ্টি দেশ ও বস্তুর মধ্যে গভীর সম্পর্ককে প্রকাশ করল এবং বস্তু-ধর্মের পরিবর্তন দেশ-ধর্মের পরিবর্তন ঘটায়, এই তথ্য দেশ সম্বন্ধে ভাববাদী মতের উপর আঘাত হানল। ইউক্লিদীয় জ্যামিতি শতাব্দীর পর শতাব্দী অপরিবর্তিত ছিল, এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে কাণ্ট দেশকে কার্যকারণ সম্বন্ধীয় চিন্তার ফল বলে মনে করেন এবং যে পদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তি ঘটনাগুলির বিন্যাসের মধ্যে শৃংখলা বিধান করেন। কাণ্ট বিশ্বাস করতেন যে জ্যামিতি অপরিবর্তনীয় এই কারণে যে দেশের অস্তিত্ব ব্যক্তির চেতনায় এবং এই অস্তিত্ব বাইরের পরিবর্তনশীল ঘটনাবলীর অংশ নয়। এখন এটা বোঝা গেল যে ইউক্লিদীয় জ্যামিতিই একমাত্র জ্যামিতি নয় এবং দেশের মধ্যেকার বস্তুগত অবস্থার উপর নির্ভর করে জ্যামিতির সম্পূর্ণ পৃথক নিয়ম হতে পারে।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান লোবাচেভস্কির ধারণাকে আরও গভীর করেছে এবং এগিয়ে নিয়ে গেছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব দেশ, কাল ও গতিশীল বস্তুর মধ্যে খুবই সাধারণ নতুন সম্পর্ক দেখাল এবং এই সম্পর্ক গুলোকে গাণিতিক অর্থে ও নির্দিষ্ট নিয়মে প্রকাশ করল। গতিশীল বস্তুর সঙ্গে দেশ কাল সম্পর্কের অন্যতম প্রকাশ যে ঘটনায়, যা আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রথম লক্ষ্য করল তা হল এই যে যুগপৎ ঘটনা নিরপেক্ষ নয়, সাপেক্ষ। একটি বাস্তব ব্যবস্থার নিরিখে যে-ঘটনা যুগপৎ অর্থাৎ গতির একটি বিশেষ অবস্থায় থাকে তা অন্য বাস্তব প্রক্রিয়ার নিরিখে অর্থাৎ গতির অন্য অবস্থায় যুগপৎ নয়।

এই বুনিয়াদী তথ্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞাতে নিয়ে যায়। বাস্তব সংস্থিতির মধ্যে বিষয়গুলোর দূরত্ব সংস্থিতির গতিবেগের উপর নির্ভর করে বলে দেখা গেল। গতিবেগের বৃদ্ধি দূরত্বের (দৈর্ঘ্যের) হ্রাস ঘটায়। একইভাবে, ঘটনাবলীর মধ্যেকার মধ্যবর্তী সময় বিভিন্ন বাস্তব সংস্থিতির মধ্যে পৃথক পৃথক হয়। এটা হ্রাস পায় গতিবেগের বৃদ্ধিতে। দেশের প্রসারণের (দৈর্ঘ্যের) মধ্যে এবং মধ্যবর্তী সময়ের গতিবেগ-নির্ভর পরিবর্তন অন্যটির সঙ্গে কঠোরভাবে মিল রেখে চলে এবং এইভাবেই দেশ ও কালের একটি স্বাভাবিক সম্পর্ককে দেখিয়ে দেয়।

সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে মহাকর্ষক্ষেত্রের গবেষণা গতিশীল বস্তুর উপর দেশ-কালের নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে আরও গভীর আবিষ্কারে নিয়ে গেছে। এটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে দেশের প্রকৃত ধর্ম ইউক্লিদীয় জ্যামিতির প্রদর্শিত ধর্ম অপেক্ষা পৃথক, যেমন দেশের মধ্যে বস্তুদেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহাকর্ষ ক্ষেত্রের শক্তিও বৃদ্ধি পায়। পদার্থবিজ্ঞানে এই পার্থক্যকে "দেশের বক্রতা" বলে জানা আছে। তাই দেশের বক্রতা নির্ধারিত হচ্ছে বস্তু-ভরের আকৃতি, বণ্টন ও গতি এবং মহাকর্ষ ক্ষেত্রের ঘনত্বের দ্বারা। মহাকর্ষ ক্ষেত্রে যে-কোন পরিবর্তন শুধু দেশের ধর্মেরই পরিবর্তন ঘটায় না, কালের ধর্মেরও পরিবর্তন ঘটায়। মহাকর্ষ ক্ষেত্র কালের গতিপথ ও তার পরিবর্তন ঘটায়। বস্তুর ভর যত বেশি, যত শক্তিশালী হয় মহাকর্ষ ক্ষেত্র, কাল ততই ধীরে প্রবাহিত হবে। উপরন্তু দেশ ও কাল একে অন্যের চেয়ে স্বাধীনভাবে বদলায় না, পরিবর্তিত হয় সম্পর্ক-যুক্ত হয়ে, নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে।

আপেক্ষিকতাবাদের আবিষ্কৃত—বস্তুর সঙ্গে দেশ ও কালের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বস্তুর গতি, দেশ ও কালের বস্তুগত সত্তার কর্তা ও জ্ঞাতার চৈতন্য-নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে নতুন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ উপস্থিত করেছে। বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত দেশ ও কাল এবংএর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই সিদ্ধান্ত আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম বুনিয়াদী ধারণা হয়ে উঠেছে।

এই সব সম্পর্ককে অগ্রাহ্য করে আমরা আলোর কাছাকাছি গতিবেগযুক্ত

ভৌত প্রক্রিয়াগুলোকে অথবা বিপুল পরিমাণ তেজসম্পন্ন প্রবাহধারাকে বুঝতে পারব না। জৈব-বিজ্ঞানের তথ্যগুলোও দেখিয়ে দিচ্ছে যে দেশ ও কালের ধর্ম বস্তুর উপর নির্ভরশীল। দৈশিক জৈব পদার্থের উপর গবেষণা থেকে প্রতিপন্ন হচ্ছে যে এর একটা বিশেষ ধরনের দেশগত সুষমা রয়েছে, যা অজৈব প্রকৃতি-দেহের স্বভাবজাত নয়।

বিকাশের গতিপথে বস্তু নিজের বিশেষ নিয়মে নতুন নতুন রূপ সৃষ্টি করে, সেই অনুসারে নতুন দেশগত ও কালগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। **তাই দেশ ও কাল, খোদ বস্তুর মতন স্থিতির বিশ্বজনীন মহা-নিয়ম- বিকাশের নিয়মকে মেনে চলে।**

দেশ ও কালের মধ্যে **অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য** রয়েছে। এই বৈপরীত্য এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে যে উভয়েই একই সঙ্গে **অন্য-নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ**। দেশ ও কাল বস্তুর অস্তিত্বের বিশ্বজনীন বস্তুগত রূপ হিসেবে অন্য-নিরপেক্ষ, যার বাইরে কোন বস্তুদেহ থাকতে পারে না। আবার এরা আপেক্ষিক কারণ তাদের ধর্মগুলো নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, পরিবর্তনশীল বস্তুর ধর্মের দ্বারা। আরও বৈপরীত্য এইখানে যে দেশ ও কাল **অসীম ও সসীমের** ঐক্যের প্রতিভু। দেশের অসীমতা পৃথক পৃথক বস্তুসত্তার সীমিত মাত্রার দ্বারা সীমাবদ্ধ আর সময়ের অনন্ততা গড়ে উঠেছে পৃথক পৃথক বাস্তব প্রক্রিয়ার স্থিতিকালের দ্বারা। দেশ ও কাল একই সঙ্গে **নিরবচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন** (বিযুক্ত)। দেশ এই মর্মে নিরবচ্ছিন্ন যে ইচ্ছেমত নির্বাচিত যে-কোন দুটি দেশগত বস্তুর (ছোট, বড়, কাছে বা দূরে) মধ্যে বাস্তবে সব সময়ই এমন একটা জিনিস অবশ্যই থাকবে বা, উভয় বস্তুকেই একটি দৈশিক মাত্রায় যুক্ত করে বা অন্যভাবে বললে বলা যায় যে দেশগত মাত্রায় বস্তুগুলোর মধ্যে কোন চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতা নেই। ওরা একে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ঠিক একই ভাবে, কাল অবিচ্ছিন্ন এই অর্থে যে এর দুটি বিরামকালের মধ্যে সর্বদাই একটা কালগত স্থিতিকাল থাকবে যা দুটি বিরামকালকে একটা নিরবচ্ছিন্ন কালপ্রবাহে যুক্ত করে। দেশ-কালের বিচ্ছিন্নতা এইখানেই যে, এগুলো গড়ে ওঠে এদের অভ্যন্তরীণ ধর্ম ও গঠনের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জিনিসগুলো দিয়ে বাস্তব পদার্থ ও সেইগুলোর প্রক্রিয়ার গুণগত পার্থক্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।

আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ, সুক্ষ্মাণু জগতে অনুবীক্ষণের দর্শনীয় দৈর্ঘ্যের কম দৈর্ঘ্যে, সাময়িক স্থিতিকালের ক্ষণিক বিরাম মুহূর্তে প্রবেশের ফলে দেশ ও কালের এমন সব বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হচ্ছে, যা বৃহদাকারের মাপে ধরা পড়ে নি। আমরা এখন দেশ ও কালের নতুন ধর্ম, তাদের কোয়াণ্টা, তাদের সুষমার নতুন রূপ, তাদের তথ্যগত আয়তনে পরিবর্তন (ইনফরমেশনাল ভল্যুম) ইত্যাদির মুখোমুখি হচ্ছি। এ সমস্তই প্রমাণ করে লেনিন বস্তুর যে-অক্ষয়ত্বের সূত্র বিকশিত করেছিলেন তা আরও গভীরভাবে শুধু জড় পদার্থের ভৌত ধর্ম

ও অভ্যন্তরীণ গঠনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, সেটা যে-দেশকাল সম্পর্কের ভিত্তিতে এই কাঠামো গড়ে ওঠে সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অন্য কথায়, বস্তুর মতই দেশ ও কাল অফুরন্ত।

৪. জগতের ঐক্য

সুদূরে অতীতে এই ধারণাটি গড়ে উঠেছিল এবং ধর্মের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল যে প্রতিটি মানুষের জানা এই বাস্তব জগৎ ছাড়া 'আত্মা'দের বাসস্থান, 'পরম কারণ,' 'পরম অভীপ্সা' প্রভৃতির এক অপার্থিব জগৎ রয়েছে।

ধাপে ধাপে বিজ্ঞান এই দুই জগতের ধারণাকে খণ্ডন করেছে। জগৎ এক। প্রকৃত বাস্তব জগৎ যার সঙ্গে আমরা আমাদের অনুভূতি, সংবেদন, ধারণা ও চেতনা নিয়ে জড়িয়ে আছি সেইটাই হল অস্তিত্ববান একমাত্র জগৎ।

অতীতের কিছু দার্শনিক, যাঁরা নিজেদের বস্তুবাদী বলতেন এবং অন্য জগতের অস্তিত্বের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করতেন তাঁরা জগতের ঐক্যকে প্রমাণ করার জন্যে জোরালোভাবে এই কথাটি বলতেন যে, আমরা এই জগৎকে এক বলেই মনে করি অথবা একটি একক জগৎ হিসেবে এর অস্তিত্ব রয়েছে। এই অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন ইউজেন ডুরিং; তাঁর মতবাদকে এঙ্গেলস সমালোচনা করেছিলেন *এ্যান্টি ড্যুরিং* বইটিতে। এঙ্গেলস দেখিয়েছিলেন যে দুটো যুক্তিই ভ্রান্ত।

আমরা এক বলে ভাবি বলেই যদি জগৎ এক হয়, তাহলে আমাদের চিন্তাই জগতের নিয়ামক শক্তি। কিন্তু জগৎ চিন্তার ধর্মগুলোকে প্রতিবিম্বিত করে না বরং চিন্তাই জগতের ধর্মগুলোকে প্রতিবিম্বিত করে। এঙ্গেলস বলেছিলেন আমাদের চিন্তা জুতোর ব্রাস ও স্তনাপায়ী প্রাণীকে 'ঐক্যে'র মধ্যে আনতে পারে কিন্তু তা জুতোর ব্রাসকে স্তনগ্রন্থী দিতে পারে না। একইভাবে, জগতের অস্তিত্ব আছে এবং তাই এর মধ্যে ঐক্য আছে, এই বক্তব্য থেকে এটা আসে না কারণ অস্তিত্বের (সত্তা) প্রত্যয়টিকে ভাববাদী বা বস্তুবাদী যে কোন ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যে-কোন জিনিসই আমাদের চিন্তার মধ্যে থাকুক না কেন (যথা অপর একটি জগতের অস্তিত্বের ধারণা) তাকে আছে বলে স্বীকৃতি দিতে পারা যায়, চৈতন্য নিরপেক্ষ স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী কিছু হবার দরকার থাকে না। তাই কেবলমাত্র জগতের অস্তিত্বের স্বীকৃতি থেকেই জাগতিক ঐক্যের সঠিক ধারণা আসে না।

এঙ্গেলস জোর দিয়ে বলেছেন "অস্তিত্বেই জগতের ঐক্য নয়, যদিও সেটা তার ঐক্যের পূর্বশর্ত, যেটা তাকে এক হবার আগে হতেই হবে···জগতের প্রকৃত ঐক্য নিহিত আছে এর বস্তুসত্তায় এবং এটা কতকগুলি জগাখিচুড়ি বুকনি দিয়ে

প্রমাণিত হয় না, হয় দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য বিকাশের দ্বারা।"[১]

কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের আবিষ্কার জগতের বাস্তব ঐক্যের স্বরূপের পথে একটা বিরাট পদক্ষেপ। কোপার্নিকাসের আগে প্রচলিত ধারণা ছিল যে, বিশ্বের কেন্দ্রে আছে পৃথিবী যার চার পাশে স্বর্গীয় মণ্ডলে স্থান পেয়েছে "আদর্শ স্বর্গীয় জগৎ"—সূর্য, গ্রহরাজি, চন্দ্র ও তারকা প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী। এদের পূর্ণতা প্রতিভাত হয় তাদের সম্পূর্ণ গোলাকার ও নিখুঁতভাবে মসৃণ উপরিভাগের মধ্যে। তাই এটা বিশ্বাস করা হতো যে পৃথিবীর উপরে সবকিছুই পরিবর্তনশীল ও ক্ষয়িষ্ণু আর স্বর্গীয় জগতে সব কিছুই চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ এইসব ধারণাকে উড়িয়ে দিল এইটি প্রমাণ করে যে, বিশ্বের কেন্দ্রে পৃথিবী নেই বরং এটা অন্যতম গ্রহমাত্র এবং যাকে আদর্শ স্বর্গীয়মণ্ডল মনে করা হতো এটা তারই অন্তর্গত।

তাই "পার্থিব জগতের" সঙ্গে "স্বর্গীয় জগতের" বিরোধিতার কোন যুক্তিই ছিল না।

কোপার্নিকাস যে-কাজ আরম্ভ করেছিলেন তা এগিয়ে নিয়ে গেলেন গ্যালিলিও এবং জিওর্দানো ব্রুনো। যখন গ্যালিলিও প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি আবিষ্কার করে নভোমণ্ডলের দিকে লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি এমন একটি আবিষ্কার করলেন যা তাঁর সমসাময়িকদের হতবুদ্ধি করেছিল। যে চাঁদের আকারকে মনে করা হ'ত নিখুঁত স্বর্গীয় জ্যোতিষ্ক, সেটা মোটেই সম্পূর্ণ গোলাকার নয়। পৃথিবীতে যেমন বিরাট বিরাট গর্ত, উপত্যকা ও পর্বতরাজি দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি এটাও সেইগুলোর দ্বারা একইরকমভাবে পরিপূর্ণ। গ্যালিলিও সূর্যপৃষ্ঠে বড় বড় অসম কালো কালো দাগও আবিষ্কার করেছিলেন। ব্রুনো যুক্তি দিলেন যে অসীম বিশ্বে, যেখানে শাস্ত্রকাররা মনে করেন নিখুঁত স্বর্গীয় মণ্ডল আছে সেখানে আসলে আমাদের জগতের মতোই অতি বিশাল বস্তু-জগৎ ছড়িয়ে রয়েছে।

বলবিদ্যা ও সর্বব্যাপী মহাকর্ষের নিয়মগুলোর আবিষ্কার এই সত্যের সমর্থনে নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ আনল। দুটি পৃথক জগতের অস্তিত্বের পক্ষ সমর্থনকারীরা মনে করতেন পার্থিব ও স্বর্গীয় বস্তুদেহ মূলতঃ পৃথক নিয়ম মেনে চলে। এই নিয়মগুলো এক ধরনের বা একই, এইরকম ধারণাকে মনে করা হত ঈশ্বর নিন্দার সামিল। নিউটনের বিরাট বৈজ্ঞানিক সাফল্য প্রমাণ করল যে পার্থিব ও মহাকাশীয় বস্তুদেহ একই নিয়ম মেনে চলে, প্রকৃতির একই শক্তি অবলম্বনহীন সমস্ত জিনিসকেই ভূমিতে পাতিত করে, চাঁদকে পৃথিবীর

১. এ্যান্টি ড্যুরিং, এঙ্গেলস, ৫৮ পৃ.।

চারিদিকে, পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহকে সূর্যের চারদিকে ঘোরায়। এইভাবে দেখান হলো যে, অসীম বিশ্বের প্রত্যেকটি জিনিস মূলতঃ এক বাস্তব মিথস্ক্রিয়ার দ্বারা যুক্ত; এই ক্রিয়া পার্থিব ও মহাকাশীয় জগতের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না।

বর্ণালী বিশ্লেষণ—উতপ্ত গ্যাসীয় পদার্থ থেকে যে-আলোক বিকিরিত হয়, তার প্রকৃতি পরীক্ষা করে বস্তুর রাসায়নিক প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ—দুই জগতের অস্তিত্বের ধারণার অবসান ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি রাসায়নিক পদার্থের নিজস্ব এক গুচ্ছ রেখা আছে (বর্ণালী)। বর্ণালী বিশ্লেষণ থেকে এটা প্রমাণিত হল যে, মহাকাশীয় পদার্থের রাসায়নিক উপাদান প্রধানত পৃথিবীর মতই। এইসব গবেষণার ফলে বিশ্বের বস্তুগত ঐক্যের মৌল প্রত্যয়টি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে।

এমনকি যদি বিজ্ঞানীরা কোনো মহাকাশীয় ক্ষেত্রে এমন একটা পদার্থ আবিষ্কার করতেন যা পার্থিব পরিবেশে থাকতে পারে না, তাতেও একথা বোঝাত না যে জগতের বস্তুগত ঐক্য ধ্বংস হয়ে গেল। ব্যাপারটা এই নয় যে সমস্ত নক্ষত্রে বা নীহারিকাতে একই ধরনের রাসায়নিক পদার্থ থাকবে, বিষয়টি হল সমস্ত পদার্থ, তারা বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকুক বা না থাকুক, তারা সর্বদাই কোন না কোন ধরনের বস্তুরই রূপ, তারা একই রকমের মৌলিক ধর্ম-বিশিষ্ট এবং তারা একই বস্তুগত প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে।

একই ধরনের মৌলকণা দ্বারা গঠিত (প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন) রাসায়নিক অণুগুলোর পরমাণু হল এক ধরনের বস্তুগত সংস্থিতি এবং তাদের কাঠামোও একই ধরনের। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল (ক) অপেক্ষাকৃত ভারী মৌলকণা দিয়ে গঠিত একটি কেন্দ্র এবং সেই জন্যে পরমাণুর ভরের বেশির ভাগটাই বহন করে (খ) অপেক্ষাকৃত হাল্কা মৌলকণা দ্বারা গঠিত স্তরবিন্যস্ত আবরণ (গ) কেন্দ্রক ও আবরণের মধ্যে বিপরীত আধানযুক্ত বিদ্যুতের অবস্থান। এইভাবে রাসায়নিক অণুর পরমাণুগুলো গঠনে ও কাঠামো-বিন্যাসে ঐক্যবদ্ধ। তাদের পার্থক্যটা আকস্মিক সহঅবস্থানকারী বস্তুগুলোর জোট নয় বরং অভ্যন্তরীণ দিক থেকে সম্পর্কিত বস্তুগুলোর একটা সমগ্রতা। এই সমগ্রতা প্রকাশ পাচ্ছে বিশেষ করে পিরিয়ডিক সিস্টেমে (নিয়মিত ব্যবধানের পৌনঃপুনিক ব্যবস্থা) ও মেণ্ডেলিয়েভ আবিষ্কৃত সাধারণ পৌনঃপুনিক নিয়মে।

পার্থিব জগৎ ও স্বর্গীয় জগতের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে ধর্ম-তাত্ত্বিকেরা এই অভিমত পোষণ করতেন যে পৃথিবীর সব জিনিসই পরিবর্তনশীল এবং আগেই হোক বা পরেই হোক তারা অন্তিম দশায় উপনীত হবে, আর স্বর্গে সবকিছু অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত। কিন্তু মহাকাশীয় জগতের চিরন্তনতা ও অপরিবর্তনশীলতা কোথায়? বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে মহাকাশীয় জগৎ—যাকে আমরা সৌরজগৎ বলে জানি, তা চিরকাল আজকের মত ছিল না। এবং তার

নিজস্ব ইতিহাস আছে। নক্ষত্ররাজিও অপরিবর্তনশীল নয়। গোটা নক্ষত্র-জগৎ আবির্ভূত হচ্ছে ও বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তার মধ্যে গতি ও পরিবর্তন স্বাভাবিক এবং এমন কোন বিশেষ জগৎ নেই যা এ নিয়ম মেনে চলে না। যেখানে বস্তুর কোনও বিশেষ একটা রূপের বিলয় ঘটছে, সেখানে স্বীয় ইতিহাস নিয়ে বস্তুর নতুন রূপের উদ্ভব অনিবার্য।

এমনকি বস্তুর কোনও ক্ষুদ্রতম কণাও শূন্য থেকে উদ্ভব হয় না অথবা নিশ্চিহ্নও হয় না; বস্তু কেবলমাত্র রূপান্তরিত হয় এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায়, কিন্তু তখনই তার মূল চরিত্র হারায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যদি বিশেষ ভরসহ কোন জড়বস্তু অন্তর্হিত হয় তবে এক বা একাধিক অন্য জড়বস্তু আবির্ভূত হবেই—যাদের ভরের সমষ্টি অন্তর্হিত বস্তুর ভরের সমান। পরমাণুর রূপান্তর-প্রক্রিয়ার সমগ্র বৈদ্যুতিক আধান থাকে অপরিবর্তিত। এটা এবং প্রকৃতির অনুরূপ অন্যান্য নিয়মটি বস্তুর চিরন্তনত্বকে দেখিয়ে দিচ্ছে।

বস্তু এবং তার গতি অবিনশ্বর ও অনাদি (সৃষ্টি করা যায় না)। এটা প্রকাশ পায় শক্তির নিত্যতা ও রূপান্তরের নিয়মের মধ্যে। এই নিয়মটি জগতের বস্তুগত ঐক্যের সমর্থনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, এই নিয়মের কল্যাণেই, "এক অপার্থিব স্রষ্টার শেষ চিহ্নটি মুছে গিয়েছে।"[১] একটি জড় পদার্থ, এমনকি ক্ষুদ্রতম পদার্থও, অন্য কোন জড় পদার্থের প্রকৃত প্রভাব ছাড়া গতিশীল হতে পারে না। তারা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে নিজস্ব গতিকে এগুলোর মধ্যে সঞ্চারিত করে। এই নিয়মের কল্যাণে সমস্ত ব্যবস্থা একটি শৃঙ্খলা-পরম্পরা সৃষ্টি করে, যার মধ্যে এমন কিছু থাকে না বা থাকতে পারে না যা বস্তুর দ্বারা সৃষ্ট নয়।

প্রকৃতির ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে অথবা সমাজের কোথাও এমন কোন ক্রিয়া নেই বা থাকতে পারে না যা কোন রহস্যময় "অপার্থিব জগতের" থেকে আসে বা তার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়। প্রত্যেক জিনিসের প্রাকৃতিক কারণ আছে যা কতকগুলো জড় বস্তুর মধ্যে, তাদের ক্রিয়ার মধ্যে এবং ধর্মের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞান নিজস্বভাবে কোন অতীন্দ্রিয় বা অতিপ্রাকৃত অনুমান বাদ দিয়ে বস্তু-জগৎকে ব্যাখ্যা করে।

এমন একদিন ছিল যখন মানুষ প্রাণ-প্রক্রিয়ার মর্ম কিছুই বুঝত না। জৈবদেহের বৈশিষ্ট্য অজৈব প্রকৃতি থেকে এতই পৃথক ধরনের যে, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এই মত পোষণ করতেন যে জীবনের ভিত্তি হল অ-জড় "জৈবপ্রাণশক্তি", যা জীবন প্রক্রিয়ার সঞ্চালক। যেমন, অজৈব পদার্থের জৈব পদার্থে রূপান্তর, যা প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে ঘটতে দেখা যায়। সেগুলোকে

---

১. এফ. এঙ্গেলস, এ্যান্টি ডুহ্রিং ১৮-১৯ পৃঃ।

ভাববাদীরা ঘোষণা করলেন এই "জৈবপ্রাণশক্তি"র ক্রিয়ার ফল বলে। কিন্তু বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে জীবনের সার হল বস্তুগত বিপাক প্রক্রিয়া। এটা এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে ক্রিয়াশীল এবং প্রকৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ভর ও শক্তির নিত্যতার নিয়ম এখানেও অনুসৃত হয়।

এমন একদিন ছিল যখন কেউ জানত না কী করে মানুষের উদ্ভব হয়েছে। এতেই গড়ে উঠল এই ধারণা যে, কোন অপার্থিব শক্তির অলৌকিক ক্রিয়ার বলে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল এই সমস্যাটিরও বৈজ্ঞানিক সমাধান হল এমনভাবে যাতে অ-জড়শক্তি ও রহস্যময় অতিপ্রাকৃত জগতের ধারণা বাতিল হয়ে গেল। সার চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ এর ভিত্তি তৈরী করল এবং সমস্যার সমাধান করল মার্কসবাদ। মার্কসবাদ প্রতিপন্ন করল পশুজগৎ থেকে মানুষ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে শ্রমের ভূমিকাকে।

চেতনার বিষয়টি অন্যান্য সমস্ত প্রাকৃতিক বিষয় থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ভাববাদীরা এই পার্থক্যকে ব্যবহার করে বাস্তব জগতের ঐক্যকে অলীক বলে ঘোষণা করে। কিন্তু পরের অধ্যায়ে আমরা দেখবো যদিও এটা আসলে পদার্থ নয় তবু এটা বিশেষ ধরনে সংগঠিত বস্তুরই ধর্ম, এরই সৃষ্টি এবং এটা বস্তু ছাড়া থাকতেও পারে না। চেতনার এই বিষয়টি জড়-জগতের বাইরে অথবা ঊর্ধ্বে একটি বিশেষ জগৎ হিসেবে বা জড়-জগৎ-নিরপেক্ষভাবে থাকতেই পারে না। তাই বাস্তব জগতের ঐক্যকে তারা ধ্বংস করে না। সেগুলো কেবলমাত্র দেখিয়ে দেয় গতিশীল এবং অসংখ্য গুণ ও ধর্ম-সহ কত বিচিত্র এবং জটিল এই ঐক্য।

মানবের সমাজজীবন, এর ইতিহাস, মানুষের ক্রিয়াকলাপ এবং সামাজিক প্রক্রিয়াকে প্রায়ই "দৈবী অভীপ্সার" আদেশানুসারী অথবা বাস্তবতার ঊর্ধ্বে এবং এর নিয়ন্ত্রণকারী কোন মহৎ ভাবের কর্মফল বলে ঘোষণা করা হয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সমাজের বাস্তব নিয়ম ও তার বিকাশের বাস্তব কারণগুলোকে উদ্ঘাটন করে এই ধরনের মতবাদের ভ্রান্তি প্রমাণ করেছে।

বস্তুর বিভিন্ন গুণগত রূপ এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ গতির রূপের মধ্যে সার্বিক সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা জগতের ঐক্যকে প্রমাণ করার জন্যে একান্ত প্রয়োজন। বস্তুর বিভিন্ন রূপের এবং নানা ধরনের গতির মধ্যেকার এইসব সম্পর্ক আগেও ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। জগতের কোথাও কোনদিন এমন কিছু জিনিস ছিল না বা থাকবেও না যা গতিশীল বস্তু নয় অথবা বস্তু থেকে জন্মায় নি। এইখানেই এর ঐক্য।

জগৎ বস্তুগত। এটা ঐক্যসূত্রে বাঁধা, শাশ্বত ও অসীম। মানুষ নিজেই এর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, যে বিশাল সমগ্রতাকে আমরা প্রকৃতি বলি মানুষ তার অংশ।

চতুর্থ অধ্যায়

চেতনা— উন্নত ধরনে সংগঠিত বস্তুর ধর্ম

মানুষ চেতনা ও মনের বিস্ময়কর সম্পদের অধিকারী। তার সামর্থ্য রয়েছে সেই সুদূরে অতীতে ফিরে যাবার বা ভবিষ্যতের মধ্যে অনুসন্ধানের। তার রয়েছে একটা স্বপ্ন ও কল্পনার জগৎ—সেই পারে অজানার গভীরে ডুব দিতে। চেতনা কী? কি করে এর উৎপত্তি এবং এর বৈশিষ্ট্য কি? এ একটা কঠিন বৈজ্ঞানিক সমস্যা।

১ চেতনা: মানব মস্তিষ্কের ক্রিয়া

বহু আগে থেকেই মানুষ চেতনার প্রহেলিকা সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করেছিল। বহু শতাব্দী ধরে মানব জাতির মহান চিন্তনায়কগণ চেতনার প্রকৃতিকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন, এই প্রশ্ন নিয়ে লড়াই করছেন যে, কেমন করে আপন বিকাশের কোনো এক স্তরে অজৈব থেকে জৈব বস্তু সৃষ্টি হয় এবং কী করে জৈব বস্তু চেতনার জন্ম দেয়।

চেতনার গঠন কী রকমের, এর কাজই বা কী? সংবেদন থেকে প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষ থেকে চিন্তায় উত্তরণের পদ্ধতি কী? মস্তিষ্কের বহিরাবণের মধ্যে যে বাস্তব দৈহিক প্রবাহধারা চলেছে তার সঙ্গে চেতনার সম্পর্ক কী? এইটি ও এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সমস্যাগুলো তাদের জটিলতার জন্যে বহুদিন ধরে নির্দিষ্ট বস্তুগত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। এটাই ছিল অন্যতম কারণ যার জন্যে নানা ধরনের ভাববাদী ও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা দিয়ে চেতনার সমস্যাটিকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছিল।

ধর্মীয় ভাববাদী মতানুসারে চেতনা অ-জড় কোন জিনিসের—"আত্মার" প্রকাশ, যাকে মনে করা হয় অমর, চিরন্তন, বস্তু ও বিশেষভাবে মস্তিষ্ক-নিরপেক্ষ এবং নিজস্ব প্রাণসম্পন্ন।

অপার্থিব প্রাণ-স্রষ্টা ও জ্ঞানের মূল হিসেবে "আত্মার" ধারণা বহু প্রাচীন কালে গড়ে উঠেছিল। স্বপ্ন, জ্ঞান হারানো, মৃত্যু এবং নানা ধরনের জ্ঞান ও ভাবাবেগ সংক্রান্ত এবং ইচ্ছার প্রক্রিয়াগুলোর স্বাভাবিক কারণ ব্যাখ্যা করতে না পেরে প্রাচীনেরা এই সমস্যা সম্বন্ধে একটা বিকৃত ধারণায় পৌঁছেছিলেন। যেমন স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করা হল এইভাবে যেন ঘুমের সময় "আত্মা" দেহ ছেড়ে গিয়ে বহু জায়গায় ঘুরে বেড়ায়।

মৃত্যুকে ধারণা করা হল এক ধরনের নিদ্রা বলে, যখন কোন কারণে "আত্মা" দেহ ছেড়ে গিয়ে অজ্ঞাত কারণে ছেড়ে-যাওয়া দেহে ফিরে আসতে পারল না। এইসব সহজ সরল কাল্পনিক ধারণাগুলোকে আরও বিকশিত করা হল এবং বিভিন্ন ভাববাদী দর্শনের মধ্যে এগুলো তত্ত্বগতভাবে সমর্থিত হতে লাগল ও সংহত আকার ধারণ করল। যে-কোন ভাববাদী মতবাদ কোন না কোনভাবে চেতনাকে (যুক্তি, ধারণা, চিৎশক্তি) বস্তুনিরপেক্ষ, অতিপ্রাকৃত সারসত্তা বলে ঘোষণা করতে বাধ্য; আর শুধু বস্তুনিরপেক্ষই নয় অধিকন্তু সমগ্র জগতের স্রষ্টা এবং জগতে গতি বিকাশের নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবেও চেতনাকে দাঁড় করায়।

এইসব নানা রকমের ভাববাদী বিশ্বাসের বিপরীতে বস্তুবাদ সর্বদাই অগ্রসর হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে এই তথ্য থেকে যে চেতনা হল **মানব মস্তিষ্কের ক্রিয়া যার সারমর্ম হল বাস্তবতাকে প্রতিবিম্বিত করা।** সেই সঙ্গে চেতনার সমস্যাটি বস্তুবাদী দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানীর কাছেও সুকঠিন বলে প্রতিভাত হয়েছে। কিছু বস্তুবাদী, চেতনার উৎপত্তির সমস্যাটিতে বাধা পেয়ে একে বস্তুর একটি ধর্ম—চিরন্তন ধর্ম, উচ্চতর বা নিম্নতর সকল রূপের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক বলে মনে করেছেন। তাঁরা সমস্ত বস্তুকে প্রাণময় বলে ঘোষণা করেছেন। এই বিশ্বাসকে "হাইলোজোইম" বলা হয় (গ্রীক ভাষায় **হাইলি** অর্থ বস্তু জো অর্থ প্রাণ)।

ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ এই তথ্য থেকে অগ্রসর হয় যে চেতনা সকল বস্তুরই ধর্ম নয় বরং **উন্নত ধরনে সংগঠিত বস্তুর ধর্ম।** চেতনা মানব মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফল। মার্কসবাদের স্রষ্টারা জোর দিয়ে বলেছেন যে চেতনা অস্তিত্বের সচেতন উপলব্ধি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং মানুষের অস্তিত্ব হল তাদের জীবনধারার বাস্তব প্রক্রিয়া।

চেতনার ডায়ালেকটিক প্রত্যয়টি প্রতিবিম্ব সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কে বাহ্যজগতের বিষয়বস্তুর সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, প্রতিরূপ গঠন এবং প্রত্যয় গঠনের আকারে মানসিক প্রতিরূপ নির্মাণ। মানব-মস্তিষ্কে চেতনার আধেয় চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় বাস্তব পরিবেশ আর তার অন্তর্নিহিত ভিত্তি বা বাহনের দ্বারা। তাহলে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে মস্তিষ্ক এবং দেহযন্ত্রের দেওয়া বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগকারী পথ ছাড়া কোন আত্মিক জীবন হ'তে পারে না। অভিব্যক্তির ধারায় জীবেরা বাহ্যপ্রভাবগুলোকে প্রতিবিম্বিত করতে পেরেছিল কেবল তখনই, যখন তাদের একটি স্নায়ুতন্ত্র বিকশিত হয়। জীবন ধারণের পরিবর্তনশীল প্রভাবে জীবের মানস প্রক্রিয়ার উন্নতি ছিল তাদের মস্তিষ্ক বিকাশের সঙ্গে জড়িত। মানুষের চেতনা উন্মেষিত হয়েছিল এবং বিকশিত হচ্ছে বিশেষ ধরনের মানব মস্তিষ্কের উদ্ভব ও বিকাশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আওতায়। তাই এই মস্তিষ্ক হচ্ছে বাস্তবতার মানসিক প্রতিবিম্বের উচ্চতম রূপ হিসেবে উপলব্ধ, চেতনার অঙ্গ।

মানব মস্তিষ্ক বহুসংখ্যক স্নায়ুকোষ দ্বারা গঠিত খুবই সংবেদনশীল স্নায়ুযন্ত্র। এই স্নায়ুকোষের সম্ভাব্য সংখ্যা হল ১৫,০০০ মিলিয়নের (একশত পঞ্চাশ কোটির) মত। এইসব কোষের একটি আর একটির সঙ্গে এবং সবগুলো একত্রে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোর প্রান্তের সঙ্গে গড়ে তোলে খুব জটিল ও অগণিত সম্পর্কযুক্ত জালের মত বিন্যাস।

মানব মস্তিষ্কের গঠনবিন্যাস জটিল স্তরভেদযুক্ত। বাহ্য প্রভাবের সরলতম বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ এবং আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিচের অংশ—মেরুদণ্ড, মেডুলা অবলংগাটা (সুষুম্না শীর্ষক), মধ্য মস্তিষ্ক এবং ডায়েনসিফালন আর জটিল রূপগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে উপরের অংশ, সর্বোপরি গুরু মস্তিষ্ক। জ্ঞানেন্দ্রিয়ে বাইরের শক্তির ক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট উত্তেজনা স্নায়ু-তন্তুর পথে গুরু মস্তিষ্কের বাহ্যাবরণের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন অংশে পৌঁছয়। মস্তিষ্কের বহিরাবরণের নিচেকার অঙ্গগুলি বংশগতি-চালিত খুব জটিল ধরনের ক্রিয়াকলাপ চালানোর যন্ত্র অর্থাৎ জন্মগত বা সহজাত ক্রিয়া। নিম্নস্তরের মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মস্তিষ্কের এই অংশ স্বাধীনভাবে কাজ চালায় যা উচ্চ-স্তরের মেরুদণ্ডী স্তন্যপায়ীদের ও বিশেষত মানুষের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা হারাবারদিকে ঝোঁকে।

জীব ও পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক দেহযন্ত্রাংশের বিভিন্ন ভাগের এবং দেহযন্ত্রগুলোর নিজেদের মধ্যেকার ক্রিয়াপ্রক্রিয়া সংঘটিত হয় পরাবর্তের সাহায্যে, যেটা সংবেদন যন্ত্রের উত্তেজনা থেকে উদ্ভূত দেহযন্ত্রের প্রতিক্রিয়া। এটা সংঘটিত হয় কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সহযোগিতায়। পরাবর্তগুলির শ্রেণীবিন্যাস করা হয় দুটি মূল বিভাগে—নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ। নিরপেক্ষ পরাবর্তগুলি জন্মগত, বাইরের পরিবেশের প্রভাবের প্রতি জীবদেহের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া প্রতিক্রিয়া। সাপেক্ষ পরাবর্তগুলি জীবনধারার ক্রিয়াকলাপ থেকে অর্জিত দেহযন্ত্রের প্রতিক্রিয়া। এগুলির চরিত্র নির্ভর করে মানুষ বা প্রাণীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর। মস্তিষ্কের পরাবর্ত-ক্রিয়ার তত্ত্ব অনেক দেশের বিজ্ঞানীরা বিকশিত করেছেন। উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন রুশ-বিজ্ঞানী সেনফ্, পাভলভ, ফ্ভেদেনেস্কি, উখতোমস্কি এবং ওরবেলি। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বস্তুবাদী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং এই ধারণার থেকে অগ্রসর হয়েছিলেন যে দেহতন্ত্র ও মননতন্ত্রের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য ঐক্য আছে। চেতনার শারীরবৃত্তীয় কলাকৌশল এবং সাধারণভাবে মানসিক ক্রিয়ার উপর গবেষণা সোভিয়েত বিজ্ঞানী আনোখিনের উপস্থাপিত ধারণা (ঐক্যবদ্ধ-ভাবে কার্য সম্পাদনের উপযোগী ব্যবস্থা হিসেবে মস্তিষ্কের সমন্বয়ী ক্রিয়াকলাপ এবং বাস্তবতার পূর্বাভাসদায়ক প্রতিবিম্বের শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে) এবং বার্নস্টাইনের মানসিক ক্রিয়াপ্রবাহে কাজের লক্ষ্য নির্ধারণ-সংক্রান্ত ধারণা-গুলির দ্বারা উপকৃত হয়েছে।

মস্তিষ্ক একটি অসাধারণ জটিল কর্ম-পরিচালন ব্যবস্থা। এর ক্রিয়াকলাপ সঠিকভাবে বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই যুক্ত করতে হবে পৃথক পৃথক স্নায়ুকোষগুলির সম্বন্ধে অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যের সঙ্গে ব্যক্তির বাহ্য আচরণ সংক্রান্ত গবেষণাকে। মস্তিষ্কের মধ্যেকার শারীরক্রিয়া-প্রবাহের বাইরে কোন অনুভূতি, সংবেদন ও প্রেরণা সৃষ্টি হতে পারে না।

মানবমস্তিষ্ক যে চিন্তার অঙ্গ এ ধারণা গড়ে উঠেছিল বহু প্রাচীনকালে এবং আজকাল সাধারণভাবে বিজ্ঞানে এটা গৃহীত হয়েছে। এমনকি আধুনিক কালেও কিছু ভাববাদী দার্শনিক, চেতনা যে মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া—এই বক্তব্যের বিরোধিতা করছেন।

বাহ্য প্রভাব জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পেঁছনোর ফলে চেতনা সৃষ্টি হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো হল "যন্ত্রপাতি" যা প্রতিবিম্বিত করে এবং বাহ্য পরিবেশ বা খোদ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির মধ্যে কোন পরিবর্তনের খবর প্রত্যঙ্গগুলোতে পেঁছে দেয়। সেইজন্যে এগুলোকে বাহ্য অঙ্গ এবং অন্তঃস্থ অঙ্গ এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো হল দৃশ্যবোধ, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও ত্বকের সংবেদনশীলতা। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো থেকে যে সমস্ত সংকেত মস্তিষ্কে পেঁছয় তা জিনিসের গুণ, তাদের যোগাযোগ ও সম্পর্কের খবর বয়ে নিয়ে যায়। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো এবং তাদের অনুরূপ স্নায়ু-ব্যবস্থাকে পাভলভ একত্রে নাম দিয়েছেন "বিশ্লেষক"। বাইরের প্রভাবের বিশ্লেষণ শুরু হয় "বিশ্লেষকের" বহির্ভাগে—গ্রাহকের স্তরে (স্নায়ুর প্রান্ত ভাগে), যেখানে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর প্রভাব বিস্তারকারী অগণিত ধরনের শক্তির মধ্যে থেকে বিশেষ ধরনের শক্তিকে বেছে নেওয়া হয়। সর্বোচ্চ ও সুনিপুণ বিশ্লেষণটি লাভ হয় কেবলমাত্র গুরু মস্তিষ্কের বহিরাবরণের (কর্টেক্স) সাহাযো। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোর উদ্দীপনা শুধুমাত্র সংবেদন সৃষ্টি করে, চেতনার তথ্যে (ফ্যাক্ট) পরিণত হয় যখন এটা পেঁছয় মস্তিষ্কে। গুরু মস্তিষ্কের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াই প্রতিবিম্বিত মানসিক ক্রিয়া এবা চেতনার অপরিহার্য বাস্তব যন্ত্র।

২ চেতনা—বস্তু-জগতের মানসিক প্রতিবিম্বনের উচ্চতম রূপ

মস্তিষ্কের মধ্যে চেতনা ও শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্কের পরীক্ষা কোনরকমেই চেতনার সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে না। মানসিক ঘটনাবলীর শারীরবৃত্তীয় যন্ত্র মনোভাব ও মনের মর্মবস্তুর সঙ্গে অভিন্ন নয়, ওগুলো হলো বাস্তব প্রতিবিম্বের আত্মগত, মানসিক প্রতিরূপ।

ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ স্থূল বস্তুবাদের প্রবক্তাদের (সি, ভগ্ট, এল, বাখনার জে, মলেস্ট্ ও অন্যান্য) চেতনার সারমর্ম ব্যাখ্যার বিরোধী। তাঁরা চেতনাকে

তার ভিত্তির (মস্তিষ্কের মধ্যেকার স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া প্রবাহ) সঙ্গে এক করে ফেলেছেন। কার্ল ভগ্‌ট লিখেছেন, "প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য যে সমস্ত সামর্থ্য যাকে বলা হয় মনন ক্রিয়া, বাস্তবে তা কেবলমাত্র গুরুমস্তিষ্কের আবরণীর ভেতরের পদার্থের গতি বা এটাকে আর একটু সোজাসুজিভাবে বললে বলা যায় যে যকৃতের সঙ্গে পিত্তের যে সম্পর্ক, গুরুমস্তিষ্কের আবরণীর সঙ্গেও মননের সম্পর্ক তেমনি।"[১] এই অর্থেই ভগ্‌ট চেতনাকে বাস্তব বলে মনে করেছেন।

চেতনাকে বস্তুর সঙ্গে অভিন্ন করে দেখাটা বিরাট ভুল। স্থূলবস্তুবাদী জোসেফ ডাইজেন ধরে নিয়েছিলেন "চেতনা—টেবিল, আলো ও শব্দ থেকে ততটা তফাৎ নয়, যতটা ওগুলো একটি অপরটির থেকে তফাৎ।" তাঁর ভুলের সমালোচনায় লেনিন লিখলেন, "এটা স্পষ্টতই ভুল। চিন্তা ও বস্তু যে 'প্রকৃত' অর্থাৎ অস্তিত্ব আছে, সেটা সত্য কিন্তু চিন্তা হল বস্তু—একথা বলা একটা ভুল পদক্ষেপ, বস্তুবাদ ও ভাববাদকে গুলিয়ে ফেলার দিকে পদক্ষেপ।"[২]

দেহ-মন সমান্তরালবাদটিও কম ভ্রান্ত নয়। এই তত্ত্ব অনুসারে মানসিক ও বস্তুগত শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলো সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ভিন্ন মর্মবিশিষ্ট; এদের মধ্যে রয়েছে বিরাট ফারাক। এই প্রত্যয়ের প্রবক্তাদের মধ্যে কয়েকজন ধরে নিয়েছেন যে আমরা যে দৈহিক ও মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য দেখতে পাই, তা ঈশ্বর-নির্দেশিত।

চেতনা বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিশেষ মর্ম নয়। তা সত্ত্বেও মানব মস্তিষ্কে সৃষ্ট বস্তুর প্রতিরূপকে খোদ বস্তুতে পর্যবসিত করা যায় না। এই বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে কর্তা, জ্ঞাতা অথবা মস্তিষ্কের মধ্যে যে শারীরক্রিয়া প্রবাহ চলে এবং প্রতিরূপ সৃষ্টি হয়, তাদের বাইরে। চিন্তা ও চেতনার একটা বাস্তবতা আছে। কিন্তু এটা কোন বাহ্যসত্তাবিশিষ্ট নয়; এটা এমন একটা কিছু যা আত্মগত, মানসিক।

চেতনা হল **বস্তু জগতের আত্মগত প্রতিরূপ**। যখন আমরা আত্মগত প্রতিরূপের কথা বলি তখন আমাদের মনে এই বিষয়টি থাকে যে এটা বাস্তবের বিকৃত চিত্র নয়, এটা এমন একটা কিছু যা ধারণাগত অর্থাৎ যেমন কার্ল মার্কস লক্ষ্য করেছিলেন যে, এটা এমন ধরনের বাস্তব যা ব্যক্তির মস্তিষ্কের মধ্যে রূপান্তরিত ও পুনর্নির্মিত হয়েছে। মানুষের চেতনার মধ্যেকার একটি জিনিস হল একটা ভাবমূর্তি এবং প্রকৃত জিনিসটি হল তার আদিরূপ।

১. কার্ল ভগ্‌ট সাইকোলজিশে ব্রীফে, ফার জেবিলদেতে এলার ষ্টাণ্ডে। গিয়েসসেন ১৮৭৪ এস ৩২৪।

২. ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ১৪শ খণ্ড. ২৪৪ পৃঃ।

লেনিন লিখেছিলেন "বস্তুবাদী ও ভাববাদী দর্শনের সমর্থকদের মধ্যে মৌল পার্থক্য এই বিষয়টি নিয়ে যে, বস্তুবাদীগণ সংবেদন, প্রত্যক্ষ ধারণা এবং সাধারণভাবে মানুষের মনকে বস্তুসত্তার প্রতিরূপ বলে গণ্য করেন। আমাদের চেতনার দ্বারা প্রতিবিম্বিত বস্তুসত্তার গতিই হল জগৎ। ধারণা, প্রত্যক্ষ প্রভৃতির গতির অপর দিকে রয়েছে আমার বাইরে তাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বস্তুর গতি।"[১]

চেতনার উদ্ভব, ক্রিয়াকলাপ ও বিকাশ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রয়েছে কোন বিষয় বা ঘটনা সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানলাভের সঙ্গে। মার্কস লিখেছেন "যে ধরনে চেতনা আছে এবং যেভাবে এর কাছে কোন একটা জিনিস আছে এরই নাম জানা......কোন কিছু তাই চেতনার জন্যে রয়েছে ততটাই, যতটা চেতনা সেই কিছুকে জানে।"[২] বস্তু জগতের প্রতি মানুষের জ্ঞানার্জনের মনোভাব না থাকলে চেতনা অসম্ভব হত। তাই, যখন আমরা চেতনার কথা বলি, তখন আমরা প্রধানত এর মনোজাগতিক ক্রিয়া, ভাবগত বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হই, যা কিনা বাস্তব পদার্থ থেকে গুণগতভাবে পৃথক। জ্ঞানার্জন পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতিবিম্বমুখী চেতনার একটি ক্রিয়া।

মানুষের সকল মানসিক ক্রিয়াই সচেতন নয়। চিৎশক্তি—মনের ধারণাটি চেতনার চেয়ে ব্যাপকার্থক। জন্তুদের মানসিকতা আছে কিন্তু চেতনা নেই। শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে চেতনা আসার আগেই মানসিক ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে ও নানারকম অলীক স্বপ্ন দেখে, এগুলো তখন মানসিক ঘটনাবলী, কিন্তু এগুলো চেতনা নয়। এমনকি ভ্রমণরত অবস্থায়ও মানুষের সমস্ত মানসিক ক্রিয়াপ্রবাহ চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হয় না। যখন একজন রাস্তা দিয়ে হাঁটে এবং কোন কিছু সম্বন্ধে ভাবে, সে খানিকটা বা সম্পূর্ণ অচেতনভাবে, সমগ্র চলমান ঘটনাবলী দেখতে থাকে এবং যে-কোনরকমে মানুষ ও যানবাহনের ভিড়ে প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তা খুঁজে নেয়। অনুরূপভাবে মানুষ বাঁচার তাগিদেই শুধু সচেতন ধরনের আচরণই করে না; অধিকন্তু অচেতন ধরনের আচরণও করে—যা তাকে অপ্রয়োজনে সচেতন থাকার হাত থেকে রেহাই দেয়। অচেতন ধরনের আচরণ গড়ে ওঠে বস্তুর সম্পর্ক ও ধর্ম সম্বন্ধে তথ্যকে গোপনে সঞ্চিত রাখার উপর। নির্জ্ঞানের প্রসার বহুদূর বিস্তৃত। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে সংবেদন, প্রত্যক্ষ, ভাবমূর্তিনির্মাণ (প্রতিরূপ)। এগুলো চেতনার রশ্মিপাত এবং অনুভূতি, নৈপুণ্য, স্বজ্ঞা ও নির্দিষ্ট ঝোঁকেরও বাইরে ঘটে।

১ ভি. আই. লেনিন, কম্প্লেক্টেড ওয়ার্কস, ১৪শ খণ্ড, ২৬৭ পৃ:।

২ কার্ল মার্কস—ইকনমিক এণ্ড ফিলসফিক ম্যানাসক্রিপ্ট অব ১৮৪৪, মস্কো, ১৯৬১ ১৫৯ পৃঃ।

নির্জ্ঞানের সমস্যাটি সর্বদাই বস্তুবাদী ও ভাববাদীদের মধ্যে একটা তীব্র বিতর্কের বিষয় হয়েছে। নির্জ্ঞান সম্বন্ধে বহুল প্রচারিত একটি বুর্জোয়া তত্ত্ব হল অস্ট্রিয়ার মনোবিদ সিগমণ্ড ফ্রয়েডের। ফ্রয়েড নির্জ্ঞানতার বহু দিক নিয়ে গবেষণা করেছিলেন এবং মানসিক রোগে এর স্থান ও ভূমিকা প্রকাশ করেছিলেন এবং এর কতকগুলি বিশৃংখলা দূর করার জন্যে নির্জ্ঞানতাকে প্রভাবিত করার পদ্ধতি বের করেছিলেন। কিন্তু ফ্রয়েড ভুলভাবে মনে করতেন যে চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে নির্জ্ঞান। একে তিনি মনে করতেন উচ্চতম মাত্রার উদ্দীপিত অনুভূতিমূলক উম্মাদনা। ফ্রয়েডের মতে ব্যক্তিত্বের গঠন, এর আচরণ, চরিত্র এবং সমস্ত মানব সংস্কৃতি শেষ পর্যন্ত মানুষের জন্মগত আবেগ, তাদের অনুভূতি এবং উদ্যোগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—যার মূলে রয়েছে যৌন প্রবৃত্তি।

মার্কসবাদ মানুষের মনোজগতের জৈব উপাদানকে অত্যন্ত বাড়িয়ে দেখার এই অযৌক্তিক ধারণাকে স্বীকার করে না। মার্কসবাদ এটা জোরের সঙ্গে বলে যে মানব আচরণে নির্দেশক নীতি হল যুক্তি ও চেতনা। জীবজন্তুর বিপরীতে স্বাভাবিক মানুষ পরিচালিত হয় সচেতন মানসিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা।

চেতনা জ্ঞান আহরণকারী ও আবেগ-ইচ্ছা ইত্যাদি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নানারকন উপাদানের এক অখণ্ড ধারা।

প্রাথমিক সংবেদনগত প্রতিরূপই সংবেদন যা কিনা চেতনার একেবারে গোড়ার কথা। সংবেদনের সাহায্যে জ্ঞাতা বস্তুসত্তার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর বস্তুর তাৎক্ষণিক ক্রিয়ার কালে বিষয়বস্তুর স্বতন্ত্র ধর্মগুলোর প্রতিবিম্বই সংবেদন। সংবেদনের প্রধান উপাদান হিসেবে গুণের প্রতিবিম্বকে পৃথক করে লেনিন লিখেছিলেন "আমাদের কাছে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে পরিচিত হল সংবেদন এবং এর মধ্যে অপরিহার্যভাবেই রয়েছে গুণ।"[১]

কোন ব্যক্তির সংবেদন আপেক্ষিকভাবে প্রকৃত জগতের সঠিক প্রতিবিম্ব হাজির করে। চেতনা এবং জগতের মধ্যে সরাসরি সংযোগের উপায় হিসেবে সংবেদন শেষ পর্যন্ত বস্তু ও ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের উৎস। লেনিন সংবেদনকে বাহ্য উত্তেজনা শক্তির চেতনার তথ্যে রূপান্তর বলে চিহ্নিত করে ছিলেন। বুঝতে পারার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলা অনিবার্যভাবেই চেতনার বিলুপ্তি ঘটায়।

সংবেদন বস্তুর পৃথক পৃথক গুণকে প্রতিবিম্বিত করে আর ইন্দ্রিয়গতভাবে পুনর্নির্মিত ধর্মগুলির ঐক্যের মধ্যে গোটা বস্তুকে প্রতিফলিত করে প্রত্যক্ষণ।

১ ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ১৮শ খণ্ড, ৩১৯ পৃঃ।

কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষণ সাধারণত বস্তুটি, তার ধর্মগুলো এবং সম্পর্কগুলোকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করে তোলে। এই কারণেই প্রত্যক্ষণের প্রকৃতি ব্যক্তির জ্ঞানের মাত্রার ও তার স্বার্থের উপর নির্ভরশীল।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিবিম্ব কেবল সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। উন্নততর ইন্দ্রিয়গত প্রতিবিম্বনের রূপ হল **প্রতিরূপ**। এটা হল অতীতে প্রত্যক্ষ করা বস্তুর কল্পিত জ্ঞান যা এই মুহূর্তে আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর কাজ করছে না। প্রতিরূপ গঠন বা ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে বাহ্য প্রভাবের প্রত্যক্ষণ ও স্মৃতিতে সেগুলো সঞ্চিত থাকার ফলে।

যে প্রতিরূপগুলোর সহায়তায় মানুষের চেতনা কাজ করে, তা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের প্রতিরূপ গঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। মানুষ সৃষ্টিশীলভাবে কোনো কিছুর সমন্বয় ঘটাতে পারে এবং তার চেতনায় আপেক্ষিক স্বাধীনতা দিয়ে নতুন ভাবমূর্তি সৃষ্টির উচ্চতর রূপ হল **উৎপাদনশীল** ও **সৃজনী কল্পনা**।

বিষয়ের তাৎক্ষণিক প্রভাব থেকে এর আপেক্ষিক স্বাধীনতা এবং ইন্দ্রিয়গত সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণকে একটি বোধগম্য প্রতিরূপে সামান্যীকরণের কারণে প্রতিরূপ গঠন প্রতিবিম্ব প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এটা সংবেদন থেকে তত্ত্বগত চিন্তার মধ্যেকার পার্থক্যকে স্বীকার করে কিন্তু একটিকে অপরটির থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে না। প্রতিরূপ গঠন ও চিন্তার আন্তঃসম্পর্কের ডায়ালেকটিকসকে চিহ্নিত করে লেনিন লিখেছিলেন, "ইন্দ্রিয়জ প্রতিরূপ গঠন কি চিন্তার চেয়ে বাস্তবের বেশী কাছাকাছি? হাঁ ও না দুটোই। ইন্দ্রিয়জাত প্রতিরূপ গঠন গতির সমগ্রতাকে উপলব্ধি করতে পারে না; যেমন এ পারে না প্রতি সেকেন্ডে ৩০০,০০০ কিলোমিটার গতিবেগ উপলব্ধি করতে কিন্তু চিন্তা তা করতে পারে এবং অবশ্যই করবে।"[১]

তত্ত্বগত চিন্তাশক্তি বস্তুর মর্মগত ও নিয়মানুগ সম্পর্কের প্রতিবিম্ব। এটা **প্রত্যয়, সিদ্ধান্ত** ও **অনুমানের** আকারে প্রকাশ পায়।

জগতের যে দিকগুলি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের নিকট অগম্য তা চিন্তার কাছে উন্মুক্ত। দর্শন, স্পর্শন ও শ্রুতি ইত্যাদির ভিত্তিতে আমাদের চিন্তা-শক্তির কল্যাণে আমরা অদৃশ্য, স্পর্শাতীত ও শ্রবণাতীত বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে সমর্থ। বিষয়ের গভীরে অন্তর্নিহিত গুণ, যোগাযোগ ও সম্পর্কের জ্ঞান আমরা চিন্তার সাহায্যেই পাই। চিন্তার দ্বারাই বস্তু ও ঘটনাবলীর বাইরে থেকে ভেতরে, প্রাতিভাসিক থেকে মর্মে আমরা ডায়ালেকটিক পরিবর্তন ঘটাই। যদিও এটা প্রতিবিম্ব-ক্রিয়ার উচ্চতর রূপ কিন্তু চিন্তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্তরেও বর্তমান থাকে। কোন ব্যক্তি যখনই কোনো কিছু অনুভব বা প্রত্যক্ষ করে,

১. ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ২২৮ পৃঃ।

সে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের ফলাফল উপলব্ধি করার জন্যে চিন্তা করতে থাকে।

জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়া বা তার পরিণতি জ্ঞানই শুধু চেতনা নয়, এটা যার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হল তার আবেগ-সঞ্জাত অভিজ্ঞতা—বস্তু, গুণ এবং তাদের সম্পর্কের একটা বিশেষ মূল্যায়নও বটে। অনুভূতিও চেতনার সঙ্গে যুক্ত। আবেগ-সিঞ্চিত অভিজ্ঞতা আমাদের শক্তি, উৎসাহ যোগায় আবার নিরুৎসাহ করে—তাকে ছাড়া জগৎ সম্বন্ধে কোনও মনোভাব গ্রহণ করা অসম্ভব। "মানুষের আবেগকে বাদ দিয়ে সত্যের সন্ধান কোনদিন হয় নি, হতেও পারে না।"[১]

মানুষের আচরণ ও চেতনার প্রধান উৎস হ'ল প্রয়োজন—বাহ্য জগতের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা, বস্তুগত জগতের কাছে ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা, যেসব জিনিস ও পরিবেশ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, তার আত্মপ্রতিষ্ঠা ও বিকাশের জন্যে একান্ত প্রয়োজন। লেনিন উল্লেখ করেছিলেন যে, চেতনা বলতে বোঝায় প্রতিরূপ এবং আকাঙ্ক্ষার রূপগত প্রতিবিম্ব।

বাস্তবতার প্রতিবিম্ব হিসেবে প্রতিরূপ (Image) নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তির বিশেষ লক্ষণ, তার স্বকীয় আন্তর জগতের বাইরে থাকতে পারে না।

চেতনার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আত্মসচেতনতা। জীবনের তাগিদে মানুষের শুধু বাইরের জগতকেই জানলে চলবে না, তার নিজেকেও জানতে হবে। বাস্তবতাকে প্রতিবিম্বিত করতে গিয়ে মানুষ শুধু এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধেই সচেতন হয় না, চিন্তা ও অনুভূতিশীল জীব হিসেবে নিজের আদর্শ, স্বার্থ এবং নৈতিক গড়নের সম্পর্কেও সচেতন হয়; সে নিজেকে পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে পৃথক করে এবং জগৎ সম্বন্ধে তার মনোভাব, তার অনুভূতি, চিন্তা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হয়। মানুষের স্বকীয় ব্যক্তি সত্তার উপলব্ধিই আত্মসচেতনতা। আত্মসচেতনতা সমাজ জীবনের প্রভাবে গড়ে ওঠে। আর সমাজ-জীবন চায় মানুষ তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করুক ও তার কাজের দায়িত্ব নিক।

চেতনা শুধু ব্যক্তির মধ্যেই থাকে না, এটা বাস্তবাকৃতি নেয় এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ললিত-কলার সৃষ্টি, আইন ও নৈতিক মান ইত্যাদির মধ্যে একটা অতি-ব্যক্তিক সত্তা লাভ করে। সমাজ-চেতনার এইসব রূপ থেকেই, অপরিহার্যভাবে ব্যক্তি-চেতনা গড়ে ওঠে। প্রত্যেক ব্যক্তির চেতনা সে যে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বাস করে তার জ্ঞান, বিশ্বাস, আস্থা ও মূল্যায়নকে আত্মস্থ করে নেয়।

মানুষ সামাজিক জীব। ইতিহাসের ধারায় গড়ে ওঠা চিন্তার নিয়ম আইন ও নৈতিকতার মান, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদির রুচি তাকে এক বিশেষ ধরনের

[১] ভি, আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ২০শ খণ্ড, ২৬০ পৃঃ।

জীবনযাত্রা, সাংস্কৃতিক মান এবং মনোভাবের প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তোলে। "যদি মানুষ স্বভাবতই সামাজিক হয়ে থাকে তাহলে সে স্বভাবের বিকাশ ঘটাবে কেবলমাত্র সমাজেই এবং তার স্বভাবের ক্ষমতা পৃথক পৃথক ব্যক্তির দ্বারা মাপা যায় না, বরং যায় সমাজের শক্তির দ্বারা।"[১] মানসিক সামর্থ্য ও গুণ সমাজের মধ্যে ব্যক্তির জীবনধারা এবং নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

এমনকি একজন ব্যক্তির নিজের সম্বন্ধে চেতনাও অন্য লোকদের প্রতি তার মনোভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তি-মানুষ শুধুমাত্র সমাজ বিকাশের ধারায় সচেতনতা অর্জন করে, ব্যক্তিত্বের স্তরে উন্নীত হয় এবং সমকালীন চিন্তাধারার ঊর্ধ্বে ওঠে। চেতনার ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যার একটি মৌল সূত্র হল, চেতনা, কর্ম ও প্রয়োগের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সংযোগের স্বীকৃতি।

চেতনা ও বস্তু-জগৎ হল পরস্পরের বিপরীত; এরা একটি ঐক্যসূত্রে বাঁধা। এই ঐক্যের ভিত্তি **প্রয়োগ, মানুষের ইন্দ্রিয়গত বাস্তব ক্রিয়া-কলাপ**; এটা মানুষের শ্রম, শ্রেণীসংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রভৃতির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই ক্রিয়াকলাপগুলোই মানুষের চেতনার মধ্যে বাস্তবতার প্রতিফলনকে অপরিহার্য করে তোলে। যে-চেতনা জগতের সত্যকে প্রতিবিম্বিত করে তার আবশ্যকতা নিহিত রয়েছে সমাজ জীবনের অবস্থা এবং প্রয়োজনের মধ্যেই। যদিও চেতনা মস্তিষ্কের কার্য, তবু মস্তিষ্ক নিজে নিজেই বাস্তবতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে না; ব্যক্তি রূপান্তরশীল কর্মকাণ্ডের কর্তা ও ইতিহাসের স্রষ্টা হিসেবেই সচেতন হয়ে ওঠে। তাই মানব-চেতনার স্বরূপকে অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা, শারীরবিদ্যা এবং মস্তিষ্কের লক্ষণের দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কেবলমাত্র সমাজের মধ্যে, লোকের বাস্তব কাজকর্মের ভিত্তিতেই চেতনার আবির্ভাব, কার্য ও বিকাশকে ব্যাখ্যা করা যায়।

আমাদের প্রভাবিত ক'রে বাস্তব জগৎ চেতনায় প্রতিবিম্বিত হয় এবং ঐ জগতের মানসরূপ গড়ে ওঠে। আবার চেতনা, ঐ মানসরূপ বাস্তব কাজ-কর্মের মাধ্যমে বাস্তব ও প্রকৃত সত্তায় রূপান্তরিত হয়। "মানসরূপ বাস্তবে রূপান্তরিত হয় এই চিন্তাটি অত্যন্ত গভীর, ইতিহাসের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও এটা সুস্পষ্ট যে, এটার মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে।"[২]

চেতনার বৈশিষ্ট্য সূচিত হয় বাহ্যজগতের, নিজের ও মানুষের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি একটা সক্রিয়তার মনোভাবের দ্বারা। চেতনার সক্রিয়তা এইখানেই যে, একজন মানুষ জগৎকে প্রতিবিম্বিত করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে, বাছাই করে।

[১] কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস, দি হোলি ফ্যামিলি, মস্কো, ১৯৫৬, ১৭৬ পৃঃ
[২] ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ১১৪ পৃঃ।

সে তার মস্তিষ্কের মধ্যে বিষয় বা ঘটনাবলীকে পুনর্নির্মাণ করে তা পূর্বায়ত্ত জ্ঞানের চশমা দিয়ে, তার প্রতিরূপ ও প্রত্যয়ের মাধ্যমে। বাস্তবতাকে পুনর্নির্মাণ করা হয় মানব চেতনার মধ্যে দর্পণ প্রতিবিম্বের মত নিশ্চল আকারে নয়, বরং সৃষ্টিশীলভাবে পরিবর্তিত অবস্থায়। চেতনার দ্বারা এমনসব প্রতিরূপ সৃষ্টি হয়, যারা বাস্তবতাকে অনুমান করতে পারে।

মানুষের মস্তিষ্ক এমনভাবে নির্মিত যে, তা শুধু তথ্যগ্রহণ, তথ্য সঞ্চয় ও তথ্য সৃষ্টিই করে না—কাজের পরিকল্পনা রচনা এবং সক্রিয় সৃষ্টিশীল পরিচালনার মাধ্যমে তাকে কার্যে পরিণত করে।

মানুষের কাজ সবসময়েই একটা চূড়ান্ত ফল বা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত। ব্যক্তি-মানুষের যে-কোন তাৎপর্যমূলক কাজ কতকগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানের, কোন উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার দিকে যায়। সমগ্র কার্য-প্রক্রিয়াটির চূড়ান্ত লক্ষ্য ও পরিকল্পনা যতটা পূর্বনির্ধারিত, ঐ প্রক্রিয়ার পরবর্তী স্তরগুলোও সেই পরিমাণে কমবেশি সুসমন্বিত। মানুষের শ্রমক্রিয়া ও জীবজন্তুদের আচরণের মধ্যে পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে মার্কস জোর দিয়ে বলেছেন যে, মানুষ শুধু প্রকৃতির প্রদত্ত রূপগুলোকে পরিবর্তন করে তা নয়, প্রকৃতির দানের মধ্যে সে তার সচেতন লক্ষ্যকেও বাস্তবায়িত করে। সাধারণত এই লক্ষ্য অনুযায়ী তার কাজের পদ্ধতি ও প্রকৃতি নির্ধারিত হয় এবং এই লক্ষ্যের কাছেই সে তার ইচ্ছাকে সমর্পণ করে। মানুষ সেই লক্ষ্য অর্জন করতে চায়—যা তাকে গড়তে হবে, যার এখনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এটা হল আকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের ভাবমূর্তি। মানব-ক্রিয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে দুটি প্রক্রিয়া ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। তাদের মধ্যে একটা হল লক্ষ্য নির্ধারণ অর্থাৎ বিবেচনা, ভবিষ্যতের পূর্বানুমান যা বিষয়গুলোর যথাযথ সম্পর্ক ও যোগাযোগগুলোতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে অগ্রসর হয় এবং অপরটি হল লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী কর্মসূচী ও কাজের পরিকল্পনা।

লক্ষ্য স্থির করা অর্থাৎ মানুষ যে উদ্দেশ্যের জন্যে কাজ করে, তার পূর্বদর্শন হল সচেতন কর্মের প্রয়োজনীয় শর্ত। হেগেল মন্তব্য করেছিলেন, "বিষয়ের সারমর্ম শুধু লক্ষ্যের দ্বারাই নয়, তার রূপায়ণের দ্বারা বিচার করতে হবে…।"[১] লক্ষ্য রূপায়ণের পূর্বশর্ত হল লক্ষ্যের জন্যে যা সৃষ্টি হয়েছে ও যা আছে, সেইসব উপকরণের প্রয়োগ। যদি না সাফল্য লাভের উপায়ের সঙ্গে একে মেলানো যায় তা'হলে লক্ষ্য শুধু একটা শুভ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত উদ্দীপনা, একটা নিষ্ফল বাসনা হয়ে থাকে।

মানুষ চিরকাল যুক্তির সাহায্যে অনুসন্ধান চালাচ্ছে, এবং নানারকম শক্তিশালী ও সুকৌশলী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করছে, গড়ে তুলছে, এবং

১ জি, ডব্লু. এফ হেগেল [illegible], বার্লিন ১৯৬৪, পৃ ৪১

সেগুলোকে তার নানারকম লক্ষ্য পূরণের জন্যে কাজে লাগাচ্ছে। কারিগরি আবিষ্কার তাকে বস্তু ও প্রকৃতির শক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করতে সমর্থ করেছে। এগুলো মানুষের লক্ষ্য পরিপূরণের উপকরণে পরিণত হয়েছে।

মানুষ এমন সব জিনিস সৃষ্টি করে যা তার আগে প্রকৃতি সৃষ্টি করেনি। বস্তুর যে সমস্ত নক্সা, মাপ, রূপ এবং ধর্ম মানুষ রূপান্তরিত বা সৃষ্টি করেছে তা মানুষের প্রয়োজন এবং লক্ষ্যের দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে; সেগুলি মানুষের ধারণা এবং পরিকল্পনার প্রতিমূর্তি। চেতনার আবির্ভাব ও বিকাশের মৌল গুরুত্বপূর্ণ অর্থ এবং ঐতিহাসিক অনিবার্যতা নিহিত রয়েছে পৃথিবীকে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টিশীল ও নিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ডের মধ্যে এবং মানুষ ও সমাজের স্বার্থ রক্ষার প্রয়াসের মধ্যে। মানুষ জ্ঞানের জন্যে জ্ঞানার্জনে আগ্রহান্বিত নয়, বাস্তবতার সঙ্গে নিষ্ক্রিয় খাপখাওয়ানোতেও নয় বরং বাস্তব কাজকর্মের দ্বারা জগতকে পরিবর্তন করতেই আগ্রহী। এক্ষেত্রে জ্ঞান হ'ল একটি অপরিহার্য উপকরণ। এ থেকে এটা বোঝায় না যে মানব মন নিজের মধ্যে থেকেই সৃষ্টি করে। মন নিজের সৃষ্টিশীল কাজকর্মের জন্যে যা আছে, প্রকৃতি-পরিবেশ থেকে যা পাওয়া যায়, তা গ্রহণ করে। বৈজ্ঞানিক ও প্রগতিশীল চেতনার এই সক্রিয় সৃষ্টিশীল, রূপান্তরকারী ভূমিকা যখন লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজকর্মকে পরিচালনা করে তার উল্লেখ করে লেনিন লিখেছিলেন, "মানবচেতনা শুধু বাহ্য জগৎকে প্রতিবিম্বিত করে না অধিকন্তু সৃষ্টিও করে…জগৎ মানুষকে সন্তুষ্ট করে না এবং মানুষ তার কাজের দ্বারা সেটাকে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয়।"[১]

৩ প্রতিবিম্ব রূপের ক্রমবিকাশ

মানব মস্তিষ্কে বাস্তবতাকে প্রতিবিম্বিত করার সামর্থ্য উচ্চমানের সংগঠিত বস্তুর দীর্ঘ বিকাশের ফল।

কয়েকটি দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বে ভুলভাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, জৈবিক পূর্বশর্ত থেকে চেতনার উৎপত্তির সমস্যাটি এই তথ্যের দ্বারাই খণ্ডিত হয় যে একমাত্র মানুষই মনন শক্তির অধিকারী। এই ধারণার সূত্রপাত দেকার্ত-এর সময়ে। তিনি মনে করতেন প্রাণীরা নিছক জটিলযন্ত্র। ঠিক বিপরীত অবস্থানের ব্যক্তিদের ধারণা যে কেবল প্রাণীরাই নয়, সমস্ত প্রকৃতিই জীবন্ত। (জোঁ বাপটিস্টে রবিনেট ও অন্যান্যরা)। এই দুটি সম্পূর্ণ

[১] ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস ৩৮শ খণ্ড, ২১২ পৃ

বিপরীত ধারণার মাঝামাঝি রয়েছে "জৈব-চিৎবাদ" (বায়োসাইকিজম), যার মতে বুদ্ধি, মানসিক ক্রিয়া কেবলমাত্র জীবন্ত বস্তুরই ধর্ম (আর্নস্ট হেইকেল ও অন্যান্যরা)।

ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ সর্বপ্রাণবাদ ও বুদ্ধি কেবলমাত্র মানুষেরই সহজাত এই দুই ধারণাই অস্বীকার করে। "জৈব-চিৎবাদের"অবস্থানের সঙ্গেও এই বস্তুবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ এই তথ্য থেকে অগ্রসর হয় যে, **বাহ্যজগতের মানসিক প্রতিবিম্ব** বস্তুরই ধর্ম। এটা জীবদেহের অতি উন্নত বিকাশের পর্বে স্নায়ুতন্ত্র গঠনের সময় আবির্ভূত হয়।

চেতনার উৎস বিবেচনা করতে গিয়ে লেনিন এই ধারণাকে তুলে ধরেন যে, সংবেদনের সুস্পষ্ট আকার বস্তুর একমাত্র উচ্চতররূপের মধ্যেই সহজাত, পক্ষান্তরে বস্তুর সমগ্র কাঠামোটির ভিত্তি হল সংবেদনের অনুরূপ একটা ক্ষমতা —**বস্তুকে প্রতিবিম্বিত** করার গুণ।

বস্তুর সাধারণ ধর্ম হিসেবে প্রতিবিম্ব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এই ঘটনার দ্বারা যে বিষয় ও ঘটনাবলী সার্বজনীন আন্তঃসম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। একে অপরের উপর ক্রিয়াশীল হয়ে কিছু একটা পরিবর্তন ঘটায়। এই পরিবর্তন "ছাপের" আকারে ক্রিয়াশীল বিষয় ও ঘটনাবলীর বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করে। যেমন কতকগুলো জীবাশ্মের গায়ে প্রাচীন মাছ ও গাছ গাছড়ার ছাপ টিকে থাকে। প্রতিবিম্বের রূপ নির্ভর করে পারস্পরিক ক্রিয়াশীল দেহের নির্দিষ্ট প্রকৃতি এবং কাঠামোগত গঠনের মাত্রার উপর। অপরপক্ষে প্রতিফলকের মধ্যে কী পরিবর্তন হয় এবং ক্রিয়াশীল বিষয় বা ঘটনার কোন দিকগুলিতে তারা সৃষ্টি করে তার মধ্যে দিয়েই প্রতিবিম্বের অন্তর্বস্তু প্রকাশ পায়।

প্রতিবিম্বের পরিণাম (ছাপ) ও প্রতিবিম্বিত (ক্রিয়াশীল) বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে **আইসোমরফিজম** (সমরূপতা) ও হোমিওমরফিজমের (প্রায় সমরূপতা) রূপে প্রকাশ করা যেতে পারে। **আইসোমরফিজমের** (সমরূপতা) অর্থ কতগুলি বিষয়ের বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য, যে ধরনের রূপ ও কাঠামোর সাদৃশ্যে আমরা আলোকচিত্রের মধ্যে দেখতে পাই। একটা **আইসোমর ফাস** (সমরূপী) প্রতিবিম্ব হচ্ছে মূলের খুব কাছাকাছি নকল তোলা। **হোমিওমরফিজম** (প্রায় সমরূপতা) কেবলমাত্র মোটামুটি প্রতিবিম্বন, যেমন একটা মানচিত্রের উপর কোন এলাকার প্রতিবিম্বন।

প্রতিবিম্ব সকল স্তরের বস্তুরই সহজাত কিন্তু প্রতিবিম্বের উচ্চতর রূপ জীবন্ত বস্তু, জীবনের সঙ্গেই যুক্ত।

জীবন কী? জীবন হ'ল বস্তুর একটা বিশেষ জটিল গতির রূপ। এর গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম হল, উত্তেজনা, বৃদ্ধি ও বংশ বিস্তার। এগুলির ভিত্তি পদার্থ বিনিময়, বিপাক ক্রিয়ার উপর। বিপাক ক্রিয়াই জীবনের মর্ম। এটা

কতকগুলো বস্তুগত অধঃস্তরের সঙ্গে জড়িত (পৃথিবীর পরিবেশে প্রোটীন ও নিউক্লিক এসিড)।

জীবন মূলত জীবদেহ ও পরিবেশের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার প্রক্রিয়া। আমাদের এই গ্রহে জীবন অসংখ্য ও বিচিত্র রূপে প্রকাশমান—সরলতম থেকে জটিলতম মানুষ পর্যন্ত। বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে জীবদেহের ক্রমবর্ধমান কাঠামোগত ও ধরনগত আচরণের জটিলতার সঙ্গে যুক্ত হয় অনুরূপ জটিল প্রতিবিম্বের রূপ। বিভিন্ন জীবদেহে এই প্রতিবিম্ব ও রূপ যেভাবে প্রকাশ পায় তা সরাসরি নির্ভর করে তাদের চরিত্র ও আচরণের উপর, তাদের ক্রিয়াকলাপের উপর। জীবদেহের ক্রিয়াকলাপ জটিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় গড়ে ওঠে এবং স্নায়ুতন্ত্র বিকশিত হয়। এই সঙ্গে তাদের সেই ক্রিয়াকলাপ নির্ভর করে প্রতিবিম্বনের নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবের উপর।

সমস্ত জৈব দেহের প্রারম্ভিক ও মৌলিক প্রতিবিম্বের ধরন হল **উত্তেজনা**। এটা প্রকাশ পায় বাহ্য প্রভাবে (আলো, তাপের পরিবর্তন ইত্যাদি) জৈবদেহের নির্বাচিত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। অভিব্যক্তির আরও উচ্চস্তরে প্রাণীদের উত্তেজনা রূপান্তরিত হয় নতুন ধর্মে **সংবেদনশীলতায়** অর্থাৎ সংবেদনের আকারে বিভিন্ন মাত্রায় বস্তুর বিভিন্ন দিককে প্রতিবিম্বিত করার সামর্থ্যে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে প্রতিবিম্ব উন্নত পর্যায়ে পৌঁছায়। এটা একই সঙ্গে সক্রিয় উত্তেজনা ও জটিলতাগুলিকে বিশ্লেষণ করবার এবং পারিস্থিতির প্রত্যক্ষ রূপ ও সুসংহত চিত্রকে প্রতিবিম্বিত করবার সামর্থ্য অর্জন করে। যেমন আগে বলা হয়েছে, সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ হ'ল বস্তুসমূহের প্রতিরূপ। এর অর্থ স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া এবং বাস্তবতার একটি বিশেষ প্রতিবিম্বিত রূপ হিসেবে বুদ্ধিমত্তার প্রাথমিক আবির্ভাব।

সাধারণত প্রাণীদের দুই রকম ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আচরণের মধ্যে পার্থক্য করা হয়ে থাকে—সহজাত, যা জন্মসূত্রে পাওয়া যায় ও ব্যক্তির অর্জিত আচরণ। প্রাণীরা জীববিজ্ঞানের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবেশে বস্তুর ধর্মগুলোকে প্রতিবিম্বিত করতে পারে। (যে সমস্ত ধর্ম তাদের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাতে, বিপদ এড়াতে ইত্যাদিতে সাহায্য করে)।

তাদের এই সামর্থ্যের উৎকর্ষ সাধনের মধ্যে দিয়ে নানাপ্রকারের জটিল আচরণ গড়ে ওঠে। বানর ইত্যাদি উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে এগুলো প্রকাশ পায় লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্যে ঘোরানো পথের উদ্ভাবনায়, নানা ধরনের হাতিয়ার ব্যবহারের মধ্যে। এটাকেই আমরা সাধারণ প্রাণীদের "বুদ্ধি" বলে থাকি।

জীবজন্তুর মধ্যে অতি উন্নত মাত্রায় বিকশিত মানসিক ক্রিয়া এটাই দেখিয়ে দেয় যে মানব-চেতনার জৈবিক একটা জীবদেহগত পূর্বাবস্থা রয়েছে এবং মানুষ

ও তার পূর্বপুরুষ জীবদের মধ্যে কোন অলঙ্ঘনীয় সেতু নেই ; আসলে একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারাই আছে। এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ ও প্রাণীর মানসিক ক্রিয়া ঠিক একই রকম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

জীবজন্তুরা ভাষার সাহায্যে ধারণাবোধক চিন্তার সামর্থ্য রাখে না। তারা ইচ্ছেমতো তাদের কল্পনাকে সাজাতে-গোছাতে ও বাস্তবের কোনো ভাবরূপ সৃষ্টি করতে অসমর্থ ; তারা পরিবেশ সম্পর্কে তাদের কোনো সচেতন মনোভাব গ্রহণ করতেও অক্ষম।

৪ চেতনা ও বাক্‌শক্তি—তাদের উৎপত্তি ও আন্তঃসম্পর্ক

চেতনা ও বাকশক্তির উৎপত্তি হয়েছিল আমাদের বানর-সদৃশ পূর্বপুরুষদের প্রকৃতি-দত্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া জিনিসের ভোগ দখল থেকে শ্রমে, হাতিয়ার নির্মাণে, মানুষের মত জীবন-ক্রিয়ায় এবং এইসবের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে। চেতনা এবং বাকশক্তিতে উত্তরণ মনের বিকাশ এবং মনন-ক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটা বিরাট গুণগত উল্লম্ফনেরই প্রকাশ।

জীব-জন্তুদের মানস-ক্রিয়া পরিবর্তনশীল পরিবেশে কোন একটা কিছুর অভিমুখী হ'তে এবং তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে কিন্তু তাদের পারিপার্শ্বিক জগৎকে তারা ইচ্ছে মতো ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিবর্তন করতে পারে না। লক্ষ্যানুসারী সক্রিয়তা অর্থে শ্রম হ'ল সমস্ত মানবজীবন ও চেতনার মূল শর্ত। এঙ্গেলস বলেছেন, শ্রম "হল সমস্ত মানব অস্তিত্বের মূল শর্ত এবং এটা এতদূর পর্যন্ত যে এক অর্থে আমাদের বলতে হয় শ্রমই মানুষের স্রষ্টা"[১]। শ্রমের গোড়াকার রূপ হলো—কাঠ, পাথর, হাড় ইত্যাদির সাহায্যে হাতিয়ার নির্মাণ এবং এদের সাহায্যে জীবন-ধারণের উপকরণ বানানো। কতকগুলি জীবজন্তুরও হাতিয়ার হিসেবে নানারকমের জিনিস ব্যবহার করার সামর্থ্য আছে। উদাহরণস্বরূপ, বানররা কখনও কখনও বাদাম ভাঙার জন্যে পাথর কুড়িয়ে নেয় অথবা তারা কিছু একটা ধরবার জন্যে লাঠি ব্যবহার করতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু তারা কোনো দিন কোনো একটা আদিম ধরনের হাতিয়ার নিজে তৈরী করেনি।

প্রায় দশ লক্ষ বৎসর আগে আমাদের বানর-সদৃশ পূর্বপুরুষরা গাছে বাস করতো। পরিবর্তনশীল পরিবেশ তাদের গাছ থেকে মাটিতে নামালো।

১ এফ. এঙ্গেলস. ডায়ালেকটিকস অব নেচার, ১৭০ পৃঃ।

এই নতুন পরিবেশে শিকারী জন্তুদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া ও অন্যান্য প্রাণীকে আক্রমণ করার জন্যে তাদের ব্যবহার করতে হলো লাঠি, পাথর, বড় বড় প্রাণীর হাড় ইত্যাদি।

নিয়মিত হাতিয়ার ব্যবহারের প্রয়োজনে তারা বাধ্য হয়েই চারিপাশের উপাদানগুলোকে ঘষে-মেজে কাজে লাগানো থেকে খোদ হাতিয়ার সৃষ্টির দিকেই এগিয়ে গেল। এ সবের ফলে সামনের হাত দুটোর কার্যকলাপ রীতিমতো পাল্টে গেল ; এগুলো ক্রমশঃই বেশি করে নতুন নতুন কাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে লাগলো এবং শ্রমের স্বাভাবিক হাতিয়ারে পরিণত হল।

শ্রমের ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাত মস্তিষ্ক সমেত গোটা দেহযন্ত্রেই পরিবর্তন নিয়ে এল। চেতনা কেবলমাত্র শ্রম এ বাক্‌শক্তির প্রভাবে গঠিত একটা জটিল মস্তিষ্কের কার্য হিসেবেই গড়ে উঠতে পারে। "প্রথমে শ্রম, এর পরে ও এর সঙ্গে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত কথা—এই দুটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উত্তেজনা যার প্রভাবে বানরের মস্তিষ্ক ক্রমশ মানুষের মস্তিষ্কে পরিবর্তিত হলো…।"[১]

শ্রম ও মস্তিষ্কের বিকাশ মানুষের বোধেন্দ্রিয়গুলোর উৎকর্ষ সাধন করলো। তার স্পর্শ-বোধ ক্রমশই সঠিক ও সূক্ষ্ম হতে থাকল, তার শ্রুতি অর্জন করলো মানুষের কথার মধ্যে সূক্ষ্ম তারতম্য ও শব্দগত সাদৃশ্যকে তফাত করার শক্তি, তার দৃষ্টি আরও বেশি করে প্রত্যক্ষ করার শক্তি অর্জন করতে লাগলো। এঙ্গেলস লিখেছিলেন, "ঈগল মানুষের থেকে অনেক বেশী দূর পর্যন্ত দেখতে পায়, কিন্তু মানুষের চোখ সব জিনিসের মধ্যে ঈগলের চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পায়।"

বাস্তব কাজকর্মের যুক্তি মস্তিষ্কে স্থান লাভ করলো এবং সেখানে তা রূপান্তরিত হল চিন্তার যুক্তিতে. যা সৃষ্টি করল লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষমতা।

প্রথমে তার কাজ ও পরিবেশ সম্বন্ধে মানুষের সচেতনতা ছিল ইন্দ্রিয়জাত প্রতিরূপ গঠন, তাদের সমন্বয় সাধন ও আদিমতম সামান্যকীরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রথমে চেতনা ছিল তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষ করা পরিবেশের সম্বন্ধে, অন্য লোকেদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের সচেতনতা। যতই শ্রম ও সামাজিক সম্পর্কের রূপ জটিলতর হতে লাগলো, ততই কিন্তু মানুষ প্রত্যয়, সিদ্ধান্ত ও অনুমানের রূপে চিন্তা করবার সামর্থ্য অর্জন করল, যা প্রতিবিম্বিত করত বস্তু ও ঘটনাবলীর মধ্যেকার গভীরতর ও বহুমুখী সম্পর্ককে।

চেতনার উৎপত্তি ভাষা ও স্পষ্টভাবে উচ্চারিত কথার জন্মের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এটা মানুষের ভাবরূপ ও চিন্তার বাস্তব রূপ। চেতনার মতো কথাও শ্রম-প্রক্রিয়ার মধ্যেই রূপলাভ করেছিল। শ্রমের প্রয়োজনে একত্রে কর্মরত

---

১ এফ, এঙ্গেলস, ডায়ালেকটিকস অব নেচার, ১৪৪ পৃঃ।

অনেকগুলো লোকের সহযোগিতামূলক কাজকর্মের দরকার হয়েছিল এবং তারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও নিরন্তর যোগাযোগ ছাড়া এটা করতে পারতো না।

প্রাণীদের মধ্যে বাকশক্তির আগে গড়ে উঠেছিল দীর্ঘকালব্যাপী ধ্বনি ও মোটর প্রতিক্রিয়া। কিন্তু প্রাণীদের বাক্য-বিনিময়ের কোন প্রয়োজন নেই। "খুব উন্নত প্রাণীদেরও যেটুকু অন্যদের জানানো প্রয়োজন, তাও স্পষ্টভাবে উচ্চারিত শব্দ ছাড়াই জানানো যায়।"[১] কোনও উত্তেজনায় (যথা বিপদের ইঙ্গিত, বা খাদ্যদ্রব্যের অস্তিত্ব প্রভৃতি) সাড়া দিয়ে কোন বিশেষ ধরণের মানসিক অবস্থা প্রকাশ করার সময় প্রাণীরা যে-শব্দ ও অঙ্গভঙ্গি করে তাতে সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো বস্তু বা ঘটনাবলী (যা এটাকে জাগিয়ে তোলে) প্রকাশ পায় না। মানুষের ভাষা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার ; এটা কোনো জিনিস এবং তার গুণ ও ধর্মকে বোঝায় এবং সেইজন্যে ভাষা মানুষের ভাব-বিনিময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহন ও চিন্তার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

একটি বিষয় দেখতে, কল্পনা করতে বা তার সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে মানুষ এমন একটি নাম করে যার একটি সার্বজনীন অর্থ আছে এবং একটা নির্দিষ্ট সমাজে সবার কাছে যেটি পরিচিত। এটা পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং বাস্তবতা ও মানুষের নিজেকে উপলব্ধি করার জন্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভাষার সাহায্যে কথাবার্তা চলে অর্থাৎ ভাব আদান-প্রদানের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপায় এটা। ভাষা নানা রকমের, যেমন মৌখিক, লিখিত ও স্বগত (নিঃশব্দ, অনুচ্চারিত বাক্য—যখন মানুষ "মনে মনে" কোনোকিছু সম্বন্ধে ভাবে, এটা চেতনার বাস্তব রূপ)।

কথার মৌল একক হল পদ ও বাক্য। পদগুলো অর্থ ও ধ্বনির ঐক্যবদ্ধ রূপ। পদের বাস্তব দিক (ধ্বনি, লিখিত প্রতীক) কোন বস্তুর নির্দেশক এবং একটা চিহ্ন। অন্যদিকে পদের অর্থ বিষয়কে প্রতিবিম্বিত করে এবং তাই এটা একটি ইন্দ্রিয়জ বা মানসিক প্রতিরূপ। বাক্য হল বাস্তব রূপ, একটা সম্পূর্ণ চিন্তা বা সিদ্ধান্তের বাহন।

ভাষাই আমাদের সক্রিয় অনুচিন্তন থেকে, ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষণ থেকে সামান্যীকৃত, বিমূর্ত চিন্তার জগতে নিয়ে যায়। "প্রত্যেকটি পদ (কথা) পূর্ব থেকেই সামান্যীকৃত।"[২] আমাদের চিন্তা ও অনুভূতিকে আমরা যেন বাক্যের মধ্যে বাস্তবায়িত করে আমাদের কাছে উপস্থিত করি এবং সেগুলোকে আমাদের বাইরের একটি বস্তু হিসাবে আমরা বিশ্লেষণ করে থাকি।

দার্শনিকেরা অনেকদিন থেকেই চেতনা ও ভাষার সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে আগ্রহান্বিত হ'য়েছেন এবং তা খুব বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। কিছু চিন্তাশীল

---

১ এফ, এঙ্গেলস, ডায়ালেকটিকস অব নেচার, ১৭৪ পৃঃ।

২ ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ২৭৪ পৃঃ।

ব্যক্তি—(যেমন জার্মান দার্শনিক ফ্রিডরিশ সিলিয়েরমাখার) কথাই যুক্তি, এইটা ধরে নিয়ে কথা ও চিন্তাকে একই বলে মনে করেন। অন্যেরা, যেমন জার্মান দার্শনিক ফ্রিডরিশ বেনিকে, চেতনাকে কথা থেকে আলাদা করে ফেলেছেন এবং তাঁর বিশ্বাস ভাষা ছাড়াই চিন্তা সম্ভব, আর ভাষা হল চিন্তার ফল।

মার্কসবাদ চেতনাকে ভাষা ও কথার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত বলে মনে করে। ভাষা, চেতনা ও বাস্তবতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে তুলে ধরে মার্কস ও এঙ্গেলস এই মত প্রকাশ করেছেন যে "চিন্তা বা ভাষা কোনটিই নিজ নিজ সীমার মধ্যে নিজস্ব এলাকা গড়ে তোলেনি…ওগুলো শুধু বাস্তব জীবনেরই প্রকাশ।"[১] তাছাড়া "ভাষা চিন্তার তাৎক্ষণিক বাস্তবরূপ।"[২] যেমন চিন্তা ছাড়া ভাষা থাকতে পারে না, তেমনি চিন্তা ও ভাবগত প্রতিরূপগুলিও ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। একদিকে ভাষা থেকে চিন্তার বিচ্ছিন্নতার ফলে চিন্তা তার সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের বস্তুগত উপাদান থেকে বঞ্চিত হয়ে অনিবার্য রহস্যময়তার দিকে এগিয়ে যায় এবং অন্যদিকে সমাজ জীবন ও সাংস্কৃতিক বিকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাষা এবং কথাকে সাশ্রিত সারমর্ম হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।

চেতনা ও কথা একটা ঐক্য গড়ে তোলে কিন্তু এটা অভ্যন্তরীণ দিক থেকে নানা ঘটনার দ্বান্দ্বিক ঐক্য। চেতনা বাস্তবতাকে প্রতিবিম্বিত করে,[৩] আর ভাষা তার পরিচয় দেয় ও চিন্তাকে প্রকাশ করে। কথার রূপমণ্ডিত চিন্তা ও প্রতিরূপগুলো তাদের বৈশিষ্ট্যকে হারায় না।

আমরা এতক্ষণ দেখলাম, চেতনার উম্মেষ ঘটেছিল ঐতিহাসিকভাবে কথার সঙ্গে সঙ্গেই এবং এর বাস্তব ভিত্তির উপর চেতনা প্রত্যেক ব্যক্তির বাকশক্তির সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য ঐক্য-বন্ধনের মধ্যে দিয়ে রূপ লাভ করে। মানব-চেতনার বিকাশে বাকশক্তি একটা শক্তিশালী বাহন।

ভাষার মধ্যে আমাদের ভাবরূপে সৃষ্টি, চিন্তা, অনুভূতি একটা বাস্তব, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষরূপে আচ্ছাদিত থাকে এবং সেইজন্যে ভাষা আমাদের ব্যক্তিগত অধিকার থেকে অন্য লোকের, সমাজের অধিকারে চলে যায়। এইটাই ভাষাকে এমন একটা হাতিয়ারে পরিণত করে, যার দ্বারা একে অপরকে, সমাজ ব্যক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে।

প্রাণীদের মধ্যে প্রজাতির অভিজ্ঞতা বংশগতির মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়। এতে তাদের বিকাশ খুবই ধীর গতিতে চলে। মানুষের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও পরিবেশকে প্রভাবিত করার নানা পদ্ধতির বেশির ভাগই উৎপাদনের হাতিয়ার এবং ভাষার মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়। জৈবিক উপাদান—বংশগতি ছাড়াও মানুষ অভিজ্ঞতাকে চালান করার জন্যে গড়ে তুলেছে আরও শক্তিশালী এবং আরও

১. কার্ল মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, দি জার্মান আইডিওলজি, মস্কো ১৯৬৮, ৫০৪ পৃঃ।
২. ঐ ৫০৩পৃঃ

প্রত্যক্ষ পদ্ধতি—সামাজিক পদ্ধতি। এইভাবেই মানুষ বাস্তব ও বুদ্ধিজাত সংস্কৃতির বিকাশের হারকে দ্রুততর করেছে।

ভাষার কল্যাণেই চেতনা রূপ পায় এবং সামাজিক ঘটনা ও সমাজ জীবনের মননজাত ফসলরূপে বিকাশ লাভ করে। মানুষের আদান-প্রদান, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, অনুভূতি এবং প্রতিরূপগুলির বিনিময়ের উপায় হিসেবে ভাষা কেবলমাত্র একটা নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর মানুষ অথবা একটা নির্দিষ্ট প্রজন্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে না, বিভিন্ন প্রজন্মের সঙ্গেও যুক্ত থাকে। এইভাবেই বিভিন্ন যুগের মধ্যে ধারাবাহিকতা চলতে থাকে।

ভাববাদী দার্শনিকরা এই অভিমত পোষণ করেন যে চেতনা কেবল এর নিজের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকেই বিকাশলাভ করে এবং একমাত্র এর নিজের শর্তেই বোধগম্য অন্যদিকে ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ মনে করে চেতনাকে সমাজজীবনের অন্যান্য ঘটনাবলী থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বোঝা যায় না। চেতনা বিচ্ছিন্ন নয়, এটা সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে বিকাশ লাভ করে ও পরিবর্তিত হয়। যদিও চেতনার উৎপত্তির উৎস মানসিক ক্রিয়াকলাপের জৈব-সংস্থানের মধ্যে, এটা তাই বলে প্রকৃতির দান নয় বরং সামাজিক-ঐতিহাসিক ঘটনা। একজন মানুষের সংবেদন, চিন্তা ও অনুভূতি মস্তিষ্ক নির্ধারণ করে না। প্রকৃতির "হাত থেকে" মস্তিষ্ক যে-ভাবে বেরিয়ে আসে তা মানুষের মত করে ভাবতে পারে না। সমাজ একে ঐরকম করতে শেখায়। মস্তিষ্ক চেতনার আধার হয়ে ওঠে কেবলমাত্র তখনই, যখন মানুষ সমাজ জীবনের ঘূর্ণিকাবর্তের মধ্যে আকর্ষিত হয়, যখন সে এমন একটা অবস্থার মধ্যে কাজ করে—যা তার মস্তিষ্ককে ঐতিহাসিকভাবে গড়ে-ওঠা এবং বিকাশমান সংস্কৃতির নির্যাস পান করায়, তাকে বাধ্য করে সমাজ জীবনের নির্ধারিত তাগিদে একটি বিশেষ লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করতে এবং তাকে মানুষ ও সমাজের প্রয়োজনীয় সমস্যাবলীর উপস্থাপন ও সমাধানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

৫ চিন্তার প্রতিরূপ গঠন

প্রতিবিম্ব ও চেতনার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে সাইবারনেটিক্স—জটিল, স্ব-নিয়ন্ত্রিত সচল ব্যবস্থার বিজ্ঞান। এই ব্যবস্থাগুলোর অন্তর্ভুক্ত জৈব দেহ, দেহযন্ত্র, কোষ, জীবাণু-গোষ্ঠী, সমাজ এবং কতকগুলো প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি—যেগুলির তথ্য গ্রহণ, তথ্য সাজানো এবং স্মৃতিতে ধরে রাখার ক্ষমতা, ফিডব্যাক নীতি অনুসারে কাজ করা এবং এই ভিত্তিতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রয়েছে।

তথ্য (Information) কী ? এর সঙ্গে প্রতিবিম্বের কী সম্পর্ক রয়েছে ? এই প্রশ্ন সম্পর্কে সবাই একমত নন। কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য ও প্রতিবিম্বকে এক করে দেখতে চান, অপরদিকে অন্যেরা ধরে নিচ্ছেন যে, এই সব ধারণার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বটে কিন্তু তারা সমার্থবাচক নয়।

প্রতিবিম্ব-ধারার মধ্যে কিছুটা তথ্য-প্রেরণ অনিবার্য অর্থাৎ একটি জিনিস থেকে অন্য বিশেষ ধাঁচের (কাঠামো, রূপ) জিনিসে তথ্য প্রেরণ যার ভিত্তিতে কেউ প্রতিবিম্বিত জিনিসটির গুণ ও ধর্মের ধারণা করতে পারে।

বস্তু দেহের প্রত্যেকটি স্তরেই নির্দিষ্ট তথ্য-প্রক্রিয়া ঘটে থাকে। জড় জগতেও তথ্য বিনিময় হয়। কিন্তু সেখানে এটাকে কখনোই পাঠোদ্ধার করা হয় না। শুধু গ্রহণের সামর্থ্যই নয় অধিকন্তু তথ্যের সক্রিয় ব্যবহারও জৈব বস্তুর মূল ধর্ম। প্রাণীদের খাপ খাইয়ে নেওয়া, তাদের আচরণ ও এদের সহগামী নিয়ন্ত্রণ তথ্য ছাড়া অচিন্তনীয়। সাইবারনেটিকসে নিয়ন্ত্রণ হল একটা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থার দ্বারা আর একটি ব্যবস্থার (নিয়ন্ত্রিত) ক্রিয়ার কর্মসূচী মাফিক নিয়ন্ত্রণ। সেই রকম মস্তিষ্ক হ'ল নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থা আর নড়াচড়া করবার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো গড়ে ওঠে নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা হিসেবে।

তথ্য চালান হয় কতকগুলো সংকেত অর্থাৎ কতকগুলো বাস্তব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। (বিদ্যুৎতাড়ন, তড়িচ্চুম্বক তাড়িত উত্থানপতন, ঘ্রাণ, শব্দ, রং ইত্যাদি)। একটা সংকেত তথ্য সরবরাহ করতে পারে কারণ এর একটা কাঠামো রয়েছে। তথ্য হল সংকেতের ভেতরকার জিনিস।

সমস্ত কমপিউটারের ভিত্তি হলো তথ্য-সংকেত সূত্র। মানুষের জন্যে বিপুল পরিমাণ তথ্যকে সাজানোর সামর্থ্য নিয়ে কমপিউটারের আবির্ভাব। যন্ত্রের সাহায্যে চিন্তার ছক নির্মাণ করার সমস্যা এবং মানুষের মস্তিষ্কের প্রবাহ ও মডেলিং যন্ত্রের মধ্যে গতিশীল প্রবাহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের সমস্যাকে সামনে তুলে ধরেছে কমপিউটার।

আজকাল মানুষের নানা ধরনের মননক্রিয়ার ছক রচনা করার জন্যে যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, এমন যন্ত্র আছে যা চাক্ষুষ প্রতিরূপ-গুলিকে চিনতে পারে। এটা অবশ্য স্বীকার করতে হবে তারা চিনতে পারে বিশেষ এক শ্রেণীর জিনিসকে যা তাদের "শিক্ষা" বা "স্ব-শিক্ষা" প্রক্রিয়ার মধ্যে খাওয়ানো হয়েছে। মানুষের প্রত্যক্ষ করা এবং যন্ত্রের "চেনার" কাজের মধ্যে মূল পার্থক্য হল এই যে, প্রথমটি হল কোন জিনিসের ভাবগত প্রতিরূপ আর দ্বিতীয়টিতে এটা হল বস্তুর নানা লক্ষণযুক্ত সংকেত, যা কতকগুলি কাজ করার জন্যে যন্ত্রটির দরকার।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব সাফল্য অর্জিত হয়েছে স্মৃতিশক্তির মডেল নির্মাণে। এমন যন্ত্র তৈরী করা হয়েছে যা অতি দ্রুত গতিতে তথ্য মনে করে রাখতে পারে, যতদিন দরকার জমা করে রাখতে পারে এবং নির্ভুলভাবে

সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে পারে। এই ধরনের যন্ত্রের স্মৃতিশক্তি খুবই বেশি কিন্তু যন্ত্রের স্মৃতি মানুষের স্মৃতি থেকে পৃথক। মানুষের মস্তিষ্কে স্মৃতি প্রত্যয়গত ব্যবস্থার সম্পর্কের ভিত্তিতে সংগঠিত। যার ফলে স্মৃতি পর্যায়-ক্রমিক প্রত্যেক দফার মধ্যে দিয়ে না গিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য বাছাই করতে সমর্থ হয়। শারীরবৃত্ত প্রক্রিয়ার গতিবেগ নয়—জ্ঞানের প্রত্যয়গত গঠনই মানুষের স্মৃতিশক্তিকে দ্রুত মনে পড়ার ক্ষমতা দান করেছে। একজন মানুষ যান্ত্রিকভাবে জমিয়ে তথ্যগুলোকে মুখস্থ করে না, বরং একটা লক্ষ্য-অভিমুখী উপলব্ধ প্রক্রিয়ার দ্বারাই এ কাজ সম্পন্ন করে।

প্রত্যক্ষণ ও স্মৃতি থেকে ভাবমূর্তি সৃষ্টির চাইতে প্রকৃত চিন্তন-ক্রিয়ার ছক নির্মাণের ফলাফল কম আকর্ষণীয় নয়। বর্তমানে এমন যন্ত্র আছে যা জ্যামিতিক সম্পাদ্য, এক ভাষা থেকে অপর ভাষায় তর্জমা অথবা দাবা খেলার মত বুদ্ধির কাজকর্ম চালাতে পারে।

যন্ত্র জ্যামিতিক সম্পাদ্যের সমাধান করতে পারে যদি কর্মসূচীরূপে প্রয়োজনীয় স্বতঃসিদ্ধ ও অনুমানগুলো "স্মৃতিকে খাওয়ানো" হয়। কিন্তু তারা এই কাজ করতে সক্ষম কেবলমাত্র তাদের ক্রিয়াশীল গতিবেগের কল্যাণে। কেবলমাত্র সকল রকম সম্ভাব্যতা ও নমুনার মধ্য দিয়ে গিয়ে অবশেষে এই যন্ত্রটি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসারে কোন সমস্যার সমাধানে যন্ত্রটি সমস্যাটির মর্মে প্রবেশ করে না। এ নিছক অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করে এবং ফলাফল "গ্রাহ্য করে না"। অপর পক্ষে কোন ব্যক্তি সাধারণত তার কাজের ফলের কথা, তার নিজের জন্যে ও অপরের জন্যে ভাবে। এটা করতে গিয়ে সে নানা ধরনের সামাজিক প্রেরণার দ্বারা পরিচালিত হয়, যা যন্ত্রের মধ্যে নেই। যন্ত্রের সৃজন ক্ষমতা নেই। কারণ সমস্যার উপস্থাপনা ও সমাধান ব্যাখ্যা সৃজনশীল কাজকর্ম থেকে অচ্ছেদ্য।

মানুষের বৈশিষ্ট্যসূচক গতানুগতিক যৌক্তিক চিন্তার মডেল নির্মাণে সাইবারনেটিক্স যন্ত্র অত্যন্ত কার্যকর। কিন্তু মানবচেতনা কোন প্রকারেই শুধু এই ধরনের চিন্তাধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যে-সমস্ত সমস্যা প্রচলিত রীতি-নীতির ছক-বাঁধা নয়, সেগুলির সমাধানে চেতনার ডায়ালেকটিক নমনীয়তা ও নিখুঁত ভূমিকা আছে।

এটা আমাদের মনে রাখা দরকার যে মানুষের চিন্তা করবার সামর্থ্য গড়ে ওঠে ঐতিহাসিকভাবে সঞ্চিত সংস্কৃতি আত্মস্থ করার মাধ্যমে, তার শিক্ষা ও তালিমের দ্বারা, সমাজের সৃষ্ট নানা উপকরণ ও উদ্ভাবনের সাহায্যে মানুষের কাজকর্মের দ্বারা। মানুষের অন্তর্জগতের সম্পদ নির্ভর করে সামাজিক সম্পর্কের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যের উপর। তাই যদি আমাদের সমগ্র মানবচেতনা, তার কাঠামো ও তার সমস্ত কাজকর্মের মডেল নির্মাণ করতে হয়, তাহলে শুধু

মস্তিষ্কের কাঠামো নির্মাণ করলেই যথেষ্ট হবে না। আমাদের মানবীচিন্তার সমগ্র ইতিহাসের গতিধারা উপস্থাপিত করতে হবে এবং ফলত মানুষের অগ্রগতির ঐতিহাসিক ধারার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে হবে এবং এই অগ্রগতির ধারার রাজনৈতিক, নৈতিক ও নন্দনতত্ত্বগত সমস্ত চাহিদা মেটাতে হবে।

সচেতন জীব হিসেবে মানুষ বিবর্তিত হয়েছে সমাজ বিকাশের গতিপথে এবং তাই মানুষের সমস্যা ও তার চেতনা ততটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সাইবারনেটিকসের নয়, যতটা দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক সমস্যা।

তাই চেতনার অনুসন্ধান, তার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, উৎপত্তি, মস্তিষ্ক ও ভাষার সঙ্গে তার সম্পর্ক বিচারের মধ্যে দিয়ে মার্কসবাদের এই বক্তব্য প্রমাণিত হয় যে, চেতনা তার সামাজিক-ঐতিহাসিক চরিত্রের দিক থেকে মূলত প্রতিবিম্বজাত।

———

পঞ্চম অধ্যায়

বিকাশের সার্বিক ডায়ালেকটিক নিয়ম

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনে জগতের বাস্তবতার স্বীকৃতি নিরন্তর জাগতিক পরিবর্তনশীলতার স্বীকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য। বস্তু চিরন্তন ও নিরন্তর গতি ও বিকাশের মধ্যে রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ, সর্বাঙ্গীণ ও গভীর বিকাশের তত্ত্ব ডায়ালেকটিকস—এ মার্কসবাদের হৃদয় ও আত্মা—তার তত্ত্বগত ভিত্তি। ডায়ালেকটিকস-এর সার্বিক নিয়মগুলো যে-কোন বিকাশমান ঘটনাপুঞ্জের মৌল বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে, তা তারা যে-কোন কর্ম-ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্তই হোক না কেন।

১. সার্বিক সম্পর্ক ও বিকাশের বিজ্ঞান হিসেবে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস

আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি সমস্ত সত্তা ও জ্ঞানের গতি, পরিবর্তন ও বিকাশের সার্বিক মৌল সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানব-চিন্তার ইতিহাসে এই সূত্রকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়েছিল নানারকম আধিবিদ্যক ধ্যানধারণার বিরুদ্ধতা করে।

বিকাশের ধারণাটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে এবং একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিবর্তনের ক্ষেত্রে দর্শন বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল। প্রকৃতি ও সমাজের নির্দিষ্ট বিজ্ঞানগুলো বিকাশের অবস্থান থেকে তাদের বিষয়গুলো সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের বহু পূর্বেই দর্শন এই বক্তব্যটি হাজির করেছিল যে বিকাশই সত্তার অপরিহার্য নীতি। উদাহরণস্বরূপ, বহু গ্রীক দার্শনিক সমগ্র বিশ্ব ও তার মধ্যেকার পৃথক বিষয়গুলোকে একটি গঠন-প্রক্রিয়ার পরিণাম বলে গণ্য করতেন। এটা ঠিক যে, তাঁদের মত যদিও গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন তবুও তা সহজ-সরল। কিন্তু অস্তিত্ববান সবকিছুর সাধারণ নিয়ম হিসেবে বিকাশের প্রশ্নটির অবতারণা করাটাই জ্ঞানের ইতিহাসে একটা সুগভীর প্রভাব ফেলে। পরে বিশেষজ্ঞতাযুক্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে দর্শন বিকাশের মর্মকে আরও গভীরভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এটা ছিল একটা জটিল পথ, অগ্রগতির কোন সহজ উপায় ছিল না। বহু শতাব্দী ধরে প্রভুত্ব করছিল আধিবিদ্যক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি—বস্তুর প্রকৃতি ও ধর্ম অপরিবর্তনীয়, চিরস্থায়ী—এই তত্ত্ব। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই কেবল বিজ্ঞান ও দর্শন আবার একবার বিকাশ ও পরিবর্তনের ধারণার দ্বারা সঞ্জীবিত হল। কিন্তু এখন এই ধারণাগুলো প্রকৃতির গভীর বীক্ষণের উপর ভিত্তি করে প্রকাশ পেল।

বৈজ্ঞানিক সাফল্য ও মানবজাতির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ থেকে সৃষ্টি হল বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস। এই তত্ত্ব এটা দেখিয়ে দিল যে সামাজিক জীবন ও মানব-চেতনা খোদ প্রকৃতির মতই অবিরাম পরিবর্তন এবং বিকাশের মধ্যে রয়েছে। সেই অনুযায়ী মার্কসবাদী দর্শনে ডায়ালেকটিকসকে সংজ্ঞা দেওয়া হয় "প্রকৃতি, মানবসমাজ এবং চিন্তার সাধারণ নিয়মের বিজ্ঞান"[১] হিসেবে, "পূর্ণতম, গভীরতম এবং সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মতবাদ, মানবজ্ঞানের আপেক্ষিকতার মতবাদ" হিসেবে "যা আমাদের সামনে হাজির করে বস্তুর চিরন্তন বিকাশের প্রতিবিম্ব।"[২]

ঘটনাবলীর সম্পর্ক, অন্য-সাপেক্ষতা এবং মিথষ্ক্রিয়ার প্রত্যয়গুলো ছাড়া বিকাশের প্রত্যয়টিকে বোঝা যায় না। বিভিন্ন বিষয়ের অথবা নানা দিকের এবং বিষয়ের মধ্যেকার উপাদানগুলোর মধ্যে সম্পর্ক ও মিথষ্ক্রিয়া ছাড়া কোন গতি সম্ভব নয়। এই কারণেই এঙ্গেলস ডায়ালেকটিকসকে "সার্বিক সম্পর্কের বিজ্ঞান"[৩] বলে অভিহিত করেছেন। লেনিন তাঁর "কার্ল মার্কস" প্রবন্ধে ডায়ালেকটিকস-এর একান্ত মর্মগত দিকগুলোর বর্ণনা করেছেন। তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন, "যে-কোন ঘটনাবলীর সমস্ত দিকের অন্য-সাপেক্ষতা এবং ঘনিষ্ঠতম, অচ্ছেদ্য সম্পর্কের" উপর, (ইতিহাস অনবরত নতুন নতুন দিক উদ্ঘাটিত করছে) যে-সম্পর্ক একটা সমরূপ ও সার্বিক গতিধারা সৃষ্টি করে এবং নির্দিষ্ট নিয়মের অনুসারী।"[৪]

যে-কোন ঘটনা সঠিকভাবে বুঝতে হলে আমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করতে হবে অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে এর সম্পর্ককে জানতে হবে এর উৎপত্তি এবং পরবর্তী বিকাশকে।

বিষয়গুলোর মধ্যে সম্পর্ক নানারকমের হতে পারে। কতকগুলো ঘটনা পরস্পর সরাসরিভাবে যুক্ত, যেখানে অন্যান্যগুলোর মধ্যে সম্পর্ক এগোচ্ছে মধ্যবর্তীদের সম্পর্কের মাধ্যমে, কিন্তু এই সম্পর্ক সর্বদাই আন্তর্সাপেক্ষ ও মিথষ্ক্রিয়ামূলক।

জগতের সমস্ত ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তার অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলোর পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে। একইভাবে সমস্ত জিনিস পারস্পরিক ক্রিয়া ও গতির মাধ্যমেই তাদের ধর্ম অর্জন করে, এর মাধ্যমেই এই ধর্ম প্রকাশ পায়। বস্তুগুলোর প্রতিটি ধর্মের ও অবস্থার সম্ভাব্য পরিবর্তন এবং তাদের মধ্যেকার সমস্ত ধরনের সম্পর্কের দ্বারা গঠিত হয়ে মিথষ্ক্রিয়া সার্বজনীন রূপ নেয়।

জগতে একেবারে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নেই—সমস্ত কিছুই কোন না কোন ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত। যে-কোন ঘটনাকেই তার স্বাভাবিক সম্পর্ক থেকে

১ এফ্. এঙ্গেলস, অ্যান্টি-ডুরিং, ১৬৮-১৬৯ পৃঃ।
২ ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ১৯শ খণ্ড, ২৪ পৃঃ।
৩ এফ্. এঙ্গেলস, ডায়ালেকটিকস অব নেচার, ১৭ পৃঃ।
৪ ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ২১শ খণ্ড, ৫৪ পৃঃ।

বিচ্ছিন্ন করে নিলে তা হয়ে পড়ে বর্ণনার অযোগ্য ও অযৌক্তিক। অবশ্য জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়ায় কিছু সময়ের জন্যে আমরা কোন বিষয়কে অনুশীলন করার জন্যে তাকে তার সাধারণ সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারি। কিন্তু আগেই হোক বা পরেই হোক, গবেষণার প্রয়োজনে ঐ সম্পর্কগুলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে, অন্যথায় ঐ বস্তুটি সম্পর্কে কোন ধারণায় আসা সম্ভব হবে না।

প্রত্যেক ঘটনা এবং সমগ্র জগৎ সম্পর্কের একটা জটিল ব্যবস্থা, যার মধ্যে কার্যকারণ-সম্পর্ক ও পারস্পরিক ক্রিয়ার স্থান গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কের কল্যাণেই কতকগুলো ঘটনা ও প্রক্রিয়া অন্যগুলোর সৃষ্টি করে, চিরন্তন গতি ও সমগ্র বিকাশের সমগ্র প্রক্রিয়ার মধ্যে কয়েক ধরনের গতি অন্যতে রূপান্তরিত হয়। জগৎ বিশৃংখল, আকস্মিক বিষয়, ঘটনা ও প্রক্রিয়ার জড়পিণ্ড হিসেবে আবির্ভূত হয় না, বরং মানবচেতনা ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বস্তুগত নিয়মের অধীন সমগ্র প্রকৃতি হিসেবেই জগৎ আবির্ভূত হয়। মানুষের ধ্যান-ধারণার আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে ঘটনাবলী ও প্রক্রিয়ার সাধারণ, সার্বিক সম্পর্ক এবং মিথস্ক্রিয়াকে অবশ্যই প্রতিবিম্বিত হতে হবে। কেবলমাত্র এই ক্ষেত্রেই মানুষ জগৎকে তার ঐক্য ও গতির মধ্যে জানতে পারে। জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়ায় মানুষের যে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা বা ধারণাগত পদ্ধতি গড়ে ওঠে, সেটা বিভিন্ন ঘটনা ও প্রক্রিয়ার আন্তঃসম্পর্কগত প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিজ্ঞান সর্বদাই কোন না কোন পথে ঘটনাবলীর মধ্যেকার সম্পর্কগুলোকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বিজ্ঞান সমগ্রতার অংশ হিসেবে একক ঘটনাকে নিরীক্ষণ করার জন্যে বর্তমানের মতো কখনও মনোযোগ দেয় নি। সত্তা-বিশিষ্ট ঘটনা ও প্রক্রিয়া—যার উপাদান ও অংশগুলো নির্দিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ, যেগুলি নিজেরাই আরও কোনও বৃহত্তর ব্যবস্থার বিশেষ দিক ও অংশ, তাকে একটা ব্যবস্থা হিসেবে বিশ্লেষণ করা আধুনিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যসূচক দিক। প্রকৃতি ও সমাজকে গতি ও বিকাশের একটি নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া হিসেবে উপলব্ধি করাই বিজ্ঞানের মহৎ লক্ষ্য। এই প্রক্রিয়া বস্তুগত নিয়মের অধীন ও তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু নিয়ম কী? **নিয়ম হল ঘটনাবলীর মধ্যেকার অভ্যন্তরীণ, সহজাত সম্পর্ক ও পরস্পর নির্ভরশীলতা।** ঘটনাবলী ও প্রক্রিয়ার মধ্যেকার সমস্ত সম্পর্কই নিয়ম নয়। ঘটনাবলীর মধ্যেকার **সারাত্মক, স্থায়ী, পুনরাবৃত্তিশীল ও সহজাতভাবে অন্তরাশ্রয়ী সম্পর্ককে নিয়ম** হিসেবে অভিহিত করা যায়।

একটা সম্পর্ক হতে পারে বাইরের, অসারাত্মক এবং সমাপতিত। এই ধরনের সম্পর্ক বিকাশের উপর ছাপ ফেলে কিন্তু বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে না। নিয়ম **অপরিহার্যতার একটা প্রকাশ** অর্থাৎ এমন একটা সম্পর্ক যা একটা বিশেষ পরিবেশে বিকাশের চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সামাজিক ঘটনাবলীর (রাষ্ট্র, সামাজিক চেতনার রূপ ইত্যাদি)

মধ্যেকার সম্পর্ক এই ধরনের। অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে কোন পরিবর্তন অনিবার্যভাবেই সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত করে।

প্রত্যেকটি নিয়ম ঘটনাবলীর অভ্যন্তরে অথবা তাদের ধর্মের মধ্যে অধিষ্ঠিত নির্দিষ্ট স্থায়ী সম্পর্ককে প্রকাশ করে। শেষ পর্যন্ত এটা এমন একটা সম্পর্ককে প্রকাশ করে যার কতকগুলো ঘটনার মধ্যেকার পরিবর্তন অন্যগুলোর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পরিবর্তন নিয়ে আসে।

নিয়ম সার্বিকতার একটা রূপ। নিয়মের জ্ঞান বিশাল ও বৈচিত্র্যময় জগৎকে তার নিজস্ব ঐক্য এবং সমগ্রতার মধ্যে অনুধাবন করতে সাহায্য করে।…"নিয়ম প্রত্যয়টি বিশ্ব-প্রবাহের ঐক্য ও সম্পর্ক, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সামগ্রিকতা সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানার্জনের একটি পর্যায়।"[১]

প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ সচেতনভাবে কাজ করতে, ঘটনা সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে, নিজেদের সুবিধার্থে প্রাকৃতিক বস্তু ও তাদের ধর্মগুলোকে পরিবর্তন করতে এবং তাদের জীবনের সামাজিক অবস্থাকে লক্ষ্য অনুযায়ী পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়।…"একবার এই আন্তঃসম্পর্ককে ধরতে পারলে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার স্থায়িত্বের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্বগত বিশ্বাস বাস্তবে ধ্বসে পড়ার আগেই নস্যাৎ হয়ে যায়।"[২] প্রকৃতি ও সমাজ কতকগুলো নিয়মানুসারে বিকাশ লাভ করে—এই ডায়ালেকটিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিরোধী এবং অচল সমাজব্যবস্থা বজায় রাখার পক্ষপাতী ব্যক্তিদের আক্রমণ তাই মোটেই আকস্মিক ঘটনা নয়।

ভাববাদী দার্শনিকরা নিয়মগুলোর বস্তুগত প্রকৃতিকে অস্বীকার করেন, সেগুলো মানব-মনের উদ্ভাবন বলে মনে করেন। যেমন আত্মগত ভাববাদী দার্শনিক কার্ল পিয়ারসন লিখেছিলেন, "বৈজ্ঞানিক অর্থে নিয়ম মূলত মানব-মনের সৃষ্টি এবং মানুষকে বাদ দিলে এর কোন অর্থ নেই। এটা তার অস্তিত্বের জন্যে বুদ্ধির সৃজনী ক্ষমতার নিকট ঋণী। প্রকৃতি মানুষকে নিয়ম শিখিয়েছে, তার চাইতে প্রকৃতির নিয়ম মানুষেরই দান—এই বিপরীত বক্তব্য অনেক বেশী অর্থব্যঞ্জক।"[৩] কিন্তু মানুষই যদি নিয়মকে বাস্তব জগতের ঘাড়ে চাপিয়ে থাকে তবে বিজ্ঞান ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্বন্ধে পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষমতা হারাতো এবং সেই সব বস্তুগত নিয়ম আয়ত্ত করতে পারতো না যা বহির্জগতকে জানা ও রূপান্তরের উপযোগী যন্ত্র নির্মাণে মানুষের সহায়ক হয়। বস্তুবাদী ডায়ালেকটিক সম্পর্ক ও নিয়মগুলো উদ্ভাবন করতে যায় না। এ খোদ বস্তু-জগতের মধ্যে থেকেই এগুলো আবিষ্কারের দায়িত্ব বিজ্ঞানের হাতে ছেড়ে দেয়।

১ ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস. ৩৮শ খণ্ড, ১৫০-৫১ পৃঃ

২ কার্ল মার্কস ও এফএঙ্গেলস. সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ২য় খণ্ড. ৪১৯ পৃঃ।

৩ কার্ল পিয়ারসন, গ্রামার অব সায়েন্স, লণ্ডন, ১৯১১, ৮৭ পৃঃ।

এইবার মূল বস্তুগত নিয়মগুলো (চেতনা নিরপেক্ষ) বিবেচনা করে দেখা যাক। ওগুলোকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১) বস্তুর নির্দিষ্ট ধর্ম-গুলোর মধ্যেকার সম্পর্ক অথবা একটি বা অন্য রূপের গতির কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার বিশেষ নিয়ম ; ২) বড় বড় ঘটনাপুঞ্জ ও বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ নিয়ম ; ৩) সাধারণ বা সার্বিক নিয়ম। প্রথম ধরনের নিয়মগুলো বিশেষ বিশেষ অবস্থায় প্রকাশ পায় এবং এগুলো অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মগুলো প্রকাশ পায় বহুসংখ্যক মূলগতভাবে পৃথক বাস্তব পদার্থের অপেক্ষাকৃত সাধারণ (তবে সার্বিক নয়) ধর্মগুলোর সম্পর্ক ও বারংবার সংঘটিত ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে। পদার্থবিদ্যার ভর, শক্তি ও আধানের নিত্যতা এবং চলনের পরিমাণ এবং জীববিজ্ঞানে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মের মধ্যে আমরা এর দৃষ্টান্ত পাই। তৃতীয় শ্রেণীর নিয়মগুলো প্রকাশ পায় সমস্ত ঘটনা আর তাদের ধর্মাবলীর মধ্যেকার সার্বিক ডায়ালেকটিক সম্পর্ক ও বস্তুর পরিবর্তন প্রবণতার মধ্যে। গুণগত বৈচিত্র্য ছাড়াও বস্তুর এক ধরনের অভ্যন্তরীণ ঐক্য আছে। এটা প্রকাশ পায় সমস্ত ঘটনার বিশ্বজনীন সম্পর্ক ও পরস্পর নির্ভরশীলতার মধ্যে, ঐতিহাসিক বিকাশে এবং কয়েক ধরনের বস্তুর অন্য বস্তুতে রূপান্তরের মধ্যে। এই ঐক্য বিশ্বজনীন নিয়মের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়।

দর্শনাভিত্তিক বিজ্ঞানের মতোই ডায়ালেকটিকস বিশ্বজনীন নিয়মের সঙ্গে জড়িত।

ডায়ালেকটিকস-এর নিয়মগুলো বাস্তবতার সকল দিককে নিয়ে সর্বত্র ক্রিয়াশীল। এগুলো **প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তার নিয়ম**। তাই তাদের রয়েছে একটা সার্বিক জ্ঞানতাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত তাৎপর্য। এর অর্থ এই যে ডায়ালেকটিকস এমন পদ্ধতি যা কেবল জ্ঞানের একটি মাত্র ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং **মানুষের জ্ঞানলাভের একটি বিশ্বজনীন পদ্ধতি**। এটা মনে রাখা দরকার ডায়ালেকটিকস এমন একটা "সার্বিক চাবিকাঠি" নয় যা যে-কোন বৈজ্ঞানিক রহস্যের তালা খুলে দেবে। ডায়ালেকটিকস গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এটা আমাদের বাস্তবতার প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের সহায়ক কিন্তু ঘটনার সুনির্দিষ্ট অনুশীলনের মাধ্যমেই এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা সম্ভব।

বিকাশের সার্বিক নিয়মগুলো **স্থিতি ও জ্ঞানের নিয়ম** হিসেবে ডায়া-লেকটিকস-এর মধ্যে প্রকাশ পায়। এই নিয়মগুলো তাদের মর্মের দিক এবং এই ঐক্য থেকে একটা ঐক্য-রূপ সৃষ্টি করে এবং এই ঐক্য ছাড়া কোনো সত্যজ্ঞান বা চিন্তার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। ডায়ালেকটিকস তাই শুধু সত্তার বিকাশ সম্বন্ধীয় একটা মতবাদ নয় ; এটা জ্ঞানের তত্ত্ব, যুক্তিশাস্ত্র অর্থাৎ চিন্তার রূপ ও নিয়ম সম্পর্কিত মতবাদ। বাস্তব মর্মবস্তুসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও

ডায়ালেকটিকস-এর নিয়মগুলো একই সঙ্গে জ্ঞানার্জনের পদক্ষেপ ও বাস্তবতার প্রতিবিম্বের যুক্তিশাস্ত্রসম্মত রূপ।

ডায়ালেকটিকস-এর মূল নিয়মগুলোকে এবার বিশেষভাবে বিচার করে দেখা যাক।

২ পরিমাণগত থেকে গুণগত পরিবর্তন এবং এর বিপরীত নিয়ম

সব কিছুই বিকাশমান—ডায়ালেকটিক শুধু এইটুকু সজোরে বলার বিষয় নয়। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হল বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই বিকাশের বিন্যাসকে উপলব্ধি করা। বর্তমান যুগের বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং বিরাট সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে কেউই বিকাশের নীতিটিকে অস্বীকার করতে সাহস করবে না। বরং প্রত্যেকেই এটাকে "স্বীকার করে।" কিন্তু লেনিন মন্তব্য করেছিলেন, এই "স্বীকৃতি" কখনও কখনও সত্যকে বিকৃত করার নামান্তর।

বিকাশের সূত্র সম্পর্কে নানা ধরনের মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। বহু বিষয়ের মধ্যে থেকে লেনিন দুটি অত্যন্ত মৌলিক ধারণাকে বেছে নিয়েছিলেন ; এর মধ্যে একটা বিজ্ঞানসম্মত, ডায়ালেকটিকস-এর তত্ত্ব এবং অপরটি অবৈজ্ঞানিক, ডায়ালেকটিকস-এর বিরোধী। বিকাশের দুটি পরস্পরবিরোধী ধারণা সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই বক্তব্যের মাপ-কাঠিতে আমরা কোন্‌টা বিকাশের সত্যিকারের বিজ্ঞানসম্মত, ডায়ালেকটিকস-এর মতবাদ তা বুঝতে পারি। লেনিন লিখেছেন "বিকাশের (বিবর্তন)...... দুটি মূল ধারণা হল—বৃদ্ধি ও হ্রাস হিসাবে বিকাশ, পুনরাবৃত্তি ও বিপরীতের ঐক্য হিসেবে বিকাশ (পারস্পরিকভাবে বাধাদানকারী বিপরীত শক্তি ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে এই ঐক্যের বিভাজন)।

"গতির প্রথম ধারণাটিতে, **স্বকীয়** গতি, এর চালিকাশক্তি, এর উৎস, এর প্রেরণা অন্তরালে থাকে (অথবা এই উৎসকে ভগবান, কর্তা ইত্যাদি বাইরের শক্তি বলে মনে করা হয়), দ্বিতীয় ধারণাটিতে আসল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হয় **স্বকীয়** গতির **উৎস** সংক্রান্ত জ্ঞানের দিকে।

"প্রথম ধারণাটি নিষ্প্রাণ, বিবর্ণ ও নিরস। দ্বিতীয়টি জীবন্ত। **একমাত্র** দ্বিতীয়টিই 'উৎক্রান্তি'র দিকে, 'ধারাবাহিকতায় ছেদের' দিকে, 'বিপরীতে রূপান্তরের' দিকে, পুরাতনের ধ্বংস এবং নতুনের আবির্ভাবের দিকে চাবিকাঠি জোগায়।"[১]

১ ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ৩৬০ পৃঃ।

বিকাশের ডায়ালেকটিকস ধারণার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে পুরাতনের বিলীন, ধ্বংস ও নতুনের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মধ্যে। অস্তিত্বসম্পন্ন কোনো কিছুর বিকাশের সরল পরিমাণগত পরিবর্তনের (হ্রাস-বৃদ্ধি) উপলব্ধির ধারণা ডায়ালেকটিকস-এর বৈশিষ্ট্য নয়। এই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন এবং এর বিপরীত নিয়মের মধ্যে। এই নিয়ম চারিদিকে কীভাবে আছে তা বুঝতে হলে আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে ধর্ম, পরিমাণ, গুণ এবং পরিমাপ সংক্রান্ত অনেকগুলো মূল দার্শনিক প্রত্যয়কে।

আমাদের চারিদিকে এমন সব জিনিস আছে যা পারস্পরিক সংযোগ ও সম্পর্কে আবদ্ধ। কোন বস্তু বা বিষয়কে আমরা যখন অন্য বস্তুর সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রবাহের মধ্যে দেখি, তখন ঐসব বস্তুর বাহ্যিক দিক সম্পর্কে আমাদের উপর যে-প্রত্যক্ষ ছাপ পড়ে—তার থেকেই জ্ঞানের সূত্রপাত। এই ধরণের পারস্পরিক ক্রিয়া ছাড়া বিষয়টি সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারা যায় না। এই পারস্পরিক ক্রিয়াই বস্তুর ধর্মগুলোকে প্রকাশ করে এবং একে একবার জানা গেলে বস্তুর রহস্যও আয়ত্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ধাতুর আছে ঘনত্ব, সংক্ষেপণসাধ্যতা, একটি নির্দিষ্ট গলনাংক, তাপ ও বৈদ্যুতিক পরিবাহী ক্ষমতা, ইত্যাদি। কেউ এ থেকে সিদ্ধান্ত করতে পারেন যে কোন বস্তু কতকগুলি ধর্মের যোগফল ছাড়া আর বেশী কিছু নয়, তাই কোনো একটা জিনিসকে জানার জন্যে তার ধর্মগুলো প্রমাণ করলেই হল। কিন্তু এ ধরনের সিদ্ধান্ত অবিবেচিত বলে গণ্য হবে। কোন বস্তুর ধর্মগুলোর গুরুত্ব যাই থাকুক না কেন, বস্তুকে কখনই শুধু তার ধর্মে পর্যবসিত করা যায় না। বস্তুর কতকগুলো ধর্ম পরিবর্তনশীল এবং বস্তুর অস্তিত্ব নষ্ট না করেও সেগুলো বিলুপ্ত হতে পারে। যেমন পুঁজিবাদী বিকাশের গতিপথে এর অনেকগুলো ধর্ম বদলে যায়, অ-একচেটিয়া পুরনো পুঁজিবাদ একচেটিয়াতন্ত্রে পরিণত হয়, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে পুঁজিবাদ আর পুঁজিবাদ থাকে না।

এইভাবে, কোন বস্তুর ধর্মের মধ্যে বস্তুটির মর্মগত বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পায়। এই নিভৃত মর্মটিই বস্তুর গুণ। গুণ হল তাই, যা কোন একটি বিষয় বা বস্তুকে অন্য কিছু থেকে পৃথক করে দেখায়। এটাই বাস্তব জগতের বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের কারণ। "গুণ" এই প্রত্যয়টির ব্যাখ্যায় হেগেল বলেন "এটা হল সাধারণভাবে একটা প্রত্যক্ষ নির্ণায়ক যা সত্তার সঙ্গে সমার্থবাচক···একটি বস্তু হল তাই যা তার গুণের দ্বারাই অস্তিত্ববান এবং গুণ নষ্ট হলে বস্তুটির অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়"।[১] বস্তুর অপরিহার্য ধর্মগুলোর সমগ্রতা অপেক্ষাও গুণ বড়, কারণ গুণের মধ্যে বস্তুর ঐক্য, সংহতি, আপেক্ষিক স্থায়িত্ব এবং স্বকীয় অভিন্নতা প্রকাশ পায়।

১ জি. ডবু. হেগেল, ওয়েৰ্কে, বি ডি ৬, বার্লিন, ১৮৪০, ১৭৯ পৃঃ।

গুণ কোন বিষয়ের কাঠামোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত অর্থাৎ যে-উপাদান ও ধর্মের কোন ধরনের সংগঠন দ্বারা এটা গঠিত, যার জন্যে কোনো বস্তুর কাঠামো কেবলমাত্র এদের যোগফল নয়, অধিকন্তু তাদের ঐক্য ও সমগ্রতা। কাঠামো সংক্রান্ত ধারণাটি থেকে আমরা এটা জানতে পারি—কেন কোনো জিনিসের ধর্মের কিছুটা পরিবর্তন, এমনকি নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জিনিসটির গুণ পরিবর্তিত হয় না। আমরা যদি পুঁজিবাদের দৃষ্টান্তটি বিচার করে দেখি, তাহলেই দেখব যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির কাঠামোর মধ্যে শ্রম ও পুঁজির সম্পর্কের ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বভাবজাত সমস্ত দিক, উপাদান এবং ধর্ম অঙ্গীভূত রয়েছে। এইটাই তাই যা পুঁজিবাদের গুণের নিয়ামক শক্তি এবং যে পর্যন্ত না উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদকদের মধ্যেকার সম্পর্কের কাঠামো বদলাচ্ছে, সে পর্যন্ত পুঁজিবাদের আসল চেহারা বদলাবে না। এই ধরনের পরিবর্তনকে ধনতন্ত্রের আধুনিক প্রবক্তারা অগ্রাহ্য করছে। তারা পুঁজিবাদের কতকগুলো ধর্মের পরিবর্তনকে মৌল গুণগত পরিবর্তনের সঙ্গে এক করে দেখাবার চেষ্টা করছে।

গুণের সংজ্ঞা নির্ণয়ের সূত্রপাতেই আমরা কোন বিষয় বা বস্তুর ডায়ালেকটিকস-এর সম্মুখীন হই। যখনই আমরা কোন জিনিসের গুণের সংজ্ঞা নির্ণয় করি তখনই আমরা অন্য কিছুর সঙ্গে ঐ জিনিসটিকে সম্পর্কিত করি এবং এইভাবে এর অস্তিত্বকে সীমাবদ্ধ করি। এই সীমার বাইরে জিনিসটি যা ছিল, এটা আর তা থাকে না বরং অন্য কিছু হয়ে দাঁড়ায়। এর অর্থ এই যে কোন বস্তুর গুণ তার সীমাবদ্ধতার সঙ্গে অভিন্ন।

যখন আমরা বলি জিনিসগুলো একই গুণসম্পন্ন, তার অর্থ সেগুলো একই। তাদের অবশ্য পৃথক ধর্ম থাকতে পারে, কিন্তু তারা এক। যেহেতু তারা গুণগতভাবে অভিন্ন, তাই তাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু মাত্রাগত বা পরিমাণগত। সেগুলি কম বা বেশি হতে পারে, তার পরস্পর আয়তন বা আকারের দিক থেকে পৃথক হতে পারে। ভিন্নভাবে বললে দাঁড়ায়, বিষয়ের গুণগত ঐক্য তাদের অপর দিক—মাত্রা বা পরিমাণগত দিককে বোঝবার পূর্বশর্ত। হেগেল বলেন, মাত্রা হচ্ছে "উন্নততর ঐক্যবিশিষ্ট গুণ", অর্থাৎ গুণ হিসেবে কোন জিনিসের বিশ্লেষণ অনিবার্যভাবে আমাদের নিয়ে যায় পরিমাণ সংক্রান্ত প্রত্যয়ের দিকে। এটাই স্বাভাবিক, কেননা গুণ ও পরিমাণ আলাদাভাবে থাকতে পারে না এবং একটা জিনিস একই সঙ্গে একই সময়ে এটা এবং ওটা। আমরা ওগুলোকে জ্ঞানের জন্যে কৃত্রিমভাবে পৃথক করি কিন্তু ওরকম করার পর আমরা আবার সম্পর্কগুলোকে ফিরিয়ে আনি।

বহু জিনিসের গুণগত বৈচিত্র্য থেকে মাত্রা বা পরিমাণগত প্রত্যয়টিকে বিমূর্ত করতে হয়। জ্ঞানের সাধারণ নিয়মানুসারে আমাদের প্রথম জিনিস-

গুলোর মধ্যেকার গুণগত পার্থক্যগুলোকে অবশ্যই অনুসন্ধান করতে হবে এবং তারপর অনুসন্ধান করতে হবে তাদের মাত্রাগত নিয়মানুবর্তিতাকে। এই মাত্রাগত নিয়মানুবর্তিতা জিনিসগুলোর সারসত্তা জানাবার সুবিধে করে দেয়। যেমন, বিজ্ঞান বহুকাল পর্যন্ত আলোর লাল, সবুজ, বেগুনী ইত্যাদি রং-এর গুণগত পার্থক্যের কারণ বুঝতে সমর্থ হয় নি। যখন এটা প্রতিষ্ঠিত হল যে রং-এর পার্থক্য নির্ভর করে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পার্থক্যের উপর, তখনই ঐ পার্থক্যের ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

পুঁজি বইতে কার্ল মার্কস তাঁর গবেষণা শুরু করেছেন পণ্যের গুণ—যা কিনা পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির "কোষ", তার সংজ্ঞা দিয়ে। তিনি এটা প্রতিষ্ঠা করেছেন যে পণ্য ব্যবহারকারীর নানা চাহিদা মেটায়—তাই তার ব্যবহারিক মূল্যের মধ্যে পার্থক্য ঘটে। মার্কস দেখিয়েছেন যে শ্রম যা গুণগত ভাবে নানা ধরনের পণ্য উৎপাদন করে, তারও রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসূচক গুণ; এটা হল ছুতোর, ময়রা ও চর্মকার ইত্যাদির নির্দিষ্ট শ্রম। কিন্তু যদি এগুলো কেবলমাত্র পণ্য-উৎপাদনকারী শ্রমের মধ্যে পার্থক্য হয় তাহলে আমরা কী করে বিনিময় করতে পারি—জুতো ও টেবিলের মধ্যে? মার্কস এটা প্রমাণ করেছেন যে পণ্য কেবলমাত্র মূর্ত শ্রমেরই নয়, বিমূর্ত শ্রমেরও ফল। এই বিমূর্ত শ্রম হচ্ছে পণ্যোৎপাদনের বৈশিষ্ট্য। এই শ্রমের মধ্যে দিয়ে মানুষের কায়িক ও মানসিক শক্তি ব্যয়িত হয়। এই গুণগতভাবে সমধর্মী শ্রম বিভিন্ন ধরনের পণ্যগুলোর মধ্যে তুলনা ও বিনিময় করার সুবিধে করে দেয়। এই ধরনের শ্রমকে পরিমাণের নিরিখে পৃথক করা যায়; পরিণামে নানা ধরনের মালপত্র বিভিন্ন পরিমাণে বিনিময় করা যায়। এটাই মার্কসকে পণ্যের গুণগত বিশ্লেষণ থেকে এবং যে-শ্রম তাকে উৎপন্ন করে তার থেকে পণ্য বিনিময়-সংক্রান্ত নিয়মের মাত্রাগত বিশ্লেষণের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

যা বলা হয়েছে তা থেকে এটা পরিষ্কার যে মাত্রা সদৃশতার, জিনিসগুলোর অভিন্নতার প্রকাশ—যার কল্যাণে সেগুলোকে বাড়ানো কমানো যেতে পারে, যোগ, ভাগ ইত্যাদি করা যেতে পারে। তাই মাত্রা আকারে, সংখ্যায়, বিষয়গুলোর কোন দিকের বিকাশের নিবিড়তায়, কোন কোন প্রক্রিয়ার প্রবাহের হার, ঘটনাপুঞ্জের দেশ-কালের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। যতই ঘটনাবলী জটিলতর হবে ততই জটিলতর হবে তাদের মাত্রাগত স্থিতি-মাপগুলো (Parameters), আর ততই মাত্রার নিরিখে তাদের বিশ্লেষণ করা কঠিন হবে। এটা বিশেষভাবে সত্য সামাজিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে, যদিও আধুনিক বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমশই বেশি বেশি প্রমাণ মিলছে যে গবেষণার মাত্রাগত গাণিতিক পদ্ধতি সমাজ-জীবনের ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে (এবং ইতিমধ্যেই প্রযুক্ত হচ্ছে)।

মাত্রা এবং গুণের মধ্যেকার মূলগত পার্থক্য হল এইটি যে কোন বস্তু বা বিষয়ের স্বভাবের পরিবর্তন না ঘটিয়ে তার খানিকটা মাত্রাগত ধর্মকে বদলানো যায়। উদাহরণস্বরূপ, কোন জিনিস বৃহৎ বা ক্ষুদ্র হতে পারে, একটা বিশেষ গুণের বস্তু হিসাবে এর উপর তার কোন প্রভাব পড়বে না। অথবা কেউ কোন ধাতুকে না গলিয়ে অর্থাৎ তার সমষ্টিগত অবস্থাকে না বদলিয়ে ঐ ধাতুর তাপ দশ বা কয়েক শত ডিগ্রি বাড়িয়ে দিতে পারে। এর অর্থ কোন জিনিসের মাত্রা এর গুণযুক্ত অবস্থার সঙ্গে তত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নয়। মাত্রাগত সম্পর্কের বিশ্লেষণে কেউ একটা সীমা পর্যন্ত বিষয়বস্তুর গুণকে অগ্রাহ্য করতে পারে। গুণগতভাবে বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণায় বহু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মাত্রাগত গাণিতিক পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার মাত্রার এই বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল।

যাই হোক, মাত্রার পরিবর্তন কেবল একটা নির্দিষ্ট সীমায় প্রত্যেকটি বিশেষ জিনিসের সঙ্গে বাহ্য সম্পর্কের মধ্যে থাকে। কখনও কখনও এই সীমার বাইরে সামান্যতম পরিবর্তনও জিনিসের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়। মাত্রার মধ্যে যে-কোন পরিবর্তনই অবশ্য জিনিসটার উপরে, এর ধর্মের উপরে প্রভাব ফেলে। কিন্তু কেবলমাত্র সেইসব মাত্রাগত পরিবর্তন যা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছায়, তাই মৌলিক গুণগত পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত।

যেমন, মাত্রার উপর গুণের নির্ভরতা খুঁজে পাওয়া যায় পরমাণুর গুণগত বিভিন্নতার মধ্যে। প্রত্যেক ধরনের পরমাণুর সংজ্ঞা নির্ণীত হয় কেন্দ্রকের মধ্যেকার প্রোটনের সংখ্যার দ্বারা, অন্য কথায় অণুর পর্যাবৃত্ত তালিকার (Periodic system of elements) মধ্যে পরমাণুর সংখ্যার দ্বারা। একটা প্রোটন বেশি বা একটা প্রোটন কম—এর মধ্যেই আমরা পাই বিভিন্ন ধরনের পরমাণুকে।

তাই কোন জিনিসের গুণ কোন একটা মাত্রার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। গুণ ও মাত্রার এই সম্পর্ক এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকেই বলা হয় কোন জিনিসের **পরিমাপ**। পরিমাপ প্রত্যয়টি কোন বস্তুর গুণ ও মাত্রার মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ককে প্রকাশ করে। কোনো বস্তুর গুণের ভিত্তি হল একটা বিশেষ মাত্রা এবং ঐ মাত্রাটি হয়ে ওঠে একটা বিশেষ গুণের মাত্রা। এই ধরনের আন্তঃ-সম্পর্কের মধ্যে এই বদল পরিমাপের পরিবর্তন ও বিকাশের কলাকৌশলকে ব্যাখ্যা করে। তাই বিকাশকে কোন স্থির, পরিবর্তনহীন সীমার মধ্যে বোঝা উচিত নয় বরং উচিত নতুনের দ্বারা পুরাতনের অপসারণ হিসেবে, যা আছে তার চিরন্তন ও নিরবচ্ছিন্ন নতুন সৃষ্টির প্রবাহ হিসেবে। একটা কোন স্তরে মাত্রাগত পরিবর্তন এমন একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছায় যখন গুণ ও মাত্রার সামঞ্জস্য অসামঞ্জস্যে পরিণত হয়। এই সন্ধিবিন্দুতে পুরনো গুণগত অবস্থা নতুনের কাছে অবশ্যই নতি স্বীকার করে। এক কথায়, ডায়ালেকটিক বিকাশের সারমর্ম হল এই যে যা আছে তার নবীকরণ হয়ে থাকে।

মাত্রাগত থেকে গুণগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চলে বিপরীত প্রক্রিয়া ; নতুন গুণ জন্ম দেয় নতুন মাত্রাগত পরিবর্তনের। এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ নতুন গুণের অপর মাত্রাগত প্যারামিটারের সঙ্গে নিয়মিত সম্পর্ক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের ধরন যা পুঁজিবাদী উৎপাদন-ধরনের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে নতুন গুণ, তার সামর্থ্য রয়েছে সমাজের উৎপাদন শক্তি ও অন্যান্য দিকগুলোকে দ্রুত হারে ও বেশি মাত্রায় বাড়ানোর।

মাত্রাগত পরিবর্তন ঘটে অবিরামভাবে ও ক্রমগতিতে। গুণগত পরিবর্তন ঘটে ক্রমিকতার ছেদ হিসাবে। এর অর্থ এই যে যেহেতু বিকাশ হল মাত্রাগত ও গুণগত পরিবর্তনের ঐক্য, সেহেতু সেটা একই সঙ্গে ধারাবাহিকতা ও ছেদের ঐক্যও। "...জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে বিকাশের ক্ষেত্রে মন্থর বিবর্তন ও দ্রুত উৎক্রান্তি এবং ধারাবাহিকতার ছেদ—এ সবই অন্তর্ভুক্ত।"[১]

যদি আমরা দুটির ঐক্য (মাত্রা ও গুণ) হিসেবে বিকাশকে অস্বীকার করি, তাহলে আমাদের অবশ্য দুটির মধ্যে একটির সম্ভাব্য কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে সমভাবে ভুল ধারণাকে গ্রহণ করতে হবে। হয় আমাদের বিবেচনা করতে হবে জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যকে, জৈব, অজৈব প্রকৃতির সকল বিভিন্নতাকে. মানুষ সমেত অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎকে—যারা সর্বদাই ছিল বলে এবং কেবলমাত্র মাত্রায় বাড়ছে বলে অথবা আমাদের ধরে নিতে হবে যে এ সমস্তই একটা অলৌকিক কাণ্ডের দ্বারা হঠাৎ সৃষ্টি হয়েছে। এই দুটি ধারণাই বিজ্ঞান ও দর্শনের ইতিহাসে পোষণ করা হত কিন্তু দুটোকেই সমগ্র অগ্রসরমান জ্ঞান ও ঐতিহাসিক প্রয়োগ-কর্মের ধারায় উৎখাত করা হয়েছে।

সমাজ বিজ্ঞানে উভয় মতই ব্যাপকভাবে আছে। শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে সমস্ত সংস্কারপন্থী মতবাদই ধারাবাহিকতার একপেশে অতিরঞ্জনের উপর, বিকাশের মাত্রাগত ক্রমিকতার উপর ভিত্তি করে টিকে আছে. এই তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়েই যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক উপাদান জমতে জমতে সমাজ-বিপ্লব ছাড়াই পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রে "পরিণত" হবে। সংস্কারবাদীদের বিপরীতে নৈরাজ্যবাদীরা ও পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদীরা মাত্রাগত, ধারাবাহিক রূপের বিকাশের তাৎপর্যকে অস্বীকার করে এবং কেবলমাত্র সামাজিক বিপর্যয় ও বিদ্রোহকে স্বীকার করে। শুধু এইভাবেই সামাজিক অবস্থাকে বদলানো যায়, এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার ফলে তারা রাজনৈতিক হঠকারিতার শিকার হয় এবং বিপ্লবী উৎক্রান্তির জন্যে যে অপরিহার্য বিষয়গত অবস্থার দরকার তাকে অবহেলা করে।

ধারাবাহিক মাত্রাগত পরিবর্তনের স্তরে গুণ বদলায় না কিন্তু ঐ ধরনের পরিবর্তনের পূর্বাবস্থা সৃষ্টি করে। অচেতন বস্তু থেকে প্রাণ আবির্ভূত হতে পারতো না যদি পৃথিবীর সলিলাবৃত পরিবেশের মধ্যে ক্রিয়ারত ভৌত ও

১ ভি. আই. লেনিন, কালেকটেড ওয়ার্কস, ১৬শ খণ্ড, ৩৪৯ পৃঃ।

রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলো এর জন্যে ক্রমশ সঠিক অবস্থাকে সৃষ্টি না করতো। সচেতন বস্তুর আবির্ভাব অচেতন পদার্থের মধ্যে কেবলমাত্র আর একটি মাত্রাগত পরিবর্তন সূচিত করে নি, এই পরিবর্তন চিহ্নিত করেছে এর মৌলিক গুণগত পরিবর্তনকে নতুন ধর্ম ও নিয়মবিশিষ্ট সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বস্তুর আবির্ভাবকে। এখানে আমরা পাই বিকাশের মধ্যে একটা উৎক্রান্তি—ক্রমিকতার মধ্যে একটা ছেদ।

সমস্ত গুণগত পরিবর্তন ঘটে উৎক্রান্তি রূপে। কোন একটা প্রক্রিয়া শেষ হয় উৎক্রান্তিতে, যা কোন বস্তুর গুণগত পরিবর্তনের মুহূর্ত, তার বিস্ফোরণ ও তার বিকাশের সংকটকালীন মুহূর্তকে চিহ্নিত করে। এইভাবে বিকাশের সাধারণ সূত্রে একটা নতুন গ্রন্থি যুক্ত হয়। লেনিন লিখেছিলেন, "পুঁজিবাদ নিজের কবর-খননকারী সৃষ্টি করে, নিজেই সৃষ্টি করে একটা নতুন ব্যবস্থার উপাদান, তবু এই সঙ্গে "উৎক্রান্তি" ব্যতীত এইসব স্বতন্ত্র উপাদান সাধারণ পরিস্থিতির মধ্যে কোন বদলই আনতে পারে না এবং পুঁজির শাসনকে প্রভাবিত করতে পারেনা।"[১]

উৎক্রান্তি এমন এক ধরনের বিকাশ যা ক্রমবিকাশের রূপের চাইতে দ্রুত ঘটে। এটা হচ্ছে তীব্র মাত্রায় বিকাশের কাল, যখন পুরনো ও অচল কোনো কিছু পরিবর্তিত হয় এবং নতুনের জন্যে—বিকাশের উচ্চতর রূপের স্তরের জন্যে জায়গা ছেড়ে দেয়। তাই সামাজিক বিপ্লবগুলো সমাজের বৈষয়িক ও আত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে গভীর প্রেরণা সৃষ্টি করে।

নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারকে চিহ্নিত করে—বিজ্ঞানের এমন সব উৎক্রান্তির উপরেও অনুরূপ তাৎপর্য আরোপ করা হয়।

যেহেতু বিকাশ ঘটে ধারাবাহিকতা ও ছেদের (আকস্মিক বিক্ষেপ) ঐক্য হিসেবে এবং একটি পরিমাপ অন্যের কাছে হার মানে বা অন্যতে রূপান্তরিত হয়, তাই বিকাশকে "পরিমাপের সন্ধিরেখা" (হেগেল) বলে ভাবা যায়।

আধুনিক বিজ্ঞান ধারাবাহিকতা ও ছেদের ঐক্য হিসেবে বস্তু ও তাদের বিকাশের মতের সপক্ষে ক্রমবর্ধমান সাক্ষ্য জুগিয়ে দিচ্ছে। বস্তুর যান্ত্রিক, ভৌত, রাসায়নিক এবং অন্যান্য ধরনের গতির মধ্যেকার গুণগত পার্থক্যকে বিজ্ঞান বস্তুর ক্রমপৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে "সন্ধিস্থল" হিসেবে গণ্য করে। এই ধরনের "ধারাবাহিকতার ছেদ" হল বিভিন্ন পর্বের অসম্বন্ধ (ধারাবাহিকতাহীন) অবস্থা (যথা মৌলিক কণা, কেন্দ্রক, পরমাণু, অণু ইত্যাদি)। বিবর্তনমূলক (ক্রমিক) এবং বিপ্লবী (উৎক্রান্তির মতো) রূপের ঐক্যের মধ্যে গড়ে ওঠে সমাজ বিকাশের নিয়ম। ডায়ালেকটিক ধারণা চিন্তার সঙ্গে জড়িত বিজ্ঞানের মধ্যেও অবিচলভাবে পথ করে নিচ্ছে। সামান্যীকরণ, প্রত্যয় ও বিমূর্তন পদ্ধতির দ্বারা চিন্তা-জগতের ইন্দ্রিয়জাত পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বিপুল তথ্যের

১ ভি. আই. লেনিন, কালেকটেড ওয়ার্কস, ১৬শ খণ্ড, ৩৪৮ পৃঃ।

ক্রমিক পুঞ্জীভবন ও গবেষণা "বাধা পায়।" পৃথক পৃথক পর্যবেক্ষণ ও মতামতের বিশৃঙ্খলা থেকে বেরিয়ে আসে প্রকল্প যা পরে রূপান্তরিত হয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে ; যা মনে হয়েছিল বুদ্ধির অগম্য তথ্য, তার উপরে হঠাৎ স্বজ্ঞার অপ্রত্যাশিত আলোকসম্পাত হয়।

মাত্রাগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয় নানাভাবে—বাস্তবতার বিভিন্ন ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। এই রূপান্তরের নির্দিষ্ট রূপ, এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় উল্লম্ফনের গবেষণা হয়ে থাকে বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখায়। দর্শন আমাদের সাহায্য করে এই রূপ-বৈচিত্র্য এবং রূপান্তরগুলোর ধরনের মধ্যে পথনির্দেশ করতে, খুবই বৈশিষ্ট্যমূলক কোন রূপকে পৃথক করতে। দর্শন অবশ্য এমন দাবী করে না যে এই রূপগুলোই পূর্ণাঙ্গ চিত্র, কারণ জটিলতর তত্ত্বের থেকে জীবন অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়।

গুণগত রূপান্তরের উৎক্রান্তির খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সাধারণ রূপগুলো নিম্ন প্রকারের। (১) সুসংহত ব্যবস্থা হিসেবে যখন কোন বস্তুর অন্তর্নিহিত কাঠামো-বিন্যাসের মধ্যে হঠাৎ যেন আঘাতের পর আঘাতে কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে, তখন অপেক্ষাকৃত দ্রুত ও আকস্মিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বস্তু অন্য গুণে রূপান্তরিত যয়।

২) ক্রমিক গুণগত পরিবর্তন—যখন বস্তুটি হঠাৎ ও পুরোপুরি বদলায় না, বরং ক্রমশ জমে-ওঠা মাত্রাগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এর কোন দিক, কোন উপাদান পরিবর্তিত হয় এবং এই রকম পরিবর্তনের ফলে বস্তুর অবস্থান্তর ঘটে।

এইসব বিভিন্ন রূপের নিয়ামক শক্তি কে ? কেন বিভিন্ন রূপে এইসব উৎক্রান্তি ঘটে ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে বিশেষ করে বিকাশমান বস্তুটির বিশেষ লক্ষণের মধ্যেই।

কখনা দ্রুত পরিবর্তনের আকারে গুণের রূপান্তর ঘটে, প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া থেকে আমরা তার বহু দৃষ্টান্ত পাই। সেগুলি হল মোল কণা, রাসায়নিক অণু, রাসায়নিক যোগ, পারমাণবিক বিস্ফোরণের রূপে পারমাণবিক শক্তির প্রকাশ ইত্যাদি গুণগত রূপান্তর। অন্যদিকে, প্রকৃতির মধ্যে এমন সব পদার্থ আছে যাদের আরও জটিল এবং নিখুঁত পদার্থে গুণগত পরিবর্তন দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত এবং সাধারণত তা ঘটে থাকে কেবলমাত্র ক্রমান্বয়ে। কতকগুলি প্রজাতির প্রাণীদের অন্য প্রাণীতে গুণগত রূপান্তর এই রকম একটা দৃষ্টান্ত। সাধারণত এই ধরনের রূপান্তরের ক্ষেত্রে দুই গুণবিশিষ্ট মেরুর মধ্যে অনেকগুলো অন্তর্বর্তী যোগসূত্র থাকে।

কিন্তু গুণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যতই ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হোক না কেন নতুন অবস্থার ক্ষেত্রে রূপান্তর একটা উল্লম্ফন। এঙ্গেলস লিখেছিলেন "সমস্ত

ক্রমিকতা সত্ত্বেও এক ধরনের গতি থেকে আর এক ধরনের গতিতে রূপান্তর সবসময়েই উল্লম্ফনের মধ্যে ঘটে।”[১] এইটাই গুণগত পরিবর্তনকে ক্রমিক পরিবর্তন থেকে পৃথক করে। ক্রমিক পরিবর্তন কোন বস্তুর কতকগুলি পৃথক পৃথক ধর্মের পরিবর্তন ঘটায় বটে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বিন্দু পর্যন্ত বস্তুর গুণের উপর প্রভাব ফেলে না।

যে পর্যন্ত না তারা পুরনো গুণের সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটায় ততক্ষণ গুণগত পরিবর্তনের ক্রমিকতাকে এরকম মনে করা ভুল হবে যে এই পরিবর্তনগুলো যেন নিছক সংখ্যার সমষ্টি, বাস্তবে এই প্রক্রিয়া অনেক বেশি জটিল। এটা শুধু নতুন গুণের উপাদানগুলোর গাণিতিক যোগফল নয়। অধিকন্তু এ একটা ক্রম-পূর্ণতার, কখনও কখনও অনির্ণেয় গুণগত পরিবর্তনের পথ। এ এমন একটা পথ— পুরনো গুণের মধ্যে যার গভীর কাঠামোগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে ; এই পরিবর্তন হচ্ছে চূড়ান্ত পরিণতি অর্থাৎ উল্লম্ফন-প্রক্রিয়ার পূর্ণতার দিকে যে অগ্রগতি ঘটে, সেই··অগ্রগতির ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি অন্তর্বর্তীকালীন স্তর ও পদক্ষেপ।

এই উল্লম্ফনের রূপ কেবলমাত্র বস্তুর স্বভাবের উপর নির্ভর করে না, অধিকন্তু যে অবস্থার মধ্যে বস্তুটির অবস্থান তার উপরেও নির্ভর করে। তাই স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তার পরিস্থিতিতে কতকগুলি পদার্থ, যেমন ইউরেনিয়ামের বিভাজন অতি ধীরে ধীরে ঘটতে থাকে ; আধাবিভাজন ঘটে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। কিন্তু একই প্রক্রিয়া ঘটে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ কালে— তাৎক্ষণিক ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ার জন্যে অনুরূপ বিভাজন প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় এটা প্রতিপন্ন হয় যে, গুণগত পরিবর্তন, উল্লম্ফন সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রেও ঘটে। এর একটা যুক্তিসঙ্গত উদাহরণ হল সমাজ-বিপ্লব—যা অচল সমাজব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আনে। আকস্মিক ও দ্রুত উল্লম্ফনের একটা চমৎকার উদাহরণ হল রাশিয়ার মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

সমাজতন্ত্রের পরিবেশে যে গুণগত পরিবর্তন ঘটে তা শোষণমূলক সমাজে আমরা যে পরিবর্তন লক্ষ্য করি তার থেকে বেশ কিছুটা পৃথক। যেহেতু সমাজতান্ত্রিক সমাজে কোন বৈরী শ্রেণী থাকে না, তাই সেখানে গোটা সমাজটাই বিকাশের প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন আনার জন্যে আগ্রহান্বিত। অধিকন্তু সমাজের বিকাশটাই এগিয়ে চলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়, একটা পরিকল্পনা অনুসারে—সচেতন প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে সামনে উল্লম্ফনের জন্যে এবং সেইজন্যেই একটি গুণগত স্তর থেকে আর একটি গুণগত স্তরে ক্রমপরিবর্তন

১ এফ. এঙ্গেলস, অ্যান্টি-ডুরিং, ৮৩ পৃঃ।

হয়ে ওঠে এখানকার প্রধান রূপ। কিন্তু এর ফলে অন্য ধরনের রূপান্তর বাতিল হয়ে যায় না। বিরাট আবিষ্কার, উৎপাদন-বিকাশের নতুন নতুন প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা অথবা প্রগতিকে দ্রুততর করার জন্যে নতুন ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি-স্বরূপ প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ক্ষেত্রে দ্রুত ও আকস্মিক বিকাশ, ক্রমিক পরিবর্তনের উদাহরণ।

উপরের বক্তব্য মাত্রাগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন এবং তার বিপরীত নিয়মের সারমর্ম ও তাৎপর্য সম্বন্ধে একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত করবার পক্ষে সহায়ক। **এই নিয়মটি কোন বস্তুর মাত্রাগত ও গুণগত দিক-গুলোর আন্তঃসম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়া। এর ফলে প্রথমে অপ্রত্যক্ষ, ক্ষুদ্র পরিবর্তন ক্রমশ পুঞ্জীভূত হতে থাকে—তারপর ক্রমশ সেই বস্তুটির পরিমাপ বদলে যায় এবং সূচিত হয় উৎক্রান্তির মধ্যে দিয়ে গুণগত পরিবর্তন এবং উল্লিখিত বস্তুটির প্রকৃতি এবং বিভিন্ন রূপে সেগুলোর বিকাশের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এটা ঘটে।** বিকাশকে অনুধাবন করার জন্যে এই নিয়মের জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ। এটা মাত্রা ও গুণের বিভিন্ন দিকের ঐক্য হিসেবে ঘটনাবলীকে পরীক্ষা ও অনুশীলন করা এবং এই সকল দিকের জটিল আন্তঃসম্পর্ক ও পারস্পরিক জটিল ক্রিয়া ও তাদের মধ্যেকার পরিবর্তনগুলোকে দেখবার পথনির্দেশক।

৩ বিপরীতের ঐক্য ও সংঘাতের নিয়ম

সকল প্রক্রিয়া ও জিনিসের মধ্যে পরস্পর-বিরোধ সহজাত—পরিমাণ ও গুণের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এই সাধারণ নিয়মেরই একটি অভিব্যক্তি এবং এই বিরোধ তাদের বিকাশের উৎস ও চালিকাশক্তি। লেনিন বিরোধের অনুশীলনকে ডায়ালেকটিকস-এর "কেন্দ্র" বলে অভিহিত করতেন।

বিকাশের দুটি প্রধান ধারণা, বিশেষ করে দ্বন্দ্বের প্রশ্নটি নিয়ে, প্রবলভাবে বিদ্যমান। এই দ্বন্দ্ব দর্শনের ইতিহাসের মধ্যে বরাবরই রয়েছে এবং এটা এখনও দর্শনের বৈশিষ্ট্য।

এরিস্টটল এই প্রশ্নে প্রাচীন দার্শনিকদের মতবাদকে নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করেছিলেন "...এখন প্রায় সব চিন্তাবিদগণই একমত যে জিনিস এবং পদার্থ-সমূহ বৈপরীত্য দিয়ে গড়া; অন্ততপক্ষে সবাই বলেন সূত্রগুলো হল বিপরীত, কেউ জোড় ও বিজোড় আবার কেউ গরম ও ঠাণ্ডা, আরও অনেকে সীমা ও অসীম, কেউ মিত্রতা ও সংঘাতকে মানেন।"[১] গ্রীক দ্বন্দ্ব-সমন্বয়বাদী হেরাক্লিটাস

১ এরিষ্টটল, মেটাফিজিকস্ ইণ্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৬, ৫৭ পৃঃ।

তাঁর কালে বিরোধের প্রশ্নে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেন। যেহেতু সব জিনিসই প্রবহমান এবং পরিবর্তনশীল, তাই তিনি অনুমান করলেন সকল জিনিসের মর্ম নিহিত রয়েছে তাদের বৈপরীত্যের মধ্যে এবং শুধু বিপরীতের সংঘাতের মাধ্যমেই সব কিছু ঘটে থাকে।

যখন সুদীর্ঘকাল ধরে জগৎ সম্বন্ধে আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য বজায় ছিল সেই যুগে জিনিসের বিরোধাত্মক মর্ম সম্বন্ধে এবং বিকাশের ক্ষেত্রে বিরোধের ভূমিকার প্রশ্নটি ভুলভাবে আলোচিত হয়েছে, যদিও কোন কোন দার্শনিক এই বিষয়ে কিছু পর্যালোচনা উপস্থাপিত করেছেন। হেগেল দ্বন্দ্বের ডায়ালেকটিক তত্ত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান অবদান রেখেছেন। কিন্তু এই সমস্যা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা ভাববাদে আচ্ছন্ন। কেবলমাত্র মার্কসবাদই হেগেলীয় দর্শনের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে দ্বন্দ্ব সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দিতে সক্ষম হয়েছে।

অনেক আধুনিক বুর্জোয়া দার্শনিক ঘটনাবলীর দ্বান্দ্বিক মর্মকে সরাসরি অস্বীকার করেন। তাঁদের ধারণা আমাদের চিন্তাধারাই শুধু দ্বন্দ্বাত্মক হতে পারে, আর চিন্তা-নিরপেক্ষ বহির্বস্তুর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

চিন্তা-জগতের দ্বন্দ্ব অথবা সময় সময় সেগুলোকে যেমন বলা হয় "যুক্তির অসঙ্গতি" তা নিশ্চয়ই দেখা দেয় কিন্তু সেগুলো হল যুক্তির অসামঞ্জস্য ও যৌক্তিক ভ্রান্তির ফল। যখন আমরা একই মুহূর্তের একটিমাত্র ঘটনা সম্বন্ধে, একই প্রসঙ্গে সামঞ্জস্যহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি (যেমন, টেবিলটা গোলাকার ও গোলাকার নয়) তখন এই রকম দ্বান্দ্বিক ধারণাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে এই ধরনের দ্বন্দ্বের প্রকাশ তাদের ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতার পরিচায়ক। একই সঙ্গে ভাবধারার দ্বন্দ্বের মধ্যে ঘটনাবলীর মধ্যেকার বিষয়গত দ্বন্দ্বও প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে—যে দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আমরা তখনও অবহিত নই। এই ধরনের দ্বন্দ্বকেই ডায়ালেকটিকস-এর বিরোধীরা স্বীকার করতে চান না।

জগতে কোন সম্পূর্ণ অভিন্ন বস্তু বা ঘটনাবলী নেই। যখন আমরা কয়েকটি বিষয়ের সাদৃশ্য বা অভিন্নতার কথা বলি তখন তাদের সাদৃশ্যটাই আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে তারা কতকগুলো দিক থেকে আলাদা, বিসদৃশ, তা না হলে তাদের মধ্যে তুলনা করার কোন অর্থ নেই। এর অর্থ হল, সরলভাবে দুটি জিনিসের বাহ্যিক তুলনার মধ্যেও তাদের অভিন্নতা ও পার্থক্যের ঐক্য প্রকাশ পায়। প্রত্যেক জিনিসই একই সঙ্গে অপর জিনিসের সঙ্গে অভিন্ন এবং তা সত্ত্বেও তার থেকে পৃথক। এই সহজ অর্থে অভিন্নতা বিমূর্ত কিছু নয়, এ এমন একটা মূর্ত অভিন্নতা—যার মধ্যে পার্থক্যের একটা উপাদান বর্তমান। এঙ্গেলস এই ধারণাটিকে এইভাবে প্রকাশ করেছেন "শুরু থেকেই অভিন্নতার মধ্যে তার পরিপূরক হিসেবে অন্য সব কিছু থেকে যে পার্থক্য থাকে তা

সুস্পষ্ট।"[১] কোন বস্তু শুধু অন্য বস্তুর থেকেই পৃথক নয়, তার নিজের সম্পর্কের মধ্যেও একটা পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থাৎ বস্তুটির সঙ্গে আমরা অন্য কিছুর তুলনা করি বা না করি, তার নিজের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের অস্তিত্ব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি জীবদেহে অভিন্নতা এবং বৈসাদৃশ্যের ঐক্য রয়েছে। তা শুধু এই কারণেই নয় যে, অন্যান্য জীবদেহ থেকে সে অভিন্ন ও পৃথক, উপরন্তু এই কারণেও যে জীবনধারার মধ্যে দিয়ে সে নিজেকে অগ্রাহ্য করে চলেছে, বা সোজাসুজি বললে সে নিজের অন্তিমকাল, মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ডায়ালেকটিকস যখন বলে একটি বস্তু একই সঙ্গে আছে ও নেই, বস্তুটির নিজের মধ্যে রয়েছে তার স্বকীয় অনস্তিত্ব, তখন এই অর্থেই তাকে বুঝতে হবে: একটা বস্তু হল স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তন, ইতিবাচক ও নেতিবাচক, জীবনে উদীয়মান ও অপসৃয়মান উপাদানের ঐক্য।

এর অর্থ এই যে কোন বস্তু ও ঘটনা একটি বিপরীতের ঐক্য। এই গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটির তাৎপর্য হল, সমস্ত বস্তুর মধ্যে বিপরীত দিক ও ঝোঁক সহজাত। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব যে-কোন বস্তু বা প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত কাঠামোর অচ্ছেদ্য ধর্ম। উপরন্তু, প্রত্যেক বস্তু বা বস্তু-সমষ্টির মধ্যে এমন বিশেষ বিশেষ ধরনের বিরোধ রয়েছে যাকে সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণের সাহায্যে আবিষ্কার করতে হয়। কিন্তু ঘটনাবলীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের নিছক স্বীকৃতি বিপরীতের ঐক্য-সংক্রান্ত প্রত্যয়টিকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করে না। সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য, বিপরীত উপাদানগুলোর পারস্পরিক ক্রিয়া ও তাদের কাঠামোবিন্যাসকেও বিচার-বিবেচনার মধ্যে আনা দরকার। এই কাঠামো-বিন্যাস এমন ধরনের যে গোটা জিনিসটার প্রত্যেকটি দিক তার অস্তিত্বের জন্যে বৈপরীত্যের উপর নির্ভরশীল এবং এই দ্বৈততা নিছক তাদের বাহ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। বিকাশমান সমগ্র সত্তাটির বিপরীত দিক ধর্ম এবং ঝোঁকগুলোর আন্তঃসম্পর্ক, পারস্পরিক নির্ভরতা ও পারস্পরিক ক্রিয়াশীলতা বিপরীত উপাদানের ঐক্যের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু বিপরীত উপাদানগুলোর পারস্পরিক নির্ভরতা ডায়ালেকটিক বৈপরীত্যের কেবলমাত্র একটি বৈশিষ্ট্যের বিশেষ দিক। এর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পারস্পরিক নেতিকরণ। কারণ কোন সমগ্রতার দুটি দিক পরস্পরের বিপরীত—তারা কেবল আন্তঃসম্পর্কিতই নয় অধিকন্তু পরস্পর ভিন্নমুখী এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। এই উপাদানটি বিপরীতের সংঘাত সংক্রান্ত প্রত্যয়টির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

সামান্যীকৃত রূপে এই প্রত্যয়টির দ্বারা সকল প্রকার বিপরীত শক্তির

১. এফ. এঙ্গেলস, ডায়ালেকটিকস অব নেচার, ২১৫ পৃঃ

পারস্পরিক নেতিকরণ ও বর্জন বোঝানো হয়। কতকগুলো ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ সামাজিক জীবনে এবং খানিকটা জৈব প্রকৃতিতে বিপরীত শক্তির পারস্পরিক বর্জনের ধারণাটি আক্ষরিক অর্থেই "সংঘাত" শব্দটির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এই ধরনের একটা দৃষ্টান্ত হল সমাজের সকল শ্রেণীর ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংগ্রাম। অজৈব প্রকৃতিতে "বিপরীতের সংঘাত" কথাটি প্রধানতঃ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। তবে সংঘাতটি যে-নির্দিষ্ট রূপই ধারণ করুক না কেন, আসল বিষয় হল এই যে দ্বান্দ্বিক বিরোধের নিহিতার্থ বিপরীত শক্তির পারস্পরিক নেতিকরণ এবং এ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ; কারণ বিপরীতের সংঘাতই হল চালিকা শক্তি, বিকাশের উৎস। এই কারণেই লেনিন ডায়ালেকটিক বিকাশের এই রকম সূত্র দিয়েছেন, "বিকাশ হল বিপরীতের 'সংঘাত'।"[১]

ডায়ালেকটিক বিরোধের প্রত্যেকটির উপাদান—বিপরীতের "ঐক্য" ও "সংঘাতের" উপাদানগুলো সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে। লেনিন নিম্নলিখিত ভাষায় সিদ্ধান্তটি প্রকাশ করেছেন, "বিপরীতের ঐক্য (সমাপতন, অভিন্নতা, সমক্রিয়তা) হল শর্তসাপেক্ষ, সাময়িক, পরিবর্তনশীল, আপেক্ষিক। পরস্পরের সঙ্গে বিরোধযুক্ত বিপরীত-গুলোর সংঘাতই চূড়ান্তই বিষয়, যেমন চূড়ান্ত হল বিকাশ ও গতি।"[২] এর অর্থ এই যে, বিপরীত শক্তির সংঘাতের স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ বিপরীতের ঐক্যসম্পন্ন বস্তুটির অস্তিত্ব থাকে না এবং সেই বিশেষ বস্তুর সহজাত একটি নতুন বিপরীত শক্তির ঐক্যসম্পন্ন নতুন বস্তুর আবির্ভাব ঘটে।

ডায়ালেকটিক বিরোধের সারমর্মকে বিপরীত উপাদানগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও আন্তঃযোগাযোগ হিসেবে সূত্রায়িত করা যায়, যার মধ্যে ঐ বিপরীত শক্তিগুলো নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে ও পরস্পরকে অস্বীকার করে এবং তাদের মধ্যেকার সংঘাত চালিকা শক্তি ও বিকাশের উৎস হিসেবে কাজ করে। এই কারণেই আলোচ্য নিয়মটি **বিপরীতের ঐক্য ও সংঘাতের নিয়ম** হিসাবে পরিচিত।

এই নিয়ম ডায়ালেকটিক বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করে ঃ গতির সৃষ্টি ও বিকাশ হয় স্বকীয় গতি ও আত্মবিকাশ হিসেবে। এই প্রত্যয়টি বস্তুবাদের পক্ষে খুবই প্রাসঙ্গিক। এর অর্থ এই যে জগৎ বিকশিত হচ্ছে বাহ্যিক কারণের কার্য হিসেবে নয় বরং স্বকীয় নিয়মের গুণে, খোদ বস্তুটিরই গতির নিয়মে। এর ডায়ালেকটিক তাৎপর্য এইখানেই যে, এটা দেখিয়ে দেয় উৎসকে, ঘটনার চালিকা শক্তিকে দেখতে পাওয়া যাবে তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মধ্যে। অতীতে যে সমস্ত বস্তুবাদীরা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলোকে প্রভাবিত

১. ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ৩৬০ পৃঃ।

২. ঐ।

করবার স্থায়ী উপাদান হিসাবে কোন অতি-প্রাকৃত শক্তিকে বর্জন করতেন, তাঁদেরও ঘুরে-ফিরে আসতে হত রহস্যময় আদি প্রেরণার কাছে, যাকে বস্তুর গতি-সঞ্চারক বলে মনে করা হত।

প্রকৃতির গতি অথবা বিকাশ আসলে বস্তুর স্বকীয় গতি, আত্মবিকাশ। এই ডায়ালেকটিক মতবাদ থেকে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেন বহু আধুনিক বুর্জোয়া দার্শনিক বস্তুর দ্বন্দ্বাত্মক সারমর্ম সংক্রান্ত বক্তব্যটির ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। বিকাশকে এইভাবে বুঝলে প্রকৃতির বাইরে "অতীন্দ্রিয়," রহস্যময় "সৃজনী শক্তির" আর কোন স্থান থাকে না।[১]

কিছু বুর্জোয়া দার্শনিক দ্বন্দ্বকে স্বীকার করেন, যেমন পুঁজিবাদী সমাজের দ্বন্দ্ব। কিন্তু সেগুলোকে মনে করা হয় চিরন্তন, মীমাংসাতীত, বিয়োগান্ত ইত্যাদি বলে। অন্যেরা, বিপরীত দিক থেকে এইসব দ্বন্দ্বকে তুচ্ছ করতে চান ও এড়িয়ে যান। এই ক্ষেত্রে নানারকম দৃষ্টিকোণ রয়েছে, কিন্তু ডায়ালেকটিকস-বিরোধী তাৎপর্যের দিক থেকে সবাই সমান।

সমস্ত পদার্থ ও প্রক্রিয়ার মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সহজাত এবং প্রকৃতি ও সমাজের আত্মবিকাশের চালিকা শক্তি—এটাকে স্বীকার করে বস্তুবাদী ডায়্যালেকটিকস এই প্রক্রিয়া কীভাবে বিকশিত হচ্ছে তার ব্যাখ্যা করে।

দ্বন্দ্ব এমন কিছু নয় যা অনড় ও অপরিবর্তনীয়। একবার সৃষ্টি হলে বিশেষ দ্বন্দ্বটির বিকাশ ঘটতে থাকে এবং নির্দিষ্ট স্তরগুলোর মধ্য দিয়ে চলে! যতক্ষণ না কোন ঘটনার দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায় ও তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে, ততক্ষণ ঐ ঘটনা অন্তর্হিত হয় না বা আর একটি ঘটনার দ্বারা অপসারিত হতে পারে না। কারণ শুধু এইরকম বিকাশের প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই নতুন গুণগত স্তরে উৎক্রান্তির পূর্বশর্ত সৃষ্টি হয়।

এই প্রক্রিয়ার দুটো মূল স্তর আছে:

(১) বস্তুর সহজাত বিরোধগুলোর বিকাশ ও তার অভিব্যক্তির স্তর;

(২) এই সকল বিরোধ সমাধানের স্তর।

যখন প্রথমে দ্বন্দ্বের বিকাশ শুরু হয় তখন দ্বন্দ্বের প্রকৃতিটা পার্থক্যগত অর্থাৎ তখনও দ্বন্দ্ব পুরোপুরি নিজেকে প্রকাশ করে নি। এই পার্থক্য তারপর

উদাহরণস্বরূপ, নিও-থমিষ্ট দার্শনিক হেলমুট অজিয়েরম্যান 'মেটিরিয়্যালিষ্টশে ডায়ালেকটিক' বইতে মার্কসবাদী পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিতর্ক তুলে এই মত প্রকাশ করেছেন যে আত্মবিকাশের নীতির ভিত্তিতে প্রকৃতির ছোট বা বড় পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা ভুল। অজিয়েরম্যানের আধিবিদ্যক প্রত্যয় অনুযায়ী অচেতন ও সচেতন পদার্থ বস্তু ও অবস্তু (মনোগত) সম্পূর্ণভাবে বিপরীত। তাদের মধ্যেকার বিরাট ব্যবধান কোন প্রাকৃতিক সেতুই জুড়ে দিতে পারে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অবস্তু (মানস) কোন বস্তু থেকে বিকাশের একটি উচ্চস্তরে আবির্ভূত "উচ্চতর অস্তিত্বসম্পন্ন সত্তা" অর্থাৎ কোন রহস্যময় শক্তির ক্রিয়া]

প্রকট বিরোধে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে ; তখন এই পার্থক্যবিশিষ্ট বিপরীত পক্ষগুলো আর পূর্বতন ঐক্যবন্ধ কাঠামোর মধ্যে থাকতে ক্রমশই অপারগ হয়। বিকাশের এই স্তরের দ্বন্দ্বকে মার্কসের ভাষায় বলা যায়, "চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব।" এই স্তরে বিপরীত শক্তিগুলোর সম্পর্ক "একটি গতিশীল সম্পর্ক যা অপ্রতিহত গতিতে তার সমাধানের দিকে এগিয়ে যায়।"[১]

মার্কসের "পুঁজি" গ্রন্থটি এই ধরনের বিকাশ ও সামাজিক ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিকতা প্রয়োগের একটি আদর্শ উদাহরণ। মার্কস দেখিয়েছেন যে পুঁজিপতিরা সর্বাধিক মুনাফার প্রয়াসে এমন একটা কিছু সৃষ্টি করতে বাধ্য হয় যার নির্যাস হল সামাজিক উৎপাদন। কিন্তু উৎপাদন যতই সামাজিক হয়ে ওঠে ততই পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে তার সংঘাত বাধে, আর ততই সামাজিক, সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির দ্বারা এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি অপসারিত হওয়ার তীব্র প্রয়োজন সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় স্তর হল দ্বন্দ্বের সমাধানের স্তর, এখানে বিকাশের প্রক্রিয়া ও বিপরীত উপাদানের সংঘাতের স্বাভাবিক পরিণতি ঘটে।

যেখানে গোটা পূর্বতন প্রক্রিয়া ঘটে ঐক্যের কাঠামোর মধ্যে, বিপরীত আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে—সেখানে দ্বন্দ্বের সমাধানের স্তর এই ঐক্যের অপসারণ, এর অন্তর্ধানকে চিহ্নিত করে, যা বস্তুর মৌলিক গুণগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস দ্বন্দ্বের সমাধানের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। তাই এটা কিছু আশ্চর্য নয় যে, সাচ্চা প্রগতিশীল শক্তির, বিশেষ করে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর হাতে এটা জ্ঞান লাভ ও জগতের বৈপ্লবিক রূপান্তরের একটা শক্তিশালী হাতিয়ারের কাজ করে। রুশিয়ায় বিপ্লবী গণতন্ত্রী আলেকজান্দার হাবজেন ডায়ালেকটিকসকে বলতেন, "বিপ্লবের বীজগণিত।"

বিভিন্ন দ্বন্দ্বের চরিত্র, তাদের বিকাশ এবং সমাধানের রূপগুলো জৈব ও অজৈব প্রকৃতিতে, প্রকৃতি ও সমাজের উভয় ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক হতে পারে না। ডায়ালেকটিকস সমস্ত সম্ভাব্য দ্বন্দ্বের "চালিকা" বলে নিজেকে দাবী করে না। বরং এর কাজ হল বস্তু ও ঘটনাবলী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির একটি "পদ্ধতি" বাতলে দেওয়া। বিশেষ বিষয়ের বিশেষ বিরোধ কী, আর তার সমাধানই বা কী—এ প্রশ্নের মীমাংসা করবেন জ্ঞানের যথোপযুক্ত ক্ষেত্রের বিজ্ঞানীরা। এই সঙ্গে একথা ধরে নেওয়া ভুল হবে যে, ডায়ালেকটিকস-এর খুব সাধারণ নিয়ম ও মূল প্রত্যয়গুলো বিকশিত হয় না এবং নতুন পরিস্থিতি ও নতুন তথ্যের আলোকে আরও বেশী মূর্ত হয়ে ওঠে না। খোদ দ্বন্দ্ব-সংক্রান্ত মূল প্রত্যয়টি থেকেই এটা দেখা যেতে পারে।

১ কার্ল মার্কস. ইকনমিক এণ্ড ফিলসফিক ম্যানাসক্রিপ্টস ১৮৪৪ ৯৮ পৃঃ

সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি হওয়ার পর এই মূল প্রত্যয়টিকে আরও বিশেষভাবে প্রকাশ করার তাগিদ দেখা দিল। মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা অবশ্যই জানতেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে দ্বন্দ্বের চরিত্র হবে অন্য রকমের এবং তাঁরা প্রায়ই এটা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রশ্নটি তত্ত্ব ও বাস্তবের দিক থেকে চূড়ান্ত তাৎপর্য অর্জন করল যখন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার কাজ হয়ে উঠল প্রয়োগের বিষয়। এই কারণেই লেনিন এটাতে এতখানি গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন। বুখারিনের "উত্তরণ পর্বের অর্থনীতি" গ্রন্থে দ্বন্দ্বের প্রত্যয়টিকে পৃথকভাবে বিচার না করে বৈরিতার সঙ্গে অভিন্ন হিসেবে দেখান হচ্ছিল, লেনিন ঐ গ্রন্থটির সমালোচনামূলক মন্তব্যে এটা দেখান যে, বৈরিতা ও দ্বন্দ্ব এক জিনিস নয়, আর বৈরিতা সমাজতন্ত্রে বিলুপ্ত হয় কিন্তু দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব থাকে।

বৈর রূপের দ্বন্দ্ব হল সেইসব শত্রুভাবাপন্ন সামাজিক শক্তি ও শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব, যাদের লক্ষ্য ও স্বার্থের মধ্যে মূলগত বিরোধ রয়েছে। ক্রীতদাস ও দাস-মালিক, ভূমিদাস ও সামন্তপ্রভু, প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া—এই ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীগুলোর মধ্যেকার সম্পর্ক এই বৈরিতার বিশিষ্ট প্রকাশ। প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক কাঠামো এবং সমাজের অন্যান্য দিকের দ্বান্দ্বিক বিকাশের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কথা প্রযোজ্য। বৈরিতা মূলক দ্বন্দ্বের চরিত্র তাদের বিকাশ ও সমাধানের রূপকেও নিয়ন্ত্রণ করে। উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে এটা দ্বন্দ্ব তীব্রতর ও গভীরতর হওয়ার সঙ্গে জড়িত এবং দুটি বিরোধী পক্ষের তীব্র ঘাত-প্রতিঘাত ও তাদের মেরুভবনের মধ্যে দিয়ে এই দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটে। তাই এই ধরনের দ্বন্দ্বের সমাধানের উপায় হল অবিচল শ্রেণী-সংগ্রাম ও সমাজবিপ্লব—যার মধ্যে দিয়ে ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণীগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। যেসব শ্রেণী ও সামাজিক শক্তির জীবন-ধারণের অবস্থা তাদের সমষ্টিগত মৌলিক লক্ষ্য ও স্বার্থকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের মধ্যে উদ্ভূত দ্বন্দ্বই অবৈর দ্বন্দ্ব। এই ধরনের দ্বন্দ্ব রয়েছে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে—শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন শক্তির মধ্যে। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি, সমাজতন্ত্রের অধীনে রাষ্ট্র এবং অন্যান্য ধরনের সামাজিক জীবনের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের কমিউনিস্ট সমাজে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যেকার দ্বন্দ্বও অবৈর চরিত্রের। এই ধরনের সামাজিক জীবনের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের কমিউনিস্ট সমাজে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যেকার দ্বন্দ্বও অবৈর চরিত্রের। এই ধরনের দ্বন্দ্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, এইসব বিরোধী দিকও ঝোঁকের পরস্পরের বিপরীত প্রান্তে গিয়ে শত্রুতার চরম বিন্দুতে যাবার মত কোন বাস্তব প্রয়োজন নেই। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের দ্বারা যেসব অবস্থার মধ্যে সেগুলো সৃষ্টি হয়, তার পরিবর্তন করে এবং শিক্ষামূলক কাজ ইত্যাদির সাহায্যে সমগ্র সমাজের ঐক্যের স্বার্থে ঐসব দ্বন্দ্বের ক্রমশ নিরসন করা সম্ভব।

সমাজতন্ত্রের অধীনে অবৈরিতামূলক দ্বন্দ্বের বিকাশ ও তার নিরসনের আর একটি অপরিহার্য দিক হল, এখানে স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিগুলো আর সমাজের নিয়ামক শক্তি নয়, বরং মানুষের সচেতন ইচ্ছা ও কার্যকলাপ—কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—যাদের মধ্যে দিয়ে ভাষা পাচ্ছে সামাজিক প্রগতির বিষয়গত প্রয়োজন, তারাই নিয়ামক শক্তি। তাই সময় থাকতেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাতেই তার নির্ধারণ ও তার মীমাংসার সম্ভাবনা রয়েছে। এইসঙ্গে সমাজতন্ত্রের অধীনে সমাজ-বিকাশ মানুষের সচেতন ক্রিয়াকলাপের উপর ক্রমশ নির্ভরশীল হওয়ায় নানা ধরনের বিপজ্জনক আত্মগত ঝোঁক সৃষ্টি হয়, যা তখনকার বিষয়গত দ্বন্দ্বগুলোকে, পূর্ব-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তাকে এবং ঐসব দ্বন্দ্ব সমাধানের উপযোগী পরিস্থিতি সৃষ্টি করার কাজকে অগ্রাহ্য করে। তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশে বিজ্ঞানভিত্তিক নীতির তাৎপর্য বিরাট।

কিন্তু এই বিষয়টি আমাদের নজর এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয় যে, বৈর ও অবৈর দ্বন্দ্বের মধ্যে যত গভীর পার্থক্যই থাক না কেন, তাদের মধ্যে কোন চিরস্থায়ী পর্বত-প্রমাণ ব্যবধান নেই। লেনিন প্রায়ই এটা গুরুত্ব দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে অবৈর দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে একটা ভুল নীতি এটাকে গভীরতর ও তীব্রতর করতে পারে এবং কতকগুলো পরিস্থিতিতে অবৈর দ্বন্দ্ব বৈর দ্বন্দ্বের বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে। যদিও তাদের স্বভাবের অংশ নয় তবুও ভুল ব্যবহারিক কাজকর্ম ও রাজনৈতিক লাইন থেকে এ ধরনের ঝোঁক সৃষ্টি হতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক বিকাশের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মধ্যে এই অনিষ্টকর ভ্রান্তি প্রকাশ পেয়েছে যে, নতুন অবস্থায় সমাজ সমস্ত ধরনের বিরোধ মুক্ত অথবা এই বিরোধগুলো তাদের অবৈর স্বভাবের জন্যে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। পুরনো পুঁজিবাদী সমাজ থেকে আসা দ্বন্দ্ব—যার থেকে মুক্ত হতে নতুন সমাজের কিছুটা সময় লাগবে, তাছাড়াও খোদ সমাজতান্ত্রিক সমাজ-বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যেই কতকগুলো দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় যা ঐ সমাজেরই বৈশিষ্ট্য ; কার্যত ওগুলো ছাড়া কোন প্রগতি সম্ভব নয়। "বর্তমানকালের সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া তার সাফল্য ও সম্ভাবনা ও সমস্ত সমস্যা সমেত এখনও পর্যন্ত একটি নবীন ও বাড়ন্ত সামাজিক সংগঠন, যেখানে অনেক কিছুই সুস্থির নয় এবং যেখানে এখনও অনেক কিছুই পূর্বেকার ঐতিহাসিক যুগের চিহ্ন বহন করছে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে এবং অবিরাম উন্নত হচ্ছে। এর বিকাশ তাই স্বাভাবিক-ভাবেই নতুন ও পুরাতনের মধ্যে দিয়ে, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সমাধানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।"[১]

ইতিহাসের বাস্তব অভিজ্ঞতা সমস্ত রকম অচলতা, অগভীরতা ও আত্ম-

১. সি. পি. এস. ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট—২৫তম সি. পি. এস. ইউ. কংগ্রেস, মস্কো. ১৯৭৬; ১৮ পৃঃ।

সন্তুষ্টির বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী হাতিয়ার নির্মাণ করেছে। এই হাতিয়ার হল সমাজতান্ত্রিক সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা। এই সম্বন্ধে কার্ল মার্কস তাঁর সময়ে বলেছিলেন যে একটা প্রকৃত বিপ্লবের একমাত্র তখনই সাফল্যজনক অগ্রগতি সম্ভব, যখন সেটা নিরন্তরভাবে কঠোর সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে।

দ্বন্দ্বের রূপগুলোর মধ্যেকার পার্থক্য তাদের বিভিন্ন সামাজিক চরিত্রের মধ্যে পাওয়া যাবে না। প্রত্যেকটি জিনিস, বিশেষ করে সমাজের মতো একটা জটিল সংগঠন হল দ্বন্দ্ববিশিষ্ট সামগ্রিক ব্যবস্থা—যার মধ্যে কাঠামোগত আন্তঃ-সম্পর্ক বিদ্যমান। এই ধরনের কাঠামোগত দ্বন্দ্বগুলো হতে পারে মৌল বা অ-মৌল, মুখ্য বা গৌণ, অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক ইত্যাদি।

মৌল দ্বন্দ্ব বলতে সেইগুলোকে বুঝতে হবে যেগুলো কোন বিষয় যা বস্তুর বৈশিষ্ট্যসূচক ও উদ্ভব থেকে বিলয় পর্যন্ত বস্তুটিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেইটাই অন্যান্য অ-মৌল দ্বন্দ্বকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

সমাজ বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরেই মুখ্য দ্বন্দ্ব থাকে—যে দ্বন্দ্ব সেই নির্দিষ্ট স্তরের অপরিহার্য সত্তার নিয়ামক শক্তি। উদাহরণস্বরূপ, রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে মুখ্য দ্বন্দ্ব ছিল একাধারে জমিদারী ব্যবস্থা ও জার স্বৈরতন্ত্র এবং অন্যদিকে তাদের বিরোধী সমস্ত শক্তি, বিশেষতঃ শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যে। একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে বিকাশের গতিপথে কোন দ্বন্দ্ব পরিবর্তিত হতে পারে এবং একটা স্তরে যে-দ্বন্দ্ব ছিল গৌণ, নতুন অবস্থায় সেটা হয়ে উঠতে পারে মুখ্য। তাই ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর্বেও প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল কিন্তু তখন সেটা মুখ্য দ্বন্দ্ব নয়। একমাত্র ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরেই ওটা মুখ্য দ্বন্দ্ব হয়ে উঠল। মুখ্য ও গৌণ দ্বন্দ্বের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ণয় আমাদের কাজের সঠিক অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে এবং লেনিনের নির্দেশ মত অগ্রগতির বস্তুগত ধারা অনুসারে সঠিক শ্লোগান দিতে সাহায্য করে।

অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পার্থক্য কী? দর্শনে এমন সব তত্ত্ব আছে যা বাহ্যিক সম্পর্কযুক্ত বিষয় ও শক্তির মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে নিছক পারস্পরিক সম্বন্ধের পরস্পরের মধ্যেকার সংঘাত বলে মনে করে। এগুলো যান্ত্রিকতাবাদী তত্ত্ব "ভারসাম্যের তত্ত্ব।" এই তত্ত্বে জিনিসগুলোকে স্থির অবস্থায়, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বমুক্ত বলে মনে করা হয়, ফলে স্বকীয় গতি ও আত্মবিকাশ হিসেবে গতির ডায়ালেকটিক উপলব্ধি অস্বীকৃত হয়।

যে কোন বস্তু, আপেক্ষিকভাবে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়ার ফলে তার নিজেরই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব রয়েছে, সেটাই আসলে তার বিকাশের উৎস। এই ধরনের বহু বিষয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বগুলো হল বাহ্যিক দ্বন্দ্ব। এগুলো অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং পারস্পরিকভাবে ক্রিয়াশীল। যদি আমরা কোন

বিষয়কে একটা আরও বড় কোন ব্যবস্থার উপাদান হিসেবে গণ্য করি, যার মধ্যে আরও অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত, তাহলে এইসব বিষয়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব হয়ে পড়ে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব অর্থাৎ ঐ নির্দিষ্ট বৃহৎ ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব। উদাহরণস্বরূপ, সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক হল বাহ্যিক দ্বন্দ্ব। কিন্তু যেহেতু পরস্পরবিরোধী ব্যবস্থাগুলো আরও ব্যাপক, সর্বাত্মক—সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার অংশ, তাই ওগুলো সমকালীন বিশ্ব-বিকাশের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বিভিন্ন দিক। এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই হচ্ছে মুখ্য ও মৌল দ্বন্দ্ব যা আমাদের যুগের সামাজিক ঘটনাবলীর বিকাশধারার নির্ধারক শক্তি।

আমাদের জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রে বিপরীত শক্তির ঐক্যের নিয়মটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেনিন লিখেছেন, "জগতের সকল প্রক্রিয়ায় জ্ঞানের শর্ত হল… বিপরীতের ঐক্য হিসেবে তাদের বাস্তব জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান।"[১]

কেমন করে মানুষের প্রত্যয়ের মাধ্যমে গতি, পরিবর্তন এবং এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় উত্তরণকে প্রকাশ করা যায়, এই দুরূহ প্রশ্নটি বিজ্ঞান ও দর্শনের সমস্ত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জস্বরূপ ছিল এবং এখনও সেগুলো তাদের চ্যালেঞ্জের বিষয়।

কতকগুলো তত্ত্ব অনুসারে মানুষের ধ্যানধারণা শুধু পরিবর্তনশীল বস্তুসমূহের স্থির প্রতিবিম্ব, আলোকচিত্র মাত্র এবং এটাকে জ্ঞানের একটা প্রাচীর বলে মনে করা হয়। তাই এই সিদ্ধান্ত টানা হয় যে, বিভিন্ন বস্তু ও তাদের সম্বন্ধে জ্ঞানের মধ্যে সর্বদাই একটা মীমাংসাতীত দ্বন্দ্ব থাকবে এবং কোন একটা অজ্ঞেয় তাৎক্ষণিক অনুভূতিই শুধু (মরমী স্বজ্ঞা) গতিকে প্রকাশ করতে পারে।

ডায়ালেকটিকস এটা প্রতিপন্ন করে যে, সত্য ও মূর্ত ভাবনা বিরোধের ভাষায় চিন্তা করতে পারে—ঘটনাবলীর বিরোধী দিকগুলোকে তাদের ঐক্যের সূত্রে ভাবতে পারে। এটা শুধু দ্বন্দ্বের একটা দিককেই কেবল দেখতে এবং একে অনড় ও নিশ্চল প্রত্যয়ের মধ্যেই আবদ্ধ করতে পারে তা নয়, বরং দ্বন্দ্বের সকল দিককে শুধু তাদের বিন্যাসের ক্ষেত্রেই নয়, তাদের সম্পর্কগুলোকে, তাদের পারস্পরিক ক্রিয়াশীলতাকেও দেখতে সক্ষম। এর অর্থ এই যে প্রত্যয়গুলোকে হতে হবে ডায়ালেকটিক অর্থাৎ যে বিষয়গুলোকে তারা প্রতিবিম্বিত করছে তাদের মতই গতিশীল, নমনীয়, পরিবর্তনশীল আন্তঃ-সম্পর্কিত ও পারস্পরিক অনুপ্রবেশযুক্ত।

লেনিন উল্লেখ করেছেন মানুষের প্রত্যয়গুলোকে অবশ্যই হতে হবে, "বিপরীতের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ" অর্থাৎ তারা অবশ্যই একটা ভাবরূপ গড়ে তুলবে বিপরীতগুলোর আসল দ্বন্দ্ব, সম্পর্ক, পরস্পর-ক্রিয়াশীলতা এবং রূপান্তর

১ ভি. আই. লেনিন, কালেকটেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ৩৬০ পৃঃ।

ইত্যাদিগুলো থেকে। উদাহরণস্বরূপ, গণতান্ত্রিকতা ও কেন্দ্রিকতা, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রত্যয়গুলোকে বিচার করা যাক। এগুলো আমরা সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশকে বিশ্লেষণ করবার সময় প্রায়ই ব্যবহার করি। যদি আমাদের চিন্তা ওগুলোকে অনড়, নিশ্চল ও অসংলগ্ন প্রত্যয় বলে মনে করে তাহলে তা সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃত ডায়ালেকটিক বিকাশ থেকে সরে যাবে—যেখানে এই সব প্রত্যয়ের মধ্যে প্রকাশিত বাস্তব প্রক্রিয়াগুলো পরস্পর-সম্পর্কিত এবং একটি ঐক্যসূত্রে বাঁধা। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে। অর্থনীতি ও রাষ্ট্রগঠনে কেন্দ্রিকতা গণতান্ত্রিকতার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ এবং ঐ দুটি বিপরীতকে এমনভাবে যুক্ত করা আছে যাতে কেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি পেয়ে আমলাতন্ত্রে পরিণত না হয় আবার গণতান্ত্রিকতা যেন নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলায় রূপ না নেয়। কেবলমাত্র ব্যাপক গণতন্ত্র এবং গণ-উদ্যোগের ভিত্তিতে কেন্দ্রিকতা এবং প্রয়োজনীয় দিকে সমস্ত প্রচেষ্টা নিবদ্ধ করে কেন্দ্রীয় সংগঠনে পরিকল্পিত কার্যকলাপের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিকতা, শুধুমাত্র বিপরীতের এই ধরনের মিলনের ফলেই বিকাশের সাফল্য সুনিশ্চিত হয়। সংক্ষেপে আমরা এখন বিপরীতের ঐক্য ও সংঘাতের নিয়মের মর্মবাণীকে সংজ্ঞায়িত করতে পারি। **এই নিয়ম অনুসারে সমস্ত জিনিস, ঘটনা ও প্রক্রিয়ার ভেতরে রয়েছে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, পরস্পর-বিরোধী দিক ও প্রবণতা; এগুলো পারস্পরিক-সম্পর্কিত অবস্থায় এবং পারস্পরিক নেতিকরণের অবস্থায় বিদ্যমান; বিপরীতের সংঘাত বিকাশের অভ্যন্তরীণ প্রেরণা সৃষ্টির দিকে নিয়ে যায়। এই দ্বন্দ্বের সমাধান ঘটে একটা স্তরে পুরাতনের বিলয় ও নবীনের আবির্ভাবের মধ্যে।**

এই নিয়মের জ্ঞান আমাদের জগতে ক্রিয়াশীল প্রক্রিয়াগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সারমর্ম গ্রহণ করতে এবং কোনটা অপ্রচলিত হয়ে পড়ছে এবং কোনটা তাকে অপসারিত করবে তা দেখতে, প্রগতির প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়তে এবং ত্রুটিবিচ্যুতি, সমস্ত রকম অচলায়তন, রক্ষণশীলতা ও মতান্ধতার বিরুদ্ধে অনমনীয় হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে।

নেতিকরণের নেতিকরণ নিয়ম

এখন আমরা বিকাশ সংক্রান্ত আর একটি মূল্যবান প্রশ্নের পর্যালোচনা করব। এমন কোন প্রবণতা আছে যা অন্তহীন বিকাশ প্রক্রিয়ার ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে? যদি থাকে তা হলে সেটা কী? এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করেও নানারকম দার্শনিক মত ও তত্ত্বের মধ্যে সংগ্রাম চলেছে এবং এটা প্রচণ্ড বাক্‌বিতণ্ডার বিষয় (বিশেষতঃ সমাজ বিকাশের সঙ্গে এর সম্পর্ক নিয়ে)।

প্রাক্-মার্কসীয় দর্শনে আবর্তন তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। এই চক্রাকার তত্ত্বে সমাজের ঊর্ধ্বগতি বিকাশকে স্বীকার করা হত কিন্তু তাতে ধরে নেওয়া হত যে বিকাশের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে সমাজ আবার তার পূর্বেকার গোড়ার অবস্থায় নেমে আসে এবং সমস্ত বিকাশটাই আবার নতুন করে শুরু হয়। এই রকম তত্ত্ব পোষণ করতেন ইতালীয় দার্শনিক জিওভান্নী ভিকো। প্রগতিশীল বুর্জোয়া পণ্ডিতরা এই মত তুলে ধরতেন যে, সমাজ অবিরাম বিকাশলাভ করছে, যদিও তাঁরাও বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে সমাজ-প্রগতির শিখর বলে মনে করতেন। পরে, পুঁজিবাদী সমাজের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে অসোয়াল্ড স্পেংলারের মতো দার্শনিকরা এমন সব নৈরাশ্যবাদী তত্ত্ব হাজির করেন যাতে ধরে নেওয়া হত যে বুর্জোয়া সমাজের অনিবার্য ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সমাজ-বিকাশেরও যবনিকাপাত ঘটবে।

মাত্রাগত পরিবর্তন থেকে গুণের পরিবর্তন এবং বিপরীতের সংঘাত আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, নেতিকরণ বিকাশ-প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি অপরিহার্য ভূমিকা নেয়। কেবলমাত্র পুরাতন অবস্থার নেতিকরণের মধ্যেই গুণগত পরিবর্তন সম্ভব। কোন জিনিষের বিরোধভাব এইটাই সূচিত করে যে এর নিজের নেতিকরণ এর মধ্যেই বিদ্যমান।

নেতিকরণ সমস্ত বিকাশের মধ্যে একটা অনিবার্য ও যুক্তিসম্মত উপাদান। মার্কস লিখেছিলেন, "যে ক্ষেত্র তার পূর্বতন রূপের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না সেখানে কোন বিকাশ ঘটতে পারে না।"[১] এই উপাদান ছাড়া নতুন কিছুই ঘটতে পারে না। বেলিনিস্কি এই বিষয়টি ভাল করে বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন যে, নেতিকরণ ছাড়া সমাজ একটা বন্ধ জলাভূমির মতো। কিন্তু নেতিকরণ কী? সাধারণ ধারণায় নেতিকরণের প্রত্যয়টি "না" শব্দের সঙ্গে যুক্ত; নেতিকরণ করার অর্থ হল "না" বলা, কোন কিছুকে বাতিল করা ইত্যাদি। নিশ্চয়ই কিছু বর্জন করা ছাড়া নেতিকরণ হতে পারে না। কিন্তু ডায়ালেকটিকস নেতিকরণকে বিকাশের অংশ বলে মনে করে এবং তাই সাধারণভাবে ব্যবহৃত অর্থের চেয়ে এটা অনেক বেশি গভীর ব্যঞ্জনাময়। এঙ্গেলস লিখেছিলেন. "ডায়ালেকটিকস নেতিকরণ বলতে শুধু না অথবা কিছুর অস্তিত্ব রইল না অথবা ইচ্ছে মতো কেউ একে ধ্বংস করল, এমন বোঝায় না।"[২] ডায়ালেকটিক বিকাশের সারমর্ম এইখানেই যে, নেতিকরণের ধরন পরবর্তী বিকাশের পরিস্থিতি তৈরী করে।

বিশ্বের শিল্প-সাহিত্যে দু-রকম নেতিকরণের পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়ঃ ধ্বংস হিসেবে নেতিকরণ এবং আরও উন্নততর কিছুর জন্যে, আরও সম্পূর্ণ প্রগতির উৎস হিসেবে নেতিকরণ। গ্যয়টের ফাউস্ট-এ মেফিস্টোফিলিসের

১. মার্কস/এঙ্গেলস. ওয়ার্কে, বি ডি. ৭স ৪. ৩৩৬ পৃঃ।
২. এফ., এঙ্গেলস, এ্যান্টিড্যুরিং ১৬৯ পৃঃ।

চরিত্র প্রথম ধরনের চিত্র, আর ফাউস্ট নিজে দ্বিতীয় ধরনের। মেফিস্টোফিলিস বলছেন ঃ

"আমি শক্তি সকল ধ্বংসের
আর প্রকৃতই তাই ; সৃষ্ট যা কিছু সব
বিনাশের যোগ্য তারা ;
এখনও জন্মে নি যা তাই শ্রেষ্ঠ
তাই, সব যার ধ্বংসের ছায়ায়, অশুভ
বা পাপ, সংক্ষেপে বোঝায়—
তাই মোর প্রকৃত স্বভাব।"[১]

মেফিস্টোফিলিসের সামগ্রিক নেতিকরণের মনোভাব তাকে পুরনো জগৎ সম্বন্ধে নানা ভাবনা-চিন্তা প্রকাশের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু মানুষের শক্তি ও একটা উন্নততর ভবিষ্যতে তার আস্থা নেই। ফাউস্টও পুরাতন জীর্ণ জীবনকে প্রত্যাখ্যান করছে কিন্তু মানুষের ওপর, মানুষের যুক্তির ওপর তার আস্থা এবং সুন্দরের জন্যে, পূর্ণতার জন্যে তার আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত রয়ে যাচ্ছে।

ডায়ালেকটিক নেতিকরণের দুটি অপরিহার্য দিক আছে। (১) এটা বিকাশের শর্ত ও উপাদান ; (২) এটা নতুন ও পুরাতনের মধ্যে একটা যোগসূত্র। প্রথমটির অর্থ হল, কেবল সেই নেতিকরণটিই "সদর্থক নেতিকরণ" যা কোন নতুন, উন্নততর ও আরও নিখুঁত রূপ-সৃষ্টির পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। দ্বিতীয়টির অর্থ হল, পুরানোর আগে যা ছিল তার নেতিকরণ হিসাবে পুরাতন কেবল ধ্বংসই হয় না—পেছনে শুধু একটা শূন্যতাই রয়ে যায় না, শুধু পুরাতনের নিরাকরণ "উচ্চতর ঐক্যে সমন্বিত" হয়।

"উচ্চতর ঐক্যে সমন্বয়" (Sublation) পদটি ডায়ালেকটিক নেতিকরণের অর্থ ও মর্মবস্তুকে প্রকাশ করে ঃ পূর্ববর্তী অবস্থা যুগপৎ বিলুপ্ত হয় ও বজায় থাকে। দুই অর্থে এটি বজায় থাকে। প্রথমতঃ পূর্ববর্তী বিকাশ ছাড়া নতুন রূপে কোন ভিত্তিই থাকে না। যেমন, যদি প্রাণিজগৎ মানস-ক্রিয়া আয়ত্ত না করত ও তাদের মধ্যে এর বিকাশ না ঘটত তাহলে কোন উন্নততর, মানবোচিত মানস-ক্রিয়ার রূপ সৃষ্টি হত না। দ্বিতীয়তঃ পূর্বতন অস্তিত্বের যা কিছু বজায় থাকে, তা মূলগতভাবে ভিন্নরূপে পরবর্তী স্তরে উত্তীর্ণ হয়। তাই প্রাণীদের মধ্যে মানসিক ক্রিয়ার যেসব রূপ গড়ে উঠেছে, তা মানুষের মধ্যে এসেছে "প্রতিষেধিত" রূপে, এবং সেগুলো মনুষ্য-লক্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তিতে (শ্রমশীলতা, চিন্তাশক্তি ইত্যাদি) রূপান্তরিত হয়েছে।

কিন্তু বিকাশ শুধু একটি মাত্র নেতিবাচক ক্রিয়ার ফল নয়। এমনকি যদি প্রথম নেতিকরণে কতকগুলো সদর্থক উপাদান রক্ষিত হয়, তাহলেও এটা যার

১. জোহান উলফগ্যাঙ গ্যয়টে, ফাউষ্ট তিয়েল ১। ভারল্যাগ নিউএস লেবেন, বার্লিন, ১৯৬৬, এস ৬০।

নেতিকরণ হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রারম্ভিক রূপ ও প্রথম নেতিকরণের রূপের মধ্যে সম্বন্ধ হল, দুটো বিপরীত রূপের সম্পর্ক। প্রথম নেতিকরণের পর একটা নতুন রূপ অর্থাৎ পূর্বতন রূপের বিপরীত রূপ গঠিত হওয়ার পর কী ঘটে? এটাকে ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে কোন বিশেষ বস্তুর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিকাশকে অনুসরণ করে।

এখানে মার্কসের "পুঁজি" গ্রন্থ থেকে একটা উদাহরণ দেওয়া হল। সামাজিক উৎপাদন সৃষ্টি হওয়ার শুরুতেই এমন একটা রূপ নেয় যার মধ্যে কর্মী তার উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ শ্রমের হাতিয়ারের মালিক উৎপাদক নিজেই। মার্কস এটাকে বলেছেন "নাবালক" রূপ। (এই অর্থে যে এটা ছিল মানবজাতির শৈশব)। কারণ আদিম সাম্যবাদী সমাজে এবং পারিবারিক উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদ্র পরিবারভিত্তিক কৃষিতে এইটাই ছিল সহজাত রূপ। কিন্তু কালে কালে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি এমন একটা মাত্রায় পেঁছিলো যখন ভোক্তা এবং উৎপাদনের হাতিয়ারের মিলিত প্রারম্ভিক আদিম রূপ উৎপাদনের আরও বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। তখন সেখানে দেখা দিল শ্রমের উপকরণের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা এবং ঐসব উপকরণ শ্রমজীবীদের হাত থেকে চলে গেল। এটাই ছিল গোড়াকার ডায়া-লেকটিক নেতিকরণ। কিন্তু যখন পুঁজিবাদী সমাজে এর চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে, তখন যা ছিল তৎকালীন শ্রমবিভাগ ও উৎপাদনের উপকরণের সংহত রূপের নেতিকরণ, তা এখন নিজেই যুক্তিসঙ্গতভাবে নিজের নেতিকরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করেছে এবং একটা নতুন ও উচ্চতর রূপের জন্যে তাকে পথ ছেড়ে দিতে হবে। এটা হল দ্বিতীয় নেতিকরণ, প্রথম নেতিকরণের নেতিকরণ এবং এইজন্যেই একে **নেতিকরণের নেতিকরণ** বলা হয়।

উপরের উদাহরণ থেকে আমরা দেখি যে দ্বিতীয় নেতিকরণের প্রয়োজনীয়তা, অথবা নেতিকরণের নতুন স্তর নিম্নবর্ণিত বিষয়ের ওপর নির্ভর করে: প্রাথমিক রূপ আর যা তার নেতিকরণ করে এরা পরস্পরের বিপরীত, একটা বিমূর্ত একতরফাভাবে এর মধ্যে আছে, যাকে আরও বিকাশ ঘটানোর জন্যে প্রতিষেধিত করা প্রয়োজন। তাই নেতিকরণের নেতিকরণ সমস্ত পূর্ববর্তী বিকাশের সংশ্লেষণ, এইসব একদেশদর্শী পরস্পরবিরোধী শক্তির সংশ্লেষণ যা তাদের নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে কাটিয়ে ওঠে ও সমাধান করে। আমাদের উদাহরণ অনুযায়ী এই দ্বন্দ্বের সমাধান ঘটে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এখানে শ্রমিক ও উৎপাদনের উপকরণের মধ্যেকার ঐক্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় কিন্তু সেটা ঘটে পূর্বেকার উৎপাদন বিকাশের পর্যায় থেকে আরও অনেক-খানি উন্নততর পর্যায়ে গিয়ে। এইভাবে মানুষ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পায় এবং বৈষয়িক ও মানসিক বিকাশের বিরাট সম্ভাবনার দ্বার তার কাছে উন্মুক্ত হয়।

হেগেল সঠিকভাবেই দ্বিতীয় নেতিকরণ বা নেতিকরণের নেতিকরণ-এর ব্যাখ্যা করেছিলেন একটা সংশ্লেষণ হিসেবে যা প্রথমে "বিমূর্ত ও অসৎ উপাদান"কে বর্জন করে ঐক্যে সমন্বিত হয়। এখানে "বিমূর্ত" ও "অসৎ"-এর অর্থ হলো একদেশদর্শীতা ও অসম্পূর্ণতা।[১]

এখানে আমরা নেতিকরণের নেতিকরণ-এর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই। সমগ্র বিকাশ-চক্রের উপসংহারে দ্বিতীয় নেতিকরণের প্রাথমিক রূপের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থেকে যে বিকাশ শুরু হয়েছিল (আমাদের উদাহরণে উৎপাদনের উপকরণ ও কর্মী—এই দুইয়ের ঐক্য) তা অনিবার্যভাবেই পুনঃস্থাপিত হয়। যা প্রাথমিক রূপকে যতটা নেতিকরণ করেছিলো ততটাই তারও নেতিকরণ হয়, এটা উপলব্ধি করা যায় যে এই দু-ধাপ নেতিকরণ প্রাথমিক রূপের কতকগুলো দিক ও বৈশিষ্ট্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটায়।

বিকাশের ডায়ালেকটিক চরিত্র জ্ঞান-বিকাশের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। যেমন, আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণার প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথম ধারণা দেওয়া হল যে এটা আলোকবিন্দু বা কণিকাদের একটা স্রোত। এরপর তার ঠিক বিপরীত, তরঙ্গের তত্ত্ব উপস্থাপিত হল। বিংশ শতাব্দীর পদার্থ বিজ্ঞানকে এই তথ্যের মুখোমুখি হতে হল যে এই দুটো মতের কোনোটাই বাস্তবের সত্য ব্যাখ্যা নয়। "বাস্তবতার দুটো পরস্পরবিরোধী চিত্র আমাদের রয়েছে; পৃথকভাবে তাদের কেউই আলোর ব্যাপারটাকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করে না, কিন্তু একত্রে তা করে।"[২] অন্য কথায়, দুটো একদেশদর্শী বিরোধী মতের সমাধান হল তাদের উচ্চতর সংশ্লেষণে একটা নতুন তত্ত্বের মধ্যে, যা আলোকে ক্ষুদ্রকণা ও তরঙ্গ ধর্মের ঐক্য বলে গণ্য করলো। লেনিন জ্ঞান-বিকাশের এই প্রক্রিয়াকে, যা যথার্থই নেতিকরণের নেতিকরণ, এইভাবে বর্ণনা করেছেন। "প্রতিষ্ঠা থেকে নেতিকরণ—নেতিকরণ থেকে প্রতিষ্ঠিতের সঙ্গে ঐক্য—এছাড়া ডায়ালেকটিক হ'য়ে পড়ে অসার নেতিকরণ, একটা খেলা অথবা নাস্তিকতা।[৩]

নেতিকরণের নেতিকরণ নিয়মটির ফলশ্রুতি হল এই যে বিকাশ সরলরেখার পরিবর্তে সর্পিল কুণ্ডলাকৃতিতে (spiral) ঘটে; যার ফলে শীর্ষবিন্দুটির সঙ্গে প্রস্থান বিন্দুর মিলন ঘটে আরও উচ্চস্তরে, প্রত্যেকটি কুণ্ডলী আরও পরিণত অবস্থাকে চিহ্নিত করে। এই অর্থেই আমরা "বিকাশের কুণ্ডলী" পদটি ব্যবহার করি।

১ জি. ডব্লিউ. এফ. হেগেল, সামিলিচ ওয়েৰ্কে, ষ্টাটগার্ট, বি ডি. ৫, ১৯২৮, ৩৪৫ পৃঃ।

২ এ. আইনষ্টাইন এবং এল. এনফেল্ড—দি ইভোলিউশান অব ফিজিক্স। দি গ্রোথ অব আইডিয়াস ফ্রম আর্লি কনসেপ্টস টু রিলেটিভিটি এণ্ড কোয়াণ্টা, নিউইয়র্ক, ১৯৫৪। ২৭৮ পৃঃ।

৩ ভি. আই. লেনিন, কালেকটেড ওয়ার্কস্, ৩৮ খণ্ড, ২২৭ পৃঃ।

নেতিকরণের নেতিকরণ প্রক্রিয়াকে প্রায়ই থিসিস বা "উপস্থাপন (বিকাশের সূচনা বিন্দু), এ্যান্টিথিসিস বা "প্রত্যুপস্থাপন" (প্রথম নেতিকরণ), "সিন্থেসিস বা সংশ্লেষণ" (দ্বিতীয় নেতিকরণ) প্রভৃতি পদ দ্বারা প্রকাশ করা হয়, এগুলো এমন একটা ত্রিত্ব গড়ে তোলে যার সাহায্যে বিকাশের সারমর্ম প্রকাশ পায়। এর ফলে নেতিকরণের নেতিকরণ নিয়মটিকে প্রায়শই এমন একটা মামুলি ও বাহ্যিক ছকে পর্যবসিত করা হয়, যার দ্বারা বাস্তব বিকাশের সমস্ত বৈচিত্র্য ও জটিলতা একটা মনগড়া অনড় কাঠামোর মধ্যে আটকে পড়ে। এমন কি হেগেলও ডায়ালেকটিকস-এর এই ধরনের ধারণার বিরুদ্ধে এই বলে প্রতিবাদ করেছিলেন যে, ত্রিত্ব হল জ্ঞানার্জন পদ্ধতির শুধু একটা অগভীর বাহ্যিক উপাদান। বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস এই ধরনের কোনো মামুলি দৃষ্টিভঙ্গি ও ছকবাঁধা পদ্ধতি নির্মাণের মূলতঃ বিরোধী। ডায়ালেকটিকস-এর যে কোন নিয়মের মতই নেতিকরণের নেতিকরণ নিয়মটিও কোন ছক চাপিয়ে দেয় না, এ কেবলমাত্র সঠিক দিকে অনুসন্ধানের নির্দেশ দেয়।

কতকগুলো ঘটনা অন্য ঘটনার দ্বারা নিরবচ্ছিন্নভাবে অপসারিত হওয়ার কোনো বিষয়গত, নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত ঝোঁক—এমন কোন ঝোঁক যা ঘটনা-বিকাশের গতিপথকে প্রভাবিত করে, তার অস্তিত্ব আছে কি না—'নেতিকরণের নেতিকরণ' নিয়মটির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম, এবার 'তার উত্তর পাওয়া সম্ভব।

বিকাশ হল বাস্তবে, একটি ডায়ালেকটিক নেতিকরণের পারস্পরিক ধারা; যার প্রত্যেকটি কেবলমাত্র পূর্ববর্তী গ্রন্থিগুলোকেই বর্জন করে না, তাদের মধ্যে যা ইতিবাচক তাকে বজায় রাখে; এইভাবে আরও বেশি বেশি করে পরবর্তী উচ্চতর গ্রন্থিগুলোর মধ্যে সমগ্র বিকাশের বৈচিত্র্যকে সংহত করে। বিকাশের অনন্ত রূপ একটি এককের সঙ্গে আর একটি এককের অসংখ্য গাণিতিক যোগের মধ্যে পাওয়া যায় না, বরং তা পাওয়া যাবে নতুন ও উচ্চতর রূপ সৃষ্টির মধ্যে। এইসব রূপের মধ্যেই ভবিষ্যৎ বিকাশের পূর্বাবস্থা সৃষ্টি হয়। তাই সাধারণ নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত বিকাশের ঝোঁক সরল থেকে জটিল, নিম্ন থেকে উচ্চ। বিকাশ তাই **প্রগতিশীল ও ঊর্ধ্বমুখী গতির** প্রবণতা।

নেতিকরণের নেতিকরণ প্রক্রিয়ার একটি বৈশিষ্ট্যসূচক দিক হল এর **অপ্রত্যাবর্তনীয়তা** অর্থাৎ বিকাশ সাধারণ ঝোঁক হিসেবে কখনই উচ্চতর রূপ থেকে নিম্নতর রূপে—জটিলতর থেকে সরলতার দিকে বিপরীতমুখী হতে পারে না। এটা এই কারণেই ঘটে যে, প্রতিটি নতুন স্তর পূর্ববর্তী স্তরের সমস্ত বৈচিত্র্যকে নিজের মধ্যে সংশ্লেষণ করবার সময় উচ্চতর বিকাশের ভিত্তিও প্রস্তুত করে।

অসীম বিশ্ব ও সমগ্র জগৎ একই ধারায় বিকশিত, ও সমস্ত বিকাশই প্রগতিশীল—এ কথা বলা ভুল হবে। তবে কোনো বিশেষ ব্যবস্থাতে অথবা

তার উপাদানের ক্ষেত্রে উর্ধ্বমুখী বিকাশের ঝোঁক পূর্ণমাত্রায় পরিণতি লাভ করে। প্রকৃতির ক্ষেত্রে আমরা আমাদের এই গ্রহটির বিকাশের দৃষ্টান্ত থেকেই এটা বুঝতে পারি। সমাজে প্রত্যেকটি নতুন স্তরই (সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা) একটা উচ্চতর স্তর। শুধু গোটা সমাজই নয় বরং এর প্রত্যেকটি দিক তা প্রযুক্তিবিদ্যা, উৎপাদন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা অথবা দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, যাই হোক না কেন—সবই প্রগতিশীল বিকাশধারার অধীন। জ্ঞান ও চিন্তা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা সত্যি। জগৎ সম্বন্ধে ভীরু ও উদ্ভট কল্পনা থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের শীর্ষদেশ—এই হ'ল মানবজ্ঞানের উর্ধ্বমুখী ধারা।

কিন্তু প্রগতিশীল বিকাশ সম্বন্ধে আমাদের ধ্যানধারণার অতি-সরলীকরণ করা উচিত নয়। যে কোন ডায়ালেকটিক প্রক্রিয়ার মতই বিরোধের মাধ্যমে বিপরীত শক্তির সংঘাতের মধ্যে দিয়ে এটি বাস্তবায়িত হয়। কোনো না কোনো ধরনের প্রগতি ভিন্ন ক্ষেত্রে তা পশ্চাদ্‌গতি। উর্ধ্বমুখী বিকাশের ফলস্বরূপ চরম রূপটিও নিজের নেতিকরণের পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে। প্রগতি বাস্তবায়িত হয় বিপরীতমুখী ঝোঁকের সংগ্রামের মধ্যে এবং পরস্পরচ্ছেদী বহু বিকাশধারার অরণ্য জালের ভিতর দিয়ে নিজের পথ করে নেয়। এই বিকাশধারার মধ্যে কতকগুলো অগ্রগামী হওয়ার পরিবর্তে পশ্চাদ্‌গামী হতে পারে এবং এইভাবে পশ্চাদ্‌গমনের বিভিন্ন উপাদান তার মধ্যে প্রকাশ পায়। এঙ্গেলস লিখেছেন, "···জৈব বিবর্তনে প্রত্যেকটি অগ্রগতি একই সঙ্গে পশ্চাদ্‌পসরণও বটে—একপেশে বিবর্তনকে স্থিতিশীল করে অন্য বহুদিকে বিবর্তনের সম্ভাবনাকে বর্জন করে।"[১] এক কথায়, প্রগতিকে আধিবিদ্যক, বিচ্যুতিহীন, বক্রতাহীন, অবাধ প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা উচিত নয়। এই সত্যটি সমাজ-বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, কারণ এটা বহু শ্রেণী ও দলের নিজেদের স্বার্থ অনুসরণ করা ও নিজেদের লক্ষ্যের জন্যে লড়াই করার ক্ষেত্র।

এটা ভোলা উচিত নয় যে, নেতিকরণের নেতিকরণ নিয়মটি ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি ও বিষয়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে কাজ করে। এঙ্গেলস লিখেছেন, "প্রত্যেক ধরনের বস্তুর নেতিকরণের এমন একটি বিশেষ রকম আছে যা তার বিকাশের সৃষ্টি করে এবং প্রত্যেকটি ধারণা বা ভাবের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যাপার।"[২]

সমাজতন্ত্রে পুরাতনের ডায়ালেকটিক নেতিকরণ ও নতুনের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ চলে পরিকল্পনামাফিক ও খোদ সমাজেরই নিয়ন্ত্রণে। এখানে যখন যে সমস্যা দেখা দেয় তার মোকাবিলা করাই এই নেতিকরণের বৈশিষ্ট্য। পুরাতন সম্পূর্ণরূপে প্রতিক্রিয়াশীল এবং ধ্বংসের যোগ্য, নৈরাজ্যবাদীদের এই মত সমাজতন্ত্রবিরোধী। অধিকন্তু, পুঁজিবাদী সমাজকে অপসারিত করে যে-

১ এফ. এঙ্গেলস, ডায়ালেকটিকস অব নেচার, ৩০৭ পৃঃ।

২ এফ এঙ্গেলস, অ্যান্টি-ড্যুরিং. ১৬৯ পৃঃ।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ জন্ম নেয়, তা সমস্ত পূর্ববর্তী বিকাশ-ধারার সঞ্চিত বৈষয়িক ও বৌদ্ধিক সংস্কৃতির মহৎ সম্পদকে রক্ষা ও বজায় রাখতে পারে। ইতিহাস এটাই দেখিয়েছে। এই কারণেই "ভুঁইফোড়" সাংস্কৃতিক বিপ্লব যা "পুরাতনকে" ধ্বংস করার সংগ্রামের অছিলায় অতীতের কষ্টার্জিত সাফল্য-গুলোকে ধ্বংস করে—তার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। কমিউনিজম সমাজ-বিকাশের উচ্চতম স্তর। পুরোনো শোষণভিত্তিক সমাজে প্রগতিবিরোধী যেসব উপাদান থাকে সেগুলোকে চূড়ান্তভাবে নিরাকরণ করে কমিউনিজম মানবজাতির সমস্ত সাফল্যকে নিজের মধ্যে নতুন ভিত্তিতে সংশ্লেষণ করে।

তাই, নেতিকরণের নেতিকরণ নিয়মটি এমন একটা নিয়ম যার ক্রিয়া নিরাকরণকারী ও নিরাকৃতের মধ্যে সংযোগ ও নিরবচ্ছিন্নতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই কারণেই ডায়ালেকটিক নেতিকরণ শুধু নয়, "অপ্রয়োজনীয়" নিরাকরণ নয় যা পূর্ববর্তী সমস্ত বিকাশকে বর্জন করে, বরঞ্চ বিকাশের যে পরিস্থিতি পূর্ববর্তী স্তরগুলোর প্রগতিশীল মর্মবস্তুকে ধরে রাখে ও নিজের মধ্যে রক্ষা করে, প্রাথমিক স্তরের কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের পুনরাবৃত্তি ঘটায়—সাধারণভাবে এই নেতিকরণের একটা প্রগতিশীল ও ঊর্ধ্বমুখী চরিত্র রয়েছে।

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস-এর মৌলিক প্রত্যয়

প্রত্যেকটি বিজ্ঞান যেসব বিষয় ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করে তাকে সঠিকভাবে প্রতিবিম্বিত করার জন্যে তার নিজস্ব কিছু প্রত্যয় সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রচেষ্টার ফলে যেসব প্রত্যয় তৈরী হয়েছে তা কতকগুলো বিশেষ শাখার বিজ্ঞানে একই। তাঁরা কতকগুলো মৌলিক প্রত্যয়ও তৈরী করেছেন। মূল প্রত্যয়গুলো দর্শনের খুব সাধারণ, মৌলিক প্রত্যয়।

১ ডায়ালেকটিকস-এর মৌলিক প্রত্যয়গুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য

মৌলিক প্রত্যয়ের সাহায্যে দর্শন প্রকৃতি, সমাজ ও মানবচিন্তায় ক্রিয়াশীল বিকাশের নিয়মগুলো এবং বস্তুসমূহের মধ্যেকার খুব সাধারণ ধর্ম, সংযোগ ও সম্পর্কগুলোকে অধ্যয়ন ও তালিকাভুক্ত করে। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিশ্বজনীন রূপ হিসেবে মৌলিক প্রত্যয়গুলো সামাজিক প্রয়োগের ফলশ্রুতিজাত। ইতিপূর্বেই তাদের বিকাশ ঘটেছে এবং এখনও সেগুলো বিকশিত হচ্ছে। আমাদের বাইরে যে জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ জগতের অবস্থান, এরা তারই স্বরূপ, ধর্ম এবং সম্পর্কগুলোকে প্রতিবিম্বিত করে।

দর্শনশাস্ত্র উৎপত্তির গোড়ার যুগে মৌলিক প্রত্যয়গুলো জল, মাটি, আগুন, পরমাণু প্রভৃতি বিশ্বের "প্রাথমিক উপাদানগুলো"কে প্রতিপন্ন ক'রে প্রাথমিক দার্শনিক সূত্রের আকারে প্রকাশ পায়। যখন দার্শনিকরা চিন্তা থেকে অস্তিত্বকে পৃথক করতে পারলেন তখন থেকেই মৌলিক প্রত্যয়গুলো মানবজ্ঞানের সামান্যীকরণ করে যুক্তিবিন্যাসের আকার গ্রহণ করলো। উদাহরণস্বরূপ, প্লেটো সত্তা, গতি, স্থিতি, অভেদ ও পার্থক্য এই পাঁচটি মূল প্রত্যয়কে স্বীকার করলেন। এরিস্টটল 'মৌলিক প্রত্যয়গুলো সম্পর্কে' তাঁর নিবন্ধে তিনি এই প্রত্যয়গুলোকে বাস্তবের প্রতিবিম্ব এবং উচ্চতম সামান্যীকরণ বলে গণ্য করলেন। তিনি দশটি মৌলিক প্রত্যয় স্থির করলেন—পদার্থ, মাত্রা, গুণ, সম্পর্ক, স্থান, কাল, অবস্থান, অবস্থা, কার্য ও ভাবাবেগ।

কান্ট মৌলিক প্রত্যয়গুলোকে মনে করতেন অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ যুক্তির রূপ বলে যা বহির্জগতের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে শৃংখলা-বিধায়ক। কান্টের

মত অনুসারে মৌলিক প্রত্যয়গুলো বস্তুর ("আত্মনিবন্ধ বস্তু") সংজ্ঞা নয়, বরং চিন্তার বিন্যাস। তিনি এই রকমভাবে মৌলিক প্রত্যয়ের সংজ্ঞা নির্ণয় করলেন —মাত্রা (ঐক্য, বহুত্ব, সমগ্রতা), গুণ (বাস্তবতা, নেতিকরণ, সসীমতা), সম্পর্ক (পদার্থ, কারণ, মিথস্ক্রিয়া) এবং অবস্থান-প্রণালী হিসেবে (সম্ভাবনা, বাস্তবতা ও অপরিহার্যতা)।

হেগেল মৌলিক প্রত্যয় তত্ত্বের বিকাশে বিপুল অবদান রেখেছেন। তাঁর যুক্তিবিজ্ঞান মৌলিক প্রত্যয়ের ডায়ালেকটিক দর্শন-পদ্ধতির রূপ নিয়েছে। এই মৌলিক প্রত্যয়গুলি ছিল এই রকম : সত্তা (গুণ, মাত্রা, মাপ), মর্ম (ভিত্তি, দৃশ্যমান ঘটনাবলী, বাস্তবতা ; এই বাস্তবতার মধ্যে পদার্থ, কারণ ও মিথস্ক্রিয়া ও অন্তর্ভুক্ত) এবং প্রত্যয় (কর্তা, বিষয়, ভাব)। যদিও হেগেল মৌলিক প্রত্যয়গুলোকে বিশ্বাত্মার সৃষ্টি বলে মনে করতেন তবুও দর্শনে তাঁর অবদান হল এই যে, এই প্রত্যয়গুলির ডায়ালেকটিক রূপান্তর ও তাদের আন্তঃসংযোগের মধ্যে তিনি (লেনিনের ভাষায়) বাস্তবতার ডায়ালেকটিকসকেই চমৎকারভাবে অনুমান করেছিলেন।

কয়েকজন আধুনিক বুর্জোয়া দার্শনিক মৌলিক প্রত্যয়গুলোকে বাস্তব, বিষয়গত এবং মানুষের আত্মগত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি বিশেষ, স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাব-জগৎ বলে মনে করেন। আর কিছু দার্শনিক আছেন যাঁরা এইমত পোষণ করেন যে মৌলিক প্রত্যয়গুলোর কোনো চৈতন্য-নিরপেক্ষ বাস্তব উপাদান নেই।

জগতের দার্শনিক চিন্তাধারার এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞান শাস্ত্রগুলোর সমস্ত সাফল্যকে ব্যবহার করে মার্কসবাদ এই প্রত্যয়গুলোকে ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে বিকশিত করেছে। বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস এর মৌলিকপ্রত্যয়গুলোর মধ্যে পূর্ববর্তী সমস্ত মানব-ইতিহাসের জ্ঞান, জ্ঞানান্বেষণ ও প্রয়োগের সামান্যীকরণের সারসংক্ষেপ সংহত হয়েছে। এগুলো জ্ঞান আহরণের গ্রন্থিবিন্দু, বস্তু সমূহের মর্মের মধ্যে চিন্তার অনুপ্রবেশের "স্তর"।

মৌলিক প্রত্যয়গুলি জ্ঞানের কোন চিরস্থায়ী রূপ নয়। "যদি সব কিছুরই বিকাশ ঘটে তবে তা কি চিন্তার খুব সাধারণ প্রত্যয় এবং মৌলিক প্রত্যয়গুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয় ? যদি তা না হয়, তাহলে তার অর্থ হবে এই যে চিন্তা সত্তার সঙ্গে যুক্ত নয়। যদি তা হয়, তবে তার অর্থ হবে এই যে প্রত্যয়ের ডায়ালেকটিকস আছে, আর জ্ঞানেরও ডায়ালেকটিকস আছে—যার বিষয়গত তাৎপর্য রয়েছে।"[১] চিন্তা-জগতের ইতিহাসের ধারায় এক-একটি মৌলিক প্রত্যয়ের ভূমিকা ও অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছে। মৌলিক প্রত্যয়গুলোর মর্মবস্তু বিশেষভাবে গতিশীল। প্রাচীনকালে বস্তু বলতে কী বোঝাতো

---

১. ভি. আই. লেনিন, কলেক্টেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ২৫৬ পৃঃ।

এবং এখন সমকালীন বিশ্বচিত্রের ক্ষেত্রে এই প্রত্যয়টিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে—এই দুটোর মধ্যে তুলনা করলেই তা বোঝা যাবে।

মৌলিক প্রত্যয়গুলো বাস্তব জগতের সাধারণ ধর্ম, সংযোগ এবং সম্পর্ক-গুলোকে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই পদ্ধতিবিদ্যার দিক থেকে তারা অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রকৃতি, সমাজ ও চিন্তাজগতের বাস্তব ঘটনাবলী অনুশীলনের ক্ষেত্রে এদের প্রয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

প্রত্যেকটি বিজ্ঞানের সাধারণ প্রত্যয়গুলোরও একটা পদ্ধতিগত ভূমিকা আছে। ডায়ালেকটিকস-এর মৌলিক প্রত্যয়গুলোর থেকে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের সাধারণ প্রত্যয়গুলোর পার্থক্য কিন্তু এইখানে যে, এগুলো বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান-চিন্তার বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু দার্শনিক মৌলিক প্রত্যয়গুলো, পদ্ধতিবিদ্যার সূত্রের দিক থেকে বৈজ্ঞানিক চিন্তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সমস্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়। এগুলো বৈষয়িক ও বৌদ্ধিক জীবনধারার অত্যন্ত জটিল ও পরস্পরবিরোধী প্রক্রিয়াকে যথার্থভাবে প্রতিবিম্বিত করে। দর্শনের মৌলিক প্রত্যয়গুলো এইভাবে বিশিষ্ট বিজ্ঞানের ফলাফলগুলিকে অনবরত আত্মস্থ করে নিজেদের সমৃদ্ধ করে তোলে। আবার কোনো বিশেষ বিজ্ঞানই সাধারণ দার্শনিক মৌলিক প্রত্যয়গুলোকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না। বাস্তবতার তত্ত্বগত রূপসৃষ্টি এবং মনের মধ্যে এর সৃজনশীল রূপান্তর ঘটানো যেতে পারে এদেরই সাহায্যে। আর এটা না করা পর্যন্ত আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অস্তিত্বকে পরিবর্তিত করতে পারি না; আমরা পারি না কোনো কিছু সৃষ্টি করতে বা সামাজিক সম্পর্ককে বদলাতে।

মৌলিক প্রত্যয়গুলো চিন্তার সংগঠনী সূত্র, বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে সম্পর্কের গ্রন্থিবিন্দু যা বস্তু এবং পরিদৃশ্যমান ঘটনাবলীর সমস্ত বৈচিত্র্যগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করতে সাহায্য করে। এগুলো এমন "দৃষ্টিভঙ্গি"—যা থেকে আমরা বিশ্ব সম্পর্কে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, আমাদের দৃষ্টি এবং এর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান লাভ করি। মৌলিক প্রত্যয়ের কল্যাণেই একই জিনিসকে সমগ্র বস্তুর বিশেষ প্রকাশরূপে প্রত্যক্ষ ও হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়। একজন ব্যক্তিকে তাঁর ব্যক্তিগত অগ্রগতির ক্ষেত্রে তত্ত্বগত চিন্তাশক্তি লাভ করার জন্যে অবশ্যই এই মৌলিক প্রত্যয়গুলিকে ভালভাবে আয়ত্ত করতে হবে।

শুধু বিশেষ কোন মৌলিক প্রত্যয়কে ধরে অর্থাৎ অন্যান্য মৌলিক প্রত্যয় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ করে এর সম্বন্ধে সত্য ধারণা লাভ করা যায় না। বাস্তব জগতে সব কিছুই একটা সাধারণ মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। যেহেতু মৌলিক প্রত্যয়গুলো জগৎকে প্রতিবিম্বিত করছে, তাই তারা কোন না কোনভাবে পরস্পর-সম্পর্কিত। প্রত্যেকটি মৌলিক প্রত্যয় বাস্তব-জগতের কয়েকটি দিককে প্রতিবিম্বিত করে এবং ওগুলো একত্রে "...স্বাপেক্ষভাবে,

মোটামুটিভাবে, অনন্ত গতিশীল এবং বিকাশমান প্রকৃতির সার্বিক নিয়মনিয়ন্ত্রিত চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে।"[১]

মৌলিক প্রত্যয়গুলো এমনভাবে পরস্পরযুক্ত যে সেগুলোকে শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট মৌলিক প্রত্যয়-ব্যবস্থার উপাদান হিসেবে উপলব্ধি করা সম্ভব।

মৌলিক প্রত্যয়-ব্যবস্থা তৈরি করা হয় যুক্তিশাস্ত্র ও ইতিহাস-সম্মত ঐক্যের ভিত্তিতে। মৌলিক প্রত্যয়গুলোকে একে অপরের সঙ্গে হঠাৎ বা খেয়ালখুসী মাফিক সাজানো হয় না; তাদের সুসঙ্গত প্রকাশের মধ্যে সরল থেকে জটিল অগ্রগতির ধারায় মানব-চিন্তার গঠন ও বিকাশের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ অবশ্যই প্রতিবিম্বিত হওয়া চাই।

ডায়ালেকটিকস-এর মৌলিক প্রত্যয়গুলো তাদের মৌল নিয়মগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত। ডায়ালেকটিকস এর মৌল নিয়মগুলো কতকগুলো মৌলিক প্রত্যয়ের মাধ্যমেই প্রকাশিত এবং সূত্রায়িত হয়; অন্যথায় সেগুলোকে মোটেই প্রকাশ করা যায় না। তাই বিপরীত শক্তির ঐক্য ও সংঘাতের নিয়মটি প্রকাশ করা হয় বিরোধ ও দ্বন্দ্ব ইত্যাদি মৌলিক প্রত্যয়ের মাধ্যমে। মাত্রাগত থেকে গুণের পারস্পরিক রূপান্তরের নিয়মটিকে সূত্রায়িত করা হয় গুণ, মাত্রা, মাপ, উল্লম্ফন (উৎক্রান্তি) ইত্যাদির মাধ্যমে। অন্যদিকে, ডায়ালেকটিকস-এর নিয়মগুলো মৌলিক প্রত্যয়গুলোর মধ্যেকার সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে, বস্তুর সাধারণ দিক ও সম্পর্কগুলোকে প্রকাশ করে। তাই রূপ ও আধেয়, মর্ম ও ইন্দ্রিয়-গোচরতা, আবশ্যকতা ও আকস্মিকতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিপরীতের ঐক্য ও বিরোধ নিয়মটির বিশেষ প্রকাশ। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা অনেক-গুলো দার্শনিক মৌলিক প্রত্যয়ের আলোচনা করেছি—যথা বস্তু, গতি, দেশ, কাল, সসীম, অসীম, চেতনা, মাত্রা, গুণ, মাপ এবং দ্বন্দ্ব। এই অধ্যায়ে আমরা পরস্পর-সম্পর্কিত অন্যান্য মৌলিক প্রত্যয়ের আলোচনা করব।

২ স্বতন্ত্র, বিশেষ ও সার্বিক

যখন আমরা আমাদের চারিদিকের জগতের কথা চিন্তা করি তখন প্রথমেই যা মনে আসে, তাহলো এর পরিবর্তনশীল মাত্রাগত ও গুণগত বৈচিত্র্য।

জগৎ ঐক্যবদ্ধ সত্তা কিন্তু এটা নানা জিনিসের, ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের এবং ঘটনাবলীর একটা সমষ্টিগত রূপ। এরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ধর্মবিশিষ্ট। দেশ ও কালে একে অপরটি থেকে বিভক্ত এবং পৃথক পৃথক পরিমাণ ও গুণগত সংজ্ঞাযুক্ত বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনাবলীকে স্বতন্ত্র প্রত্যয়টির দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। যা একটি বিষয়কে অপর বিষয় থেকে স্বতন্ত্র করে, যা শুধু বিষয়টির সহজাত, তাকেই প্রকাশ করে এই প্রত্যয়টি।

১. ভি. আই. লেনিন, কালেকটেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ১৮২ পৃঃ।

যে কোন বস্তু বা প্রক্রিয়া কোন একটি সংহত ব্যবস্থার উপাদান মাত্র। কোন একটি একক জিনিস বা ঘটনা নিঃসম্পর্কিত হতে পারে না। বহু জিনিস ও ঘটনার সঙ্গে যুক্ত না থেকে কোন কিছুই উদ্ভূত বা অবস্থিত বা পরিবর্তিত হতে পারে না।

বস্তুসমূহের ধর্ম ও সম্পর্কগুলোর সার্বিকতা প্রকাশ পায় **সার্বিক** মৌল প্রত্যয়টির মাধ্যমে। এই প্রত্যয়টি প্রকাশ করে বস্তুর ধর্ম বা বিভিন্ন দিকের সাদৃশ্যকে, উপাদানগুলোর মধ্যে, একটি ব্যবস্থার ও বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যেকার সম্পর্ককে। সার্বিকতা বস্তুগুলোর মধ্যেকার ধর্ম ও সম্পর্কের সাদৃশ্যের আকারে প্রকাশ পেতে পারে। এক্ষেত্রে সার্বিকতা একটা নির্দিষ্ট শ্রেণী বা বর্গকে তার অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন "কেলাস", "প্রাণী", "মানুষ" ইত্যাদি ধারণার মধ্যে এই সার্বিকতা প্রকাশ পায়।

সার্বিকতা স্বতন্ত্রর পূর্বে বা বাইরে থাকতে পারে না, যেমন স্বতন্ত্রও সার্বিকতার বাইরে থাকতে পারে না। যেকোন বস্তুই সার্বিকতা ও স্বতন্ত্রর ঐক্য। **বিশেষ** হল স্বতন্ত্র এবং সার্বিকতার মধ্যে এক ধরনের সংযোগকারী প্রত্যয়। যেমন, সাধারণভাবে উৎপাদন তুলনামূলক বিচারের সাহায্যে গড়ে তোলা একটা বিমূর্ত ধারণা। উৎপাদনের মধ্যে যা সার্বিক ও সহজাত এই বিমূর্ত• ধারণার দ্বারা তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে এই সার্বিকতাকে নানা ভাগে ভাগ করা যায়। একটা বিশেষ কোন কিছু (উদাহরণস্বরূপ, কোন সামাজিক-অর্থনৈতিক বিন্যাসের অবস্থায়), এবং একটা স্বতন্ত্র কোন কিছু হিসেবে (উদাহরণস্বরূপ, একটা বিশেষ দেশে) সার্বিকতা টিকে থাকে।

সার্বিকতাকে বিশুদ্ধ চিন্তার ক্ষেত্র থেকে স্বতন্ত্রর মধ্যে ঢোকানো হয় না। পার্থক্য এবং ঐক্য (সার্বিকতা) উভয়ই বাস্তব জগতের বিষয়বস্তুর ও ঘটনার মধ্যে সহজভাবেই থাকে। এগুলো উভয়ই সত্তার বিষয়গত অবিভাজ্য দিক। একটা বস্তু অন্য সব বস্তুর থেকে পৃথক আর সেই সঙ্গে কোনো দিক দিয়ে তাদের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত, অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে কতকগুলি সাধারণ ধর্মের অধিকারী।

একটা ম্যাপল বা ওক্ গাছের সহস্রাধিক পাতা আছে। আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে তাদের মধ্যে দুটো হুবহু একরকম পাতা দেখতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু কোন পাতা দেখে নির্দ্বিধায় আমরা বলতে পারি যে এটা ম্যাপল না ওক কোন গাছটার পাতা। কেন? কারণ তাদের গঠন বা বর্ণে একটা সার্বিকতা আছে।

সার্বিকতা এবং পার্থক্য কোনো একটি বস্তু ও অন্যান্য বস্তুর মধ্যেকার এমন একটি সম্পর্ক যা এদের ধর্মের স্থায়িত্ব ও পরিবর্তনশীলতা, সমতা ও অসমতা, অভেদত্ব ও ভিন্নতা, একাত্মতা ও অমিল, নিরবচ্ছিন্নতা ও ছেদ এবং বিকাশের যোগসূত্র, সম্পর্ক ও প্রবণতাকে চিহ্নিত করে।

এঙ্গেলস বলেছেন, আমরা সার্বিকতা ও পার্থক্যের সম্মুখীন না হয়ে এক পাও অগ্রসর হতে পারি না। লেনিনের উক্তি অনুসারে, "আইভ্যান একজন ব্যক্তি", "জুচকা একটি কুকুর" প্রভৃতি খুব সরল উদাহরণের বাক্যাংশের মধ্যেও রয়েছে ডায়ালেকটিকস" ঃ "...স্বতন্ত্র হল সার্বিক...ফলে বিপরীতগুলো (স্বতন্ত্র সার্বিকতার বিপরীত) সাদৃশ্যযুক্ত ঃ যে-সম্পর্ক সার্বিকতার দিকে নিয়ে যায়, তার মধ্যেই স্বতন্ত্রর স্থিতি।"[১]

সার্বিকতা আর স্বতন্ত্রর সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন দর্শন-প্রস্থানে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। অধিবিদ্যক দার্শনিকেরা সাধারণত সার্বিকতা থেকে স্বতন্ত্রকে বিচ্ছিন্ন করেন এবং এ-দুটিকে পরস্পরবিরোধী হিসেবে দাঁড় করান। মধ্যযুগে তথাকথিত নমিন্যালিস্টরা (সংজ্ঞাবাদী) মনে করতেন যে সার্বিকতার প্রকৃত কোন অস্তিত্ব নেই, ওটা শুধু নাম বা শব্দ মাত্র, আর কেবলমাত্র স্বতন্ত্র বস্তুরই তাদের ধর্ম ও সম্পর্কযুক্ত প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে। অন্যদিকে, রিয়্যালিস্টরা (বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী) ধরে নিতেন যে বস্তুসমূহের সার্বিক প্রত্যয়ের বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে তাদের আত্মিক সারসত্তা হিসেবে, স্বতন্ত্র বস্তুর পূর্বেই তাদের অস্তিত্ব এবং অন্য-নিরপেক্ষ সত্তা ছিল। এই বিতর্ক পরবর্তীকালেও চলেছিল। যেমন ইংরেজ দার্শনিক লক লিখেছিলেন, "...সামান্য এবং সার্বিক বস্তু বাস্তব অস্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তা উপলব্ধির উদ্ভাবনা ও সৃষ্টি, তার নিজের ব্যবহারের জন্যে সৃষ্ট, আর শব্দ বা ভাব যাই হোক, সবই শুধু সংকেতের সঙ্গে সম্পর্কিত।"[২] অন্যদিকে, হেগেলের মতে সার্বিক স্বতন্ত্রর পূর্ববর্তী ও তার স্রষ্টা "অর্থাৎ স্বতন্ত্রর ভিত্তি ও মৃত্তিকা, (der Grund und Boden) মূল ও সারবস্তু।"[৩] ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার নিয়মগুলো বিশ্লেষণের সময় স্বতন্ত্র ও সার্বিককে সংযুক্ত করার সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন হয়। কয়েকজন চিন্তাবিদ এটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন এবং এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছেন যে সামাজিক সত্তার ক্ষেত্রটির সঙ্গে কারো তুলনা চলে না এবং এখানে সমস্ত সম্পর্ক একান্তভাবেই স্বতন্ত্র। যে ঘটনার কোন পুনরাবৃত্তি হয় না তার জন্যে কোন নিয়ম দাঁড় করানো যায় না এবং এই মতের ভিত্তিতেই ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়ার নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত প্রকৃতিকে অস্বীকার করা হয়।

এই অবস্থান কি সঠিক? নিশ্চয়ই নয়। সমস্ত নির্দিষ্টতা নিয়ে কোন স্বতন্ত্র ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটে না। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিটি যুদ্ধের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো যদি বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে তাদের মধ্যে পার্থক্য

---

১ ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ৩৬১ পৃঃ।

২ জন লক্, এ্যান এসে কনসারনিং হিউম্যান আণ্ডারস্ট্যানডিং। ইন ফোর বুকস। ইন দি ওয়ার্কস অব জন লক, ১ম খণ্ড, লণ্ডন, ১৭৫১, ১৮৯ পৃঃ।

৩ ডি. ডাবলিউ. এফ. হেগেল. ওয়ের্কে. বি ডি. ৬, এস, ৩৩৯

আছে। কিন্তু নির্দিষ্ট ঘটনাগুলোর স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে কিছু সার্বিকতা আছে ঃ যেমন তাদের মর্মগত গুণ এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংযোগের রূপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে গ্রীস-পারস্যের যুদ্ধগুলোর মতো নয়, তা বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধের সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার পথে অন্তরায় হতে পারে না। কোনক্রমেই এই সার্বিকতা ঘটনাগুলোর স্বাতন্ত্র্যকে কমিয়ে দেয় না। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে এই অনন্য স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে মর্মগত সার্বিকতারই অভিব্যক্তি।

কোন নির্দিষ্ট জিনিস যে-সম্পর্কের নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মধ্যে উদ্ভূত হয় তার থেকেই সে গুণগত সত্তা হিসাবে তার অস্তিত্বের রূপ গ্রহণ করে। স্বতন্ত্রর উপর সার্বিকের "আধিপত্য" থাকে। সার্বিকের এই 'ক্ষমতা' অপ্রাকৃত কিছু নয়। এটা স্বতন্ত্র জিনিসের বাইরে কোন শক্তির মধ্যে লুকিয়ে থাকে না। এটা নিহিত থাকে স্বতন্ত্র জিনিসের মিথস্ক্রিয়ার ব্যবস্থার মধ্যে। এই মিথস্ক্রিয়ার ব্যবস্থায় প্রতিটি স্বতন্ত্র জিনিস সার্বিকতার 'আধারে' ঢালা হয়, সার্বিক একে সঞ্জীবিত করে এবং এর সঞ্জীবনী রসের স্বাদ নেয়। সার্বিকের নিয়ম অনুযায়ী স্বতন্ত্রের সত্তা বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে এটা সার্বিকের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। এটা জৈব প্রকৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। পরিবর্তনশীলতার মধ্যে দিয়ে জীবদেহ নতুন নতুন ও প্রয়োজনীয় গুণাবলী অর্জন করে। এই স্বতন্ত্র-ধর্ম বংশানুক্রমিকভাবে সঞ্চারিত হতে পারে এবং কালক্রমে শুধুমাত্র ঐ স্বতন্ত্র বস্তুর নয়, একাধিক স্বতন্ত্র বস্তুর ধর্ম হয়ে ওঠে, অর্থাৎ কোন এক নির্দিষ্ট প্রজাতির মধ্যে যে-বৈচিত্র্য থাকে, তার গুণ হয়ে ওঠে। পরে এই বৈচিত্র্য এক এক নতুন প্রজাতিতে রূপ নিতে পারে। ফলে একটা স্বতন্ত্র গুণ হয়ে ওঠে সার্বিক ও প্রাণীর বর্গগত গুণ। জীবদেহ বিকাশের ক্ষেত্রে তখনই সম্পূর্ণ বিপরীত প্রক্রিয়া চলতে থাকে, যখন কিছু কিছু প্রজাতির বর্গের গুণ শেষ হতে বা ক্ষীণ হতে শুরু করে। এই ধরনের গুণ কেবলমাত্র কয়েকটি জীবদেহের ধর্ম হয়ে ওঠে এবং পূর্বপুরুষের দোষগুণের পুনরাবৃত্তির আকারে ব্যতিক্রমী ধারা হিসেবে দেখা দেয়। এইক্ষেত্রে সার্বিক স্বতন্ত্রতায় পরিণত হয়।

নিয়ম হিসেবে সার্বিকের কাজ স্বতন্ত্ররূপে ও স্বতন্ত্রর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সার্বিক প্রথমে ব্যতিক্রম হিসেবে, স্বতন্ত্ররূপে আবির্ভূত হয় (যেমন একটি নতুন জৈব প্রজাতির সৃষ্টি)। প্রথমে স্বতন্ত্র আকস্মিকভাবে আসে এবং পরে ক্রমশ নিয়মে পরিণত হয় এবং এইভাবে সার্বিকের চরিত্র পায়।

কিন্তু এই ধরনের নিয়ম সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে এটা বলা যায় না যে, সার্বিক স্বতন্ত্র থেকে সৃষ্টি হয়। সার্বিক ও স্বতন্ত্র উভয়ই ঐক্যবদ্ধ হয়। এই ঐক্য যেমন সার্বিককে সৃষ্টি করে, তেমনই স্বতন্ত্রও এই সঙ্গে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সৃষ্টি হয় ও ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। "...স্বতন্ত্র একমাত্র সেই সম্পর্কের মধ্যেই থাকে না যা সার্বিকের দিক নিয়ে যায়...প্রতিটি স্বতন্ত্র সার্বিকের মধ্যে অসম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করে, ইত্যাদি।

প্রতিটি স্বতন্ত্র অন্যান্য ধরনের স্বতন্ত্রর সাথে হাজারো পরিবর্তনের দ্বারা যুক্ত (বস্তু, ঘটনা, প্রক্রিয়া) ইত্যাদি।"[১]

জ্ঞান ও তার বাস্তব প্রয়োগ, উভয় ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র, বিশেষ ও সার্বিক—এসবের মধ্যে যে ডায়ালেক্‌টিক্‌স আছে, সে সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানে সামান্যীকরণের গুরুত্ব আছে এবং বিজ্ঞান সামান্য প্রত্যয় নিয়ে কারবার করে। এ সবের সাহায্যেই বিজ্ঞান নিয়ম প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় ও এর ফলে আমাদের বাস্তব কর্মে আমরা ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অর্জন করি। এইভাবে রাসায়নিক মৌল পদার্থের পর্যায়বৃত্ত, যা তাদের বেশীর ভাগ সাধারণ ধর্মের বৈশিষ্ট্য, তার ভিত্তিতে মেণ্ডেলিয়েভ তখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত রাসায়নিক মৌল পদার্থের অস্তিত্ব সম্পর্কে আগে থেকেই বলতে পেরেছিলেন।

তত্ত্বগত সামান্যীকরণের মধ্যেই নিহিত আছে বৈজ্ঞানিক চিন্তার অসাধারণ ক্ষমতা। সার্বিক শুধুমাত্র স্বতন্ত্র ও বিশেষের প্রতিবিম্বনের মধ্যে দিয়ে একই সঙ্গে প্রকাশ পায়। এইভাবেই একটি প্রত্যয়ের মধ্যে বিশেষ ও সার্বিক বৈচিত্র্যে ভরপুর হয়ে ওঠে। আমরা যদি স্বতন্ত্রের অনুশীলন অবহেলা করি, তাহলে সার্বিক ও বিশেষ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ থাকবে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা দুটো পথ নিতে পারে ঃ চিন্তার বিভাজক রেখা হিসেবে স্বতন্ত্র থেকে বিশেষে এবং বিশেষ থেকে সার্বিকে এবং সার্বিক ও সামান্য থেকে বিশেষে এবং বিশেষ থেকে স্বতন্ত্রে। এঙ্গেলস লিখেছিলেন, "ঘটনা এই যে সমস্ত প্রকৃত ও পর্যাপ্ত জ্ঞান একমাত্র অর্জিত হয় চিন্তার মধ্যেকার স্বতন্ত্র উপাদানকে স্বাতন্ত্র্য থেকে বিশেষতায় এবং তা থেকে সার্বিকতায় উন্নীত ক'রে, সসীমের মধ্যে অসীমকে, সান্তর মধ্যে অনন্তকে সন্ধান ও প্রতিষ্ঠা ক'রে। তবে সার্বিকতার রূপ আসলে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার রূপ—তাই এ অনন্ত ; এটা হ'ল বহু সসীমের মধ্যে অসীমকে হৃদয়ঙ্গম করা।"[২]

সার্বিক, বিশেষ ও স্বতন্ত্রের ডায়ালেকটিক মিথস্ক্রিয়ার উপলব্ধি থেকে আমরা সামাজিক জীবনের ঘটনাবলীকে জানবার পদ্ধতি লাভ করি। সমকালীন শোধনবাদীরা সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সাধারণ নিয়মের তাৎপর্যকে অস্বীকার বা খাটো করার চেষ্টা করে। তারা স্বতন্ত্র ও বিশেষকেই চূড়ান্ত করে তোলে এবং শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ দেশে প্রয়োগ করা যায় এমন "মডেল" নির্মাণের চেষ্টা করে ; এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ঘটে জাতীয় বিচ্ছিন্নতা ও জাতীয় স্বার্থে আন্তর্জাতিক স্বার্থের বিরোধিতায়। মতান্ধতাও কম বিপজ্জনক নয়, যার সারকথা হ'ল সাধারণ সত্যকে চূড়ান্ত মনে করা, প্রত্যেকটি দেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে নির্দিষ্টভাবে বিশ্লেষণ ও হৃদয়ঙ্গম করার অক্ষমতা। কতটা

১ ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ৩৬১ পৃঃ।

২ এফ. এঙ্গেলস, ডায়ালেকটিকস অব নেচার, ২৩৪ পৃঃ।

সর্বাঙ্গীণভাবে সমাজ-বিপ্লবের সাধারণ নিয়ম ও এর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করা হ'য়েছে, তার উপর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে।

৩ কারণ ও কার্য

ঘটনাবলীর অনুশীলনে সমস্ত বিজ্ঞানই এগুলোর উদ্ভব, বিকাশ ও রূপান্তর, তাদের অন্য ঘটনায় পরিণতি অথবা তাদের বিনাশের কারণগুলিকে উদ্ঘাটন করতে চায়। ঘটনাবলী ও প্রক্রিয়াসমূহের জ্ঞান বলতে আসলে তাদের উদ্ভব ও বিকাশের কারণসমূহের জ্ঞানই বোঝায়। কার্য-কারণ সম্পর্কে ঘটনাবলীর বিশ্বজনীন নিয়মাধীন সংযোগের অন্যতম রূপ। "কারণ" এবং "কার্যের" প্রত্যয় সূত্রায়িত করতে মানুষ সমগ্র বাস্তব প্রক্রিয়ার কতকগুলি দিককে বিচ্ছিন্ন করে। "পৃথক পৃথক ঘটনাকে বুঝতে আমাদের সেগুলিকে সাধারণ আন্তঃসম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হয় এবং সেগুলোকে পৃথকভাবে বিচার করতে হয় এবং তখন একটা কারণ এবং অন্যটা কার্য হিসেবে পরিবর্তনশীল গতির প্রকাশ ঘটে।"[১]

কার্য ও কারণ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যয়। যে-ঘটনা অন্য ঘটনার জন্ম দেয় সেটা হলো এর সম্পর্কিত **কারণ**। একটি কারণের ক্রিয়ার ফলই হল **কার্য**। কার্য-কারণ সম্পর্ক হলো ঘটনাবলীর মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক—এর একটা থাকলেই অন্যটা অবশ্যই তার অনুসারী হবে। যেমন জলের বাষ্পে পরিণত হওয়ার কারণ হ'ল তাপ দেওয়া, কারণ যখনই জলে তাপ দেওয়া হয় তখনই তার অনুসারী প্রক্রিয়া হ'ল বাষ্পের সৃষ্টি।

কারণ ও কার্য প্রত্যয়টি গড়ে উঠেছে সামাজিক প্রয়োগ ও জাগতিক জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে। এগুলির মাধ্যমেই চিন্তা বাস্তব জগতের গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলিকে প্রতিবিম্বিত করে, যার জ্ঞান মানুষের ব্যবহারিক কাজে প্রয়োজন। যখন কোন ব্যক্তি ঘটনা ও প্রক্রিয়াগুলির কারণ খুঁজে বের করে, সে তখন ওগুলোকে প্রভাবিত করতে পারে, কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করতে পারে, পুনর্জীবিত করতে পারে অথবা তাদের উদ্ভব রোধ করতে পারে। যেসব কারণ ও অবস্থা থেকে ঘটনার উৎপত্তি হয়, সে সম্পর্কে অজ্ঞতা মানুষকে অসহায় করে রাখে। অন্যদিকে কারণের জ্ঞান মানুষ ও সমাজকে ফলপ্রসূ কর্মের সুযোগ দেয়।

কারণ কার্যের পূর্বগামী। তার অর্থ এই নয় যে, পূর্বগামী হলেই ঘটনা পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে কারণের সম্পর্কে আবদ্ধ। রাত্রি দিনের পূর্বগামী কিন্তু এটা দিনের কারণ নয়। কারুরই পার্থিব ঘটনার কালানুক্রমকে কার্যকারণ

১ এফ. এঙ্গেলস, ডায়ালেকটিকস অফ নেচার, ২৩২ পৃঃ।

সম্পর্কের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি কখনও-কখনও বলে যে যুদ্ধের কারণ হ'ল ধূমকেতু বা সূর্য গ্রহণ অথবা যুদ্ধ লাগার পূর্ববর্তী অমুক প্রাকৃতিক বা সামাজিক ঘটনা।

কারণকে উপলক্ষ্য থেকে পৃথক করা উচিত। উপলক্ষ্য কোন ঘটনার ঠিক আগে দেখা দেয় এবং ঘটনাকে সম্ভব করে কিন্তু অনিবার্যভাবে ঘটনার জন্ম দেয় না বা নিয়ন্ত্রণ করে না। উপলক্ষ্য ও কার্যের মধ্যে সম্পর্ক হল বাহ্যিক (ভাসাভাসা), মূলগত নয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯০৫ সালের জুন মাসে পোটেমকিন যুদ্ধ-জাহাজের ওপর বিদ্রোহের উপলক্ষ্য ছিল নাবিকদের পচা মাংস সরবরাহ করা। এর কারণ কিন্তু ছিল ক্ষয়িষ্ণু জারতন্ত্র এবং জনগণের মধ্যে সংঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী মনোভাবের বিকাশ। পচা মাংসের ব্যাপারটা ছিল উপলক্ষ্য, একটা প্রেরণা যা বিদ্রোহকে উসকে দিয়েছিল কিন্তু দুটো ঘটনার মধ্যেকার সম্পর্ক ছিল ভাসাভাসা ও আকস্মিক। বিদ্রোহটা অন্য কোন ঘটনার দ্বারাও সমানভাবেই বিস্ফারিত হ'তে পারত।

ঘটনাবলীর কার্যকারণ সম্পর্ক হ'ল বিষয়গত এবং সার্বিক চরিত্রের। জগতের সমস্ত ঘটনা, সমস্ত পরিবর্তন-প্রক্রিয়া কতকগুলি কারণ থেকেই উদ্ভূত হয়। কারণহীন ঘটনা বলে কিছু নেই, থাকতেও পারে না। প্রত্যেক ঘটনার নিজস্ব কারণ থাকতে হবে। আমরা ঘটনাবলীর কারণ নির্ধারণ করতে পারি, যদিও তার সঠিকতা কম-বেশি হতে পারে। কতকগুলির কারণ আমাদের কাছে এখনও অজ্ঞাত কিন্তু তাদের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র ক্যানসারের কারণ এখনও পুরোপুরি আবিষ্কার করতে পারে নি অথচ এর কারণ এখনও আছে এবং একদিন তা আবিষ্কৃত হবে।

কার্যকারণ-সম্পর্কিত প্রশ্নে বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক রয়েছে। বস্তুবাদীরা ঘটনাবলীর বস্তুগত কার্য-কারণ সংযোগ এবং তার ইচ্ছা ও চেতনা-নিরপেক্ষ অস্তিত্বকে এবং মানব চেতনায় এর কম-বেশি প্রতিবিম্বনকে স্বীকার করে। অন্যপক্ষে, ভাববাদীরা হয় বাস্তবতার সকল কার্য-কারণ সম্পর্ক অস্বীকার করে, না হয় কার্য-কারণকে বাস্তব জগৎ থেকে উৎসারিত বলে মনে করে না; বরং এটাকে তারা চেতনা থেকে, বুদ্ধি থেকে ও কল্পিত অতিপ্রাকৃত শক্তির ক্রিয়া বলে মনে করে।

সমস্ত ঘটনাবলী কারণ-নিয়ন্ত্রিত—এই বক্তব্যের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধের নিয়মটি প্রকাশ পায়। যে সমস্ত দার্শনিক এই নিয়মকে মানেন এবং ঘটনাবলীর ওপর প্রয়োগ করেন, তাঁদের বলা হয় হেতুবাদী (determinist)। যে-সমস্ত দার্শনিক কার্য-কারণ সম্পর্কের নিয়ম মানেন না, তাঁদের বলা হয় অনির্দেশ্যবাদী (indeterminist)। কার্য-কারণ সম্বন্ধের নিয়ম অনুসারে প্রকৃতি এবং সমাজের সমস্ত ঘটনাকে প্রাকৃতিক কারণের মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা হয় এবং

অতিপ্রাকৃত শক্তির সম্ভাবনা স্বীকৃত হয় না। সুসঙ্গত বস্তুবাদী হেতুবাদে ঈশ্বর বা কোন ধরনের অলৌকিক ব্যাপার, রহস্যবাদ বা ঐ রকম কিছুর স্থান নেই।

দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায় ইংরেজ দার্শনিক হিউম কার্য-কারণ সম্বন্ধের বাস্তবতাকে অস্বীকার করতেন। আমরা ঘটনাপুঞ্জের কার্য-কারণ সম্বন্ধের জ্ঞানলাভ করি অভিজ্ঞতা থেকে, হিউমের এ বক্তব্য সঠিক কিন্তু তাঁর যুক্তির বাকি অংশ ভুল পথে পরিচালিত। হিউম অভিজ্ঞতাকে আত্মগত সংবেদন-সর্বস্ব করে তুলেছেন এবং তাদের বিষয়গত আধেয়কে অস্বীকার করেছেন। অভিজ্ঞতায় আমরা লক্ষ্য করি যে একটা জিনিস আর একটার অনুসারী, কিন্তু হিউমের মতে, প্রথমতঃ, একথা আমাদের বিশ্বাস করার কোন ভিত্তি নেই যে আগেরটা পরেরটার কারণ, এবং দ্বিতীয়তঃ, অতীত ও বর্তমান অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ অনুমান করারও ভিত্তি নেই। হিউমের সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত এইখানে এসে দাঁড়ায়ঃ কার্য-কারণ সম্বন্ধ নিছক সংবেদন ও ধারণার পর্যায়-ক্রমিক, অভ্যাসগত সংযোগ এবং এর ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী করা সেই সংযোগের জন্যে আশা প্রকাশ করা মাত্র। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার মধ্যে এই আশার ভিত্তি রয়েছে যে ভবিষ্যতেও ঘর্ষণের ফলে তাপ উৎপন্ন হয় কিন্তু এই প্রক্রিয়ার বাস্তবতা ও অপরিহার্যতা সম্বন্ধে কোন নিশ্চিতি নেই বা থাকতেও পারে না।

বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে ডায়ালেকটিক্স এটা জোরের সঙ্গে বলে যে, কার্য-কারণ সম্পর্কের বাস্তবতার প্রমাণ মেলে প্রয়োগের মধ্যে। এঙ্গেলস লিখে-ছিলেন…"কতকগুলি প্রাকৃতিক ঘটনার নিয়মিত পর্যায়ক্রম আপনা-থেকেই কার্য-কারণ সম্পর্কিত ধারণার জন্ম দিতে পারেঃ সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে আলো ও তাপ আসে, কিন্তু এটা কোন প্রমাণ দেয় না এবং এইটুকু পর্যন্তই হিউমের সংশয়বাদ সত্য উক্তি করেছে যে আগের ঘটনা পরের ঘটনাকে প্রতিষ্ঠা করে না। কিন্তু মানুষের কার্যকলাপ কার্য-কারণ সম্বন্ধের পরীক্ষার ভিত্তি। যদি আমরা অবতল আয়নার মধ্যে দিয়ে সূর্য-রশ্মির বিকিরণ ঘটাই এবং সাধারণ অগ্নিশিখার মতো কাজ করাই, তদ্দ্বারা আমরা প্রমাণ করি যে, সূর্য থেকেই তাপ আসে।"[১] কারণ অনুসারী আশানুরূপ কার্য ঘটে না—এই তথ্যটি কার্যকারণ সম্পর্কের বাস্তবতাকে অপ্রমাণিত করে না, বরং প্রমাণই করে। বন্দুক থেকে সব সময় গুলি ছোটে না। কিন্তু যখনই এটার গুলি ছোটে না, তখনই কেন এটা ঘটলো (ভেজা বারুদ, নষ্ট ক্যাপ ইত্যাদি) আমরা তার বস্তুগত কারণগুলোকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হই। কাণ্ট এ ব্যাপারে হিউমের সঙ্গে একমত হন নি যে, কার্যকারণ সম্পর্ক শুধুমাত্র সংবেদনের অভ্যাসগত সংযোগ। কাণ্ট কার্য-কারণ সম্পর্কের অস্তিত্বকে অনিবার্য চরিত্রের বলে স্বীকার করতেন,

১ এফ. এঙ্গেলস, ডায়ালেকটিকস অফ নেচার, ২৩০ পৃঃ।

যদিও তা বাস্তব জগতের নয় বরং মনের মধ্যে। তিনি এটাকে অভিজ্ঞতার ধর্ম বলে মনে করেন নি; কার্য-কারণ সম্পর্ক অভিজ্ঞতাপূর্ব, বুদ্ধির সহজাত প্রত্যয়, যার ভিত্তিতে নানারকম প্রত্যক্ষণকে সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

কাণ্ট ও হিউমের কার্য-কারণ সম্পর্কিত ভাববাদী মতকে নতুন করে নানা রকমের ভাষা দিয়ে হাজির করলো নব্য কাণ্টপন্থী এবং নব্য প্রত্যক্ষবাদীরাও, বিশেষতঃ মাখপন্থীরা। আর্নস্ট মাখ জোর দিয়ে বললেন প্রকৃতিতে কোন কার্য-কারণ নেই এবং সমস্ত রকম কার্য-কারণের বোধ আমাদের আত্মগত আকাঙ্ক্ষাজাত। কার্য-কারণ সম্পর্কিত হিউমের মত পুনরাবৃত্তি করেছেন বার্ট্রান্ড রাসেল। তিনি কারণ প্রত্যয়টিকে কর্মের দিশারী হিসেবে বিজ্ঞান-পূর্ব সামান্যীকরণ বলে মনে করতেন। কার্য-কারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যায় হিউম রাসেলের মধ্যে পার্থক্য এই যে, রাসেলের মতানুসারে কার্যকারণ সম্পর্কের নিয়মটি অভ্যাস-নির্ভর নয় (যা হিউম মনে করতেন) বরং তার ভিত্তি প্রাণীজগতের বিশ্বাসের উপর যা ভাষার মধ্যে গভীরভাবে নিহিত রয়েছে: "কতকগুলি অভিজ্ঞতার বাহ্যিক কারণের মধ্যে বিশ্বাসটি আদিম এবং এক অর্থে প্রাণীদের আচরণের মধ্যে অন্তর্নিহিত।"[১]

বহু আধুনিক ভাববাদী দার্শনিক এই ধারণার ওপর জোর দেন যে, "কারণ" শব্দটি দার্শনিক পরিভাষা থেকে বাদ দেওয়া উচিত। তাঁদের মতে কার্য-কারণ তত্ত্ব রাজতন্ত্রের মতোই অচল। কার্য-কারণের নিয়মকে **সংযোগের অপেক্ষক-এর** (Functional Connection) নিয়মের দ্বারা অপসারণ করা হচ্ছে। এইভাবে বলা উচিত নয় যে 'ক' ঘটনাটি 'খ' ঘটনার কারণ; এইভাবে বলা উচিত যে 'ক' ও 'খ' পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। ('ক' সর্বদা 'খ' এর সঙ্গে থাকে; হয় 'ক' এর আগে, নয় পরে)।

পরিবর্তন-ক্রিয়াজাত সংযোগের অপেক্ষক (functional) প্রত্যয়টি গণিত বিজ্ঞানের অন্যতম মৌলিক প্রত্যয়। এই প্রত্যয়টি ঘটনার মধ্যে অবস্থিত বিষয়গত সংযোগগুলোকে প্রতিবিম্বিত করে। দুটি পরিমাণ (x ও y) নিম্নলিখিত সম্পর্কে হতে পারে: যদি x-এর মূল্য (valuc) পরিবর্তিত হয় তাহলে x এবং y-এর মধ্যে একটা অপেক্ষক (functional) সংযোগ থাকবে। y ও তাহলে x-এর একটা ক্রিয়া, এই সূত্র অনুসারে $y = f(x)$। একটি পরিমাণ হ'ল নির্ভরশীল বিষম রাশি; অন্যটি হ'ল অন্য-নিরপেক্ষ। যেমন, অতিক্রান্ত দূরত্ব হ'ল কালের একটি ক্রিয়া, আর তাই কোন একটি গতির বেগ বৃদ্ধি পেলে কালক্রমে ঐ দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে।

বাহ্যিক, অনপরিহার্য, এমনকি বিধিবহির্ভূত নির্ভরতা সমেত সকল রকম নির্ভরতাকে পরিবর্তন-ক্রিয়াজাত সংযোগরূপে পাওয়া সম্ভব। কার্য-কারণ

---

১ বার্ট্রাণ্ড রাসেল, হিউম্যান নলেজ, ইটস স্কোপ এণ্ড লিমিটস, সাইমন এণ্ড স্থষ্টার, নিউইয়র্ক, ১৯৬২, ৪৫৬ পৃঃ।

সম্পর্ককে ক্রিয়ামূলক নির্ভরতা হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে ; ফল হ'ল কারণের ক্রিয়া। যাই হোক, এটা কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্যে যা গুরুত্বপূর্ণ তাকে ঝাপসা করে দেয় ; কারণ বাস্তব ঘটনা হিসেবে কার্যের সৃষ্টি করে ও তাকে নির্ভরশীল করে ; আবার এই কার্যটিও আর একটি বাস্তব ঘটনা।

সংযোগের অপেক্ষকের কাঠামোর মধ্যে বাহ্যিক, অসারাত্মক, এমনকি নিয়ম-বহির্ভূত নির্ভরতা সমেত সমস্ত রকম নির্ভরতাকেই পাওয়া যেতে পারে। কার্য-কারণ সম্পর্কও অপেক্ষকের নির্ভরতার কাঠামোর মধ্যে বিচার করা যায়, এখানে কার্য হয়ে দাঁড়ায় কারণের সংযোগ-ক্রিয়া। অবশ্য কার্যকারণ সম্পর্কের যা প্রকৃত বিষয় তার সব কিছুই এখানে ঝাপসা হয়ে যায় ; বাস্তব ঘটনা হিসেবে কারণ কার্যের সৃষ্টি করে ও তার নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। এই কার্যও আবার একটি বাস্তব ঘটনা। ভাববাদীরা এই অজুহাতে কার্য-কারণ সম্পর্ককে পরিবর্তন ক্রিয়াজাত নির্ভরতার মধ্যে মিলিয়ে দেয় যে, কেমন করে ঘটনার সৃষ্টি হয় অথবা তাদের অস্তিত্বের কোন কারণ আছে কিনা, তাতে বিজ্ঞানের কোন আগ্রহ নেই ; ঘটনাগুলির মধ্যে (অথবা পরিমাণের মধ্যে) কোন নির্ভরতা আছে কিনা যাকে কোন সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা যায়, বিজ্ঞানের আগ্রহ শুধু তাতেই। কিন্তু এটা অযৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি। প্রকৃত কার্য-কারণ সম্পর্কের জ্ঞানই মানুষের ব্যবহারিক কাজকর্মের ভিত্তি। কারণ জেনে আমরা সেইসব ঘটনা ঘটাতে পারি যা সমাজের পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত অথবা সেইগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি, যেগুলো অবাঞ্ছিত বা ক্ষতিকর।

কিছু ভাববাদী কার্য-কারণ সম্পর্কের বিকল্প হিসেবে ভিত্তি (Ground) ও অনুবর্তীর (consequent) যৌক্তিক সম্পর্ক তুলে ধরেন। প্রচলিত যুক্তি বিজ্ঞানে ভিত্তি এমন একটা ধারণা যার থেকে অন্য ধারণা অনুসৃত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, ঘরের মধ্যে স্বাভাবিক তাপমাত্রা আছে এই বিবৃতি থেকে আর একটি ধারণা অনুসৃত হয় যে, থার্মোমিটারের তাপমাত্রা ২০° সেন্টিগ্রেড। তাপমাত্রা দেখা ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রার কারণ নয় বরং সেখানকার তাপ সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি।

কার্য-কারণ সম্পর্ক কোন আনুমানিক ধারণার মধ্যেকার সম্পর্ক নয় বরং প্রকৃত ঘটনার সংযোগ, যার একটা আর একটাকে জাগিয়ে তোলে। আমাদের যুক্তির মধ্যের ধারণাগুলির যৌক্তিক সম্পর্কটি (ভিত্তি ও অনুবর্তীর সম্পর্ক) কার্য-কারণের নির্ভরতাসমেত বাস্তবতার মধ্যেকার জিনিসগুলির সম্পর্কের প্রতিফলন। অবশ্য কারণ ও ভিত্তির মধ্যেকার পার্থক্য থেকে এটা বেরিয়ে আসে না যে চিন্তার ক্ষেত্রে শুধু বিশুদ্ধ যৌক্তিক সম্পর্কই ক্রিয়াশীল এবং কার্য-কারণ সূত্রকে যথেষ্ট ভিত্তির সূত্রদ্বারা অপসারিত করা যায়। যে কোন চিন্তাই কার্য-কারণ সম্পর্কের অধীন।

বিদেশের কিছুসংখ্যক পদার্থ বিজ্ঞানী কার্য-কারণ সম্পর্কের নীতিকে

আক্রমণ করছেন। তাঁরা এই অভিমত পোষণ করেন যে, আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান এই ধারণা বাতিল করেছে যে সব ঘটনার পেছনে একটা কারণ রয়েছে। তাঁদের বিশ্বাস যে, সূক্ষ্ম প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে কার্য-কারণের বাধ্যবাধকতা নেই। কোন ক্ষুদ্র কণাই, যেমন ইলেকট্রন, কার্যকারণ সম্পর্কের নিয়ম মেনে চলে না; প্রত্যেকটিই নানারকম সম্ভাবনার মধ্যে থেকে নিজের ইচ্ছেমতো পথ বেছে নেয়। সচরাচর এটাকে অনিশ্চয়তার সম্পর্ক হিসেবে যুক্তি দেওয়া হয়। এটা ঠিক যে বৃহৎ প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে যেখানে কেউ একই সঙ্গে কোন বস্তুদেহের অবস্থান ও বেগ নির্ণয় করতে পারে, সেখানে সূক্ষ্মকণার অবস্থান (স্থানাঙ্ক) ও বেগকে (ঘাত) যুগপৎ চূড়ান্ত নির্ভুলতার সঙ্গে নির্ণয় করা যায় না। পদার্থ বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত সূক্ষ্মকণাদের গতির নিয়ম সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যসূচক কার্যকারণ সম্পর্কের ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না; এই ধারণা ইতিহাসে লাপ্লাসীয় হেতুবাদ নামে পরিচিত (ফরাসী বিজ্ঞানী পিয়ের সাইমন ডি লাপ্লাসের নাম অনুসারে)।

লাপ্লাসীয় অথবা যান্ত্রিক ধরনের হেতুবাদ বড় বড় বস্তুর বাহ্যিক, যান্ত্রিক গতির গবেষণার ফলে সৃষ্টি হয় এবং তাতে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে স্থানাঙ্ক (co-ordinates) ও ঘাত (impulse) সম্বন্ধে একই সঙ্গে সঠিক জ্ঞানলাভ সম্ভব। পরমাণুর মধ্যে ক্রিয়ারত প্রক্রিয়াগুলির বর্ণনা দিতে গিয়ে আমরা ক্ষুদ্রকণার বিশেষ ধর্মগুলির সম্মুখীন হই (একই সঙ্গে কণিকা ও তরঙ্গ) এবং এখানে বৃহৎ বস্তুর জন্যে উদ্ভাবিত স্থানাঙ্ক ও ঘাতের পুরানো প্রত্যয়গুলি প্রযোজ্য নয়। কিন্তু সূক্ষ্মকণার জগতে অনিশ্চয়তার সম্পর্কের সূত্র থেকে এটা বেরিয়ে আসে না যে কার্যকারণ সম্পর্কের নিয়মকে আমাদের অস্বীকার করতে হবে। এই সম্পর্কের নিয়ম শুধু একটি বিষয়কেই তুলে ধরে—সব ঘটনারই কারণ আছে। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ঠিক কিভাবে এই নিয়ম কাজ করে, চূড়ান্ত নির্ভুলতার সঙ্গে ক্ষুদ্র কণিকার স্থানাঙ্ক ও ঘাত একই সঙ্গে নির্ণয় করা সম্ভব কিনা—এসব পৃথক প্রশ্ন। এসবের সমাধান সেই বিশেষ বিশেষ বস্তুর নির্দিষ্ট ধর্মের জ্ঞানের সঙ্গে জড়িত।

আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান কার্য-কারণ সম্পর্কের নিয়মের সার্বিকতা এবং এর প্রকাশের বিভিন্ন রূপকে প্রতিপন্ন করে বিচিত্র তথ্যসম্ভার জোগান দিচ্ছে। এইভাবে ইলেকট্রন ও পজিট্রন যে-কৌণিক অবস্থানে সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে, (বিশেষ পরিস্থিতিতে এরা দুটি ফোটনে রূপান্তরিত হয়) তাকে এবং তাদের বেগকে জেনে একজন দুটি ফোটনের গতিপথ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। নিশ্চিতভাবেই এটা সূক্ষ্মকণার জগতে কার্য-কারণ সম্পর্কের প্রমাণ।

বাস্তবতার সকল ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্কের বিষয়গত চরিত্র সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের পূর্বসূরী বস্তুবাদীরা প্রমাণ দিয়েছেন এবং তা সমর্থন করেছেন, কিন্তু তাঁরা যান্ত্রিক ধরনের কার্য-কারণ সম্পর্কের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই

নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন ; তাঁদের কাছে কারণ সবসময়ই কার্যের বাহ্যিক সম্পর্ক।

যদি আমরা বস্তুর গতির যান্ত্রিক ধরনের কার্য-কারণ সম্পর্ককেই ঘটনাপুঞ্জের একমাত্র নিয়মাধীন সংযোগ বলে মনে করি, তাহলে আমরা কার্য-কারণ সূত্রের একটা আধিবিদ্যক, অতি-সরলীকৃত উপলব্ধিতে পৌঁছাই। বাস্তবে, কার্যকারণ সম্পর্কগুলি খুবই বিভিন্ন প্রকারের। যেমন, জীব-বিজ্ঞানের কার্যকারণ সূত্রকে আমাদের জানা বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা অথবা রসায়নবিদ্যার কার্যকারণ সূত্রে পর্যবসিত করা যায় না। সমাজ-জীবনের কার্যকারণ সম্পর্ক তো আরও জটিল। সেখানে বিষয়গত সম্ভাবনাগুলি মানুষের উদ্দেশ্যমূলক ও সচেতন-কার্যকলাপের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস কার্যকারণ সম্পর্কের আধিবিদ্যক ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেছে। এটা দেখিয়েছে যে কারণ ও কার্যের মধ্যে সম্পর্কটা পারস্পরিক ধরনের। কারণ কার্য ঘটায় কিন্তু কার্যও কারণকে প্রভাবিত ও পরিবর্তন করতে পারে। এই মিথস্ক্রিয়ার প্রবাহধারার মধ্যে দিয়েই কারণ ও কার্যের অবস্থান পরিবর্তিত হয়, "...যার ফলে এখানে যা কার্য পরে অন্য ক্ষেত্রে সেটাই কারণ এবং এইভাবেই চলে।"[১] উদাহরণস্বরূপ, রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ ছিল ভূমিদাস প্রথা অবসানের কারণ কিন্তু ভূমিদাস প্রথার অবসান পালাক্রমে পুঁজিবাদ বিকাশের হারকে দ্রুততর করার কারণ হয়েছিল।

কারণ ও কার্যের মিথস্ক্রিয়ার অর্থ তারা পরস্পরের দ্বারা নিরন্তর প্রভাবিত হয়, যার ফলে কারণ ও কার্য উভয়েই পরিবর্তিত হয়। এই মিথস্ক্রিয়া বাস্তব ঘটনাসমূহের পরিবর্তনের অভ্যন্তরীণ (causa sui— নিজেই নিজের কারণ) কারণ। যদি জগৎকে বিভিন্ন ঘটনাবলীর মিথস্ক্রিয়া হিসেবে দেখি, তাহ'লে আমরা এটা অনুধাবন করি যে, এর গতি ও বিকাশের জন্যে কোনো বাইরের ধাক্কা, কোন অতিপ্রাকৃত শক্তি, যেমন ভগবানের প্রয়োজন হয় না। এই কারণেই এঙ্গেলস হেগেলের এই বক্তব্যকে সঠিক বলে মনে করেছিলেন যে, মিথস্ক্রিয়াই সব কিছুর চূড়ান্ত কারণ (causa finalis)।

অবশ্য মিথস্ক্রিয়াশীল শক্তি ও উপাদানগুলোর গুরুত্ব সমান নয়। বিজ্ঞানের কাজ হ'ল মিথস্ক্রিয়ার শক্তিগুলোর ব্যবস্থার মধ্যে যা চূড়ান্ত, নিয়ামক সেই কারণগুলোকে উদ্‌ঘাটন করা।

পরিবেশগত পরিস্থিতি কার্যকারণের মিথস্ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এই পরিস্থিতিকে 'অবস্থা বা শর্ত' শব্দটির দ্বারা বোধানো হয়। শর্ত হ'ল এমন পরিস্থিতি যা কোনো কিছু সংঘটনের জন্যে একান্ত আবশ্যকীয়, কিন্তু এ

১. এফ. এঙ্গেলস, এ্যান্টিড্যুরিং. ৩২ পৃঃ।

আপনা থেকেই কোনো প্রবর্তনা সৃষ্টি করতে পারে না। তাই একটি রোগজীবাণু কোনো শর্ত বা অবস্থার উপর অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে রোগের কারণ হ'তে পারে। এই অবস্থায় কতকগুলো উপাদান কার্যকে অনুপ্রাণিত করতে পারে, আর অন্যেরা তার প্রতিবন্ধকতা করতে পারে।

যে কারণ ও শর্তের অধীনে ঐগুলো কাজ করে, তার জ্ঞান প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ও নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষে সহায়ক হয়। ইউরেনিয়াম কেন্দ্রকের বিদারণ নানা রকমের অবস্থার ওপর নির্ভর করে শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটাতে বা ধীরে, ক্রমাগত তাপ বিকিরণ করতে পারে। এই তথ্য মানুষ তার ব্যবহারিক কাজকর্মে লাগায়। ধীর তাপ বিকিরণকে কতকগুলো ব্যাধি নিরাময়কারী ওষুধে, কৃষি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

অবস্থার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন কারণ থেকে একটি মাত্র কার্য ঘটতে পারে, বিপরীতভাবে, একটি মাত্র কারণ বিভিন্ন কার্য ঘটাতে পারে। প্রথম সূত্রটি ব্যাখ্যা করার জন্যে বলা যায় যে, ইউরেনিয়াম কেন্দ্রকের বিদারণ এবং হাইড্রোজেন কেন্দ্রকগুলোর হিলিয়াম কেন্দ্রকে সংশ্লেষণ—উভয় প্রক্রিয়া থেকেই প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া যেতে পারে।

ঘটনাবলীর কার্যকারণের আন্তঃসম্পর্কের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সেগুলো থেকে বিশ্বের বহুবিচিত্র যোগসূত্রের হদিশ পাওয়া যায় না। লেনিন লিখেছিলেন, "সাধারণতঃ কার্যকারণ সম্পর্ক বলতে আমরা যা বুঝি, তা বিশ্বজনীন আন্তঃসংযোগের তুচ্ছ অংশ মাত্র কিন্তু সেই অংশটি আত্মগত নয়, প্রকৃত বিষয়গত আন্তঃসম্পর্ক।"[১] ঘটনাগুলি নানা ধরণের সম্পর্কযুক্ত—সাময়িক, দৈশিক ইত্যাদি, যা কার্য-কারণ সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু শুধু একে ঐ প্রত্যয়েই পর্যবসিত করা যায় না। বিজ্ঞান শুধু কার্যকারণ সম্পর্কের আন্তঃসংযোগের অনুশীলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; তাকে ঘটনার নিয়মাধীন যোগসূত্রগুলোকে অবশ্যই অনুশীলন করতে হবে।

৪ আবশ্যকতা ও আকস্মিকতা

এতক্ষণ আমরা দেখলাম বস্তুর নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত-সংযোগ ও সম্পর্কগুলো হ'ল অপরিহার্য ও আবশ্যকীয়। **আবশ্যকতা** হ'ল বাস্তবতার মধ্যেকার বস্তু, ঘটনা, প্রক্রিয়া ও বিষয়সমূহের স্থায়ী ও মর্মগত সংযোগ—যা তাদের বিকাশের সমগ্র পূর্ববর্তী গতিপথের দ্বারা প্রভাবিত। আবশ্যকতা উৎসারিত

১ ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ১৬০ পৃঃ

হয় বস্তুর মর্ম থেকে এবং কয়েকটি অবস্থায় তা উৎসারিত হতে বাধ্য। আবশ্যিক ও অনিবার্যতার মধ্যে একটা পার্থক্য টানা দরকার। যা কিছু আবশ্যিক তাই অনিবার্য নয়। আবশ্যিক অনিবার্য হয়ে ওঠে যখন অন্য সব সম্ভাবনা বাতিল হ'য়ে গিয়ে একটি মাত্র সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকে। যেমন, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা বস্তুর গতিকে প্রতিরোধ করতে পারে; এটা হ'ল অনিবার্য আবশ্যকতা। নিম্নতর সমাজব্যবস্থার উচ্চতর সমাজব্যবস্থার দ্বারা অপসারণও ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য; এটা সামাজিক বিকাশ-ধারার মর্মজাত এবং সমাজ বিকাশের অভ্যন্তরীণ নিয়মের মধ্যেই এটি নিহিত থাকে।

কিন্তু জগতের সব ঘটনাই কি আবশ্যকতা থেকেই ঘটে? না, আকস্মিক ঘটনাও রয়েছে। আকস্মিকতা হল তাই যা কতকগুলো অবস্থায় ঘটতেও পারে, না ঘটতেও পারে, আবার কোনো না কোনোভাবে ঘটতেও পারে। জগৎ সম্বন্ধে একটি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি হল, বিশ্বে, সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে সব কিছুই ভগবানের দ্বারা, ভাগ্যের দ্বারা, পরমাত্মার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত, যার অন্ধশক্তি অপ্রতিরোধ্য। ভাগ্য ও নিয়তি বিশ্বাসই অদৃষ্টবাদ নামে পরিচিত।

ডায়ালেকটিকস সম্পর্কে অজ্ঞতা সাধারণতঃ আবশ্যকতা ও আকস্মিকতার মধ্যে বিরোধাভাসে নিয়ে যায়, যার ফলে একটি অপরটির দ্বারা বর্জিত হয়। যেমন ডেমোক্রিটাস বলেছিলেন, সব কিছুই আবশ্যকতার মাধ্যমে ঘটে। তিনি বলেছিলেন যে, মানুষ নিজের যুক্তিহীনতার অজুহাত হিসেবে আকস্মিকতার ধারণা খাড়া করে। যেসব দার্শনিক আকস্মিকতাকে অস্বীকার করেন, তাঁরা প্রায় সবাই এটাকে কারণের অভাবের সঙ্গে এক করে দেখেন। এর থেকেই এই ভুল সিদ্ধান্ত আসে যে, সব কিছুরই কারণ যেহেতু রয়েছে, তাই আকস্মিকতা অসম্ভব। এ-রকম একটা মত প্রকাশ করা হয় যে আমরা সেই ঘটনাগুলোকেই আকস্মিক ঘটনা বলে ভাবি, যাদের কারণ আমরা আবিষ্কার করতে বা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না; পক্ষান্তরে এই ঘটনাগুলো কার্যত আকস্মিক নয় বরং আবশ্যিক। উদাহরণস্বরূপ, স্পীনোজা বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃতিতে আকস্মিক কিছু নেই, সব কিছুই নির্ধারিত এবং প্রাকৃতিক আবশ্যিকতার জন্যে একটি সুনিশ্চিত ছক অনুসারে সব কিছু বজায় থাকবে ও কাজ করবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদীরাও জোর দিয়ে বলতেন যে সব কিছুই ঘটে চূড়ান্ত আবশ্যকতায় এবং পৃথিবীতে মোটেই আকস্মিক কিছু নেই। হলবাক বলতেন আমাদের সমস্ত জীবনই এমন একটা রেখা, যা আমরা প্রকৃতির নির্দেশে পৃথিবীর উপর আঁকতে থাকি; এর থেকে মুহূর্তের জন্যেও সরে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

আবশ্যকতাকে চরম বলে মনে করা আর আকস্মিকতাকে অস্বীকার করা

যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিরই যুক্তিসঙ্গত পরিণতি। লাপলাসের অবস্থানের মধ্যে এর সব চাইতে চমৎকার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছিলেন, "সব ঘটনাই, এমনকি যেগুলো একান্ত তুচ্ছ বলে প্রকৃতির শক্তিশালী নিয়মের অধীনতামুক্ত বলে মনে হয়, সেগুলোও সূর্যের আবর্তনের মতো আবশ্যিকতার ফল। যে বন্ধন তাদের সমস্ত বিশ্ব-ব্যবস্থার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করে, তার সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ওগুলোকে চূড়ান্ত কারণ বা আকস্মিকতার ওপর দাঁড় করায়, তারা নিয়মিতভাবে অথবা শৃঙ্খলা ছাড়া ঘটেছে বা অগ্রসর হচ্ছে কি না সেই অনুসারে ; আমাদের জ্ঞানের সীমার সঙ্গে সঙ্গে এইসব কাল্পনিক কারণ-গুলো ক্রমে ক্রমে অপসারিত হয়েছে এবং শক্তিশালী দর্শনের মুখোমুখি হয়ে সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হয়েছে, যা (এই দর্শন) এর মধ্যে দেখতে পেয়েছে শুধু অজ্ঞতার প্রকাশ, যার জন্যে আমরাই হচ্ছি সত্যিকারের কারণ।"[১]

আবশ্যকতাকে চূড়ান্ত করে তুললে তার বিপরীতে পরিণত হয়। আকস্মিকতাকে অগ্রাহ্য করে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদীরা আবশ্যকতাকে আকস্মিকতার পর্যায়ে এনে ফেলেছিলেন। হলবাক জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে, উগ্রপন্থীর খিটখিটেমী, বিজেতাদের হৃদপিণ্ডের রক্তের মধ্যে আলোড়ন, সম্রাটের বদহজম অথবা একজন স্ত্রীলোকের খেয়ালীপনা মানুষকে যুদ্ধে নিয়ে যাবার কারণ হতে পারে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে যূপকাষ্ঠে পাঠাতে, প্রাসাদ ও শহরগুলোকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে, বিভিন্ন জাতিকে দারিদ্র্য ও শোকসন্তপ্ত করে তুলতে, অনাহার ও সংক্রামক ব্যাধি-গ্রস্ত করতে এবং আগামী বহু শতাব্দী ধরে দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে ফেলতে পারে।

এখনকার প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকরা প্রকৃতি ও সমাজে আবশ্যকতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। তাই এল. উইটজেনস্টাইনের মতে শুধু যৌক্তিক আবশ্যকতা আছে—সেই আবশ্যকতা অনুযায়ী একটি বিবৃতি তার আনুপূর্বিক ধারা অনুসরণ করবে। উপরন্তু যৌক্তিক আবশ্যকতা কোন বিষয়গত নিয়মকে প্রতিবিম্বিত করে না বরং ভাষার প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত হয়।

আধিবিদ্যক চিন্তাধারা একটা বিকল্প খাড়া করে ঃ হয় জগতে আকস্মিকতার প্রাধান্য, যে ক্ষেত্রে আবশ্যকতার অস্তিত্ব নেই, না হয় আকস্মিকতা বলে কিছু নেই, আর যা কিছু ঘটছে তা অনিবার্য।

বাস্তবে, আবশ্যকতা "বিশুদ্ধ আকারে" নেই। যে কোন আবশ্যকীয় প্রক্রিয়া ঘটে বিবিধ আকস্মিকতার মধ্যে দিয়ে। আবশ্যকতা ও আকস্মিকতার মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল এই যে আবশ্যকতার সৃষ্টি ও অস্তিত্ব নির্ধারিত হয় কতকগুলো মর্মগত উপাদানের দ্বারা, আর আকস্মিক ঘটনা সাধারণত নির্ধারিত হয়ে থাকে বাহ্যিক বা গৌণ উপাদানের দ্বারা। এ রকম ভাবা ভুল হবে যে

[১] লাপলাস, এসেই ফিলসফিকে সুর লেস প্রবাবিলিটিস, প্যারী, ১৯২০, ৬ পৃঃ।

ঘটনাগুলো হয় আবশ্যিক আর না হয় আকস্মিক। আবশ্যকতা ও আকস্মিকতার ডায়ালেকটিকস এইখানেই যে **আকস্মিকতার রূপে আবশ্যকতা প্রকাশ পায় এবং এটা আবশ্যকতার পরিপূরক।** বিকাশের ধারায় আকস্মিকতা আবশ্যকতা হয়ে উঠতে পারে। তাই জৈব প্রজাতির নিয়মাধীন গুণধর্ম প্রথম দেখা দিয়েছিল অন্য প্রজাতির বৈশিষ্ট্য থেকে আকস্মিক বিচ্যুতি হিসেবে। রূপান্তর (গুণের পরিবর্তন) হল আকস্মিক চরিত্রবিশিষ্ট। কিন্তু এই আকস্মিক বিচ্যুতি বা পরিবর্তনগুলো নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ও একত্রে পুঞ্জীভূত হতে থাকে এবং জীবের আবশ্যকীয় গুণগুলো সেই ভিত্তিতে গঠিত হয়।

এমনকি যখন আকস্মিক ঘটনাকে গৌণ গুরুত্বসম্পন্ন বলে মনে করা হতো তখনো আকস্মিক উপাদানকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-দৃষ্টির বাইরে রাখা হয় নি। জ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য যা,—নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত ও আবশ্যিক, তাকে প্রকাশ করা। কিন্তু এর থেকে এটা আসে না যে আকস্মিকতা কেবল আমাদের আত্মগত ধারণার অন্তর্ভুক্ত এবং সেইজন্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাকে অগ্রাহ্য করতে হবে। নানা প্রকার আকস্মিক ও পৃথক পৃথক ঘটনার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিজ্ঞান বস্তুর গভীরে যে-আবশ্যকতা বিদ্যমান তার আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ হয়।

বিজ্ঞানে এমন সব নিয়ম আছে যা আবশ্যকতাকে এমন একটা রূপে প্রতিবিম্বিত করে, তাতে মনে হয় তা যেন আকস্মিকতা মুক্ত—যেমন নিউটনের বলবিদ্যার নিয়ম। এমন প্রতিজ্ঞাও আছে যা আবশ্যকতা ও আকস্মিকতা উভয়ের ঐক্যকে প্রতিবিম্বিত করছে। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান সচেতনভাবেই আকস্মিকতাকে অগ্রাহ্য করে এবং কেবল আবশ্যকতা নিয়েই ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু সামাজিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষেত্রে কোনটা আবশ্যিক আর কোনটা আকস্মিক তাকে একটা ঐক্যসূত্রে বিবেচনা করতেই হয়।

আবশ্যকতা ও আকস্মিকতার ডায়ালেকটিকসের উপলব্ধি সঠিক প্রয়োগ-মূলক সৃষ্টিশীল কাজকর্মের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হঠাৎ যুগপৎ নানা ঘটনা ঘটার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানের অনেকগুলি আবিষ্কার ও প্রযুক্তিবিদ্যার বহু উদ্ভাবনা সম্ভব হয়েছে। যতই খুঁটিয়ে হিসেব-নিকেশ করে আমরা কাজ করি না কেন, কিছু একটা আকস্মিকতার জন্যে পড়ে থাকেই। উৎপাদন ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষকে আকস্মিকতার দুর্ভাগ্যজনক শক্তির হাত থেকে মুক্তির পথে নিয়ে যাচ্ছে। সমাজতন্ত্রের অধীনে মানুষ বেশি বেশি করে সামাজিক প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির পরিকল্পনা করার সুযোগ লাভ করছে এবং এইভাবে সমাজকে আকস্মিকতার ক্ষতিকর পরিণাম থেকে রক্ষা করছে।

পরিসংখ্যান বিজ্ঞান এবং গতিবিজ্ঞানের নিয়মের মধ্যে পার্থক্য—যার

বিজ্ঞানে একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে, তার ভিত্তি আকস্মিকতার উপলব্ধি নির্ভর।

গতিবিদ্যার নিয়মগুলো (Dynamic Laws) আবশ্যকীয় হেতু-সংক্রান্ত সংযোগের রূপ—যার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্কের সাযুজ্য ঘটে ; অন্যভাবে বলা যায় আমরা যদি একটা ব্যবস্থার প্রাথমিক অবস্থা জানতে পারি, তাহলে তার পরবর্তী বিকাশের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। তাই, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তি হলো মহাকাশচারী বস্তুগুলির গতির নিয়মের হিসাব-নিকাশ।

গতিবিদ্যার নিয়মের বিপরীত **পরিসংখ্যান নিয়মগুলো** (Statistical Laws) হল আবশ্যকীয় ও আকস্মিকতার গুণগুলোর ডায়ালেকটিক ঐক্য। এই ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে যে পরবর্তী অবস্থার বিকাশ ঘটে তাই শুধু একমাত্র বিকাশধারা নয় এবং সম্ভাব্যতার খানিকটা মাত্রা পর্যন্তই ঐ বিকাশের পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভব।

এখানে কতকগুলো উদাহরণ দেওয়া হল। আপনি যদি একটি লটারীর টিকিট কেনেন তা থেকে এইটা আসে না যে আপনি একটা পুরস্কার পাবেনই। আপনি জিততেও পারেন, হারতেও পারেন। লটারীতে কিছু জেতা আকস্মিক ঘটনার একটা চমৎকার উদাহরণ। এই ধরনের ঘটনার সম্ভাবনা **প্রায়িকতা** (Probability) প্রত্যয়টির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। যদি ঘটনা কোনদিনই না ঘটে তাহলে প্রায়িকতা শূন্য। যদি এটা অবশ্যম্ভাবী হয় তাহলে প্রায়িকতাকে একটি এককের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সমস্ত আকস্মিক ঘটনার প্রায়িকতা হল শূন্য থেকে একের মধ্যে। বেশি আকস্মিক ঘটনা যতবার ঘটবে, তার প্রায়িকতাও হবে বেশি।

প্রায়িকতা প্রত্যয়টি অনিশ্চয়তা প্রত্যয়টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যখন অনেকগুলো বস্তুর মধ্যে থেকে বাছাই করতে হয়, তখনই সৃষ্টি হয় অনিশ্চয়তা। প্রায়িকতা ও অনিশ্চয়তার মাপের মধ্যে একটা সহজ পরস্পর-নির্ভরতা রয়েছে ঃ বাছাইয়ের প্রায়িকতা যত কম, অনিশ্চয়তা তত বেশি।

পরিসংখ্যান নিয়মের একটি বৈশিষ্ট্যসূচক দিক হ'ল—যার কিছুটা স্থায়িত্ব রয়েছে সেই আকস্মিকতার উপর ঐ নিয়মগুলো নির্ভরশীল। এর অর্থ এই যে ওগুলোকে কেবলমাত্র বড় বড় ঘটনাপুঞ্জের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, যার প্রত্যেকটিই আকস্মিক চরিত্রসম্পন্ন। উদাহরস্বরূপ, গ্যাসীয় অণুর পুঞ্জীভবনের মত ব্যাপক ধরনের ঘটনা পরিসংখ্যান নিয়ম মেনে চলে। নিয়মগুলোর অনুষঙ্গে একক অণুর গতি যা পুঞ্জের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে, সেটা আকস্মিক কিন্তু একক অণুগুলির এই আপতনিক চলাচলের এই মিশ্রণ থেকে একটা আবশ্যকতা গড়ে ওঠে যা প্রত্যেকটি এককের ক্ষেত্রে নিজেকে অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে বা একেবারেই প্রকাশ করে না।

বৃহৎ রাশিরও একটা নিয়ম আছে যা আবশ্যকতা ও আকস্মিকতার ডায়ালেকটিকসকে প্রকাশ করে। এই নিয়মের ধারা এইরকম : বৃহৎ সংখ্যার আকস্মিক উপাদানগুলোর মিলিত পরিণাম প্রায় আকস্মিকতা-নিরপেক্ষভাবে, এই ধরনের উৎপাদকগুলোর একটি বৃহৎ বর্গের জন্যে ফল সৃষ্টি করে। অন্য কথায়, বহু বৃহৎ সংখ্যক পৃথক পৃথক বিষয়ও ঘটনার পুঞ্জীভবনের ফলে তাদের আকস্মিক বিচ্যুতির কোনো না কোনো দিক লোপ পায় অথবা কোন একটা নির্দিষ্ট নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত ধারার উৎপত্তি ঘটে। এই ধারা বা নিয়মকেই বলা হয় পরিসংখ্যান। বহু পৃথক পৃথক ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশিত হ'য়ে পরিসংখ্যান নিয়ম এর কার্য ও কারণ, আবশ্যকতা ও আকস্মিকতা, স্বতন্ত্র ও সার্বিক, সমগ্র ও অংশ, সম্ভাবনা ও প্রায়িকতার নির্দিষ্ট আন্তরসম্পর্কসহ বিষয়গত ভিত্তি গঠন করে, যার উপর পরিসংখ্যান পদ্ধতির গবেষণা নির্ভরশীল।

পরিসংখ্যান পদ্ধতি এবং তার সঙ্গে জড়িত প্রায়িকতা তত্ত্বের পদ্ধতি আক্ষরিক অর্থেই প্রত্যেকটি বিজ্ঞানের শাখাতেই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হ'য়ে উঠছে। এমনকি পুরোনো পদার্থবিদ্যার কাঠামোর মধ্যেও পরিসংখ্যান পদার্থবিদ্যা বলে পরিচিত একটি শিক্ষনীয় বিষয় ছিল এবং কোয়াণ্টাম বলবিদ্যায় প্রায়িকতার নীতি মৌলিক তাৎপর্য লাভ করেছে। তথ্য (information) তত্ত্ব যা সাইবারনেটিকসের বনিয়াদ, তার ভিত্তি প্রায়িকতা তত্ত্বের উপর। জীববিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদরা ক্রমশই ব্যাপকভাবে প্রায়িকতা পদ্ধতির ব্যবহার করছেন। বৈজ্ঞানিক যুক্তিশাস্ত্রের একটি বিশেষ শাখা, প্রায়িকতা যুক্তি শাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছে এবং দ্রুত বিকাশলাভ করছে।

৫ সম্ভাবনা ও সত্তা

সম্ভাবনা ও সত্তার প্রত্যয় দুটি আধুনিক তত্ত্বগত চিন্তার সমৃদ্ধ অস্ত্রশালায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করছে। ডায়ালেকটিকস-এর অন্য সব প্রত্যয়ের মত এ দুটিও সকল জিনিসের সার্বিক সংযোগ, তাদের পরিবর্তন এবং বিকাশের প্রক্রিয়াকে প্রতিফলিত করে।

কোন কিছুই নাস্তি থেকে আসে না এবং নতুনের উত্থান হ'তে পারে পুরাতনের গর্ভস্থিত কোন পূর্বশর্ত থেকে। অস্ফুট অবস্থায় নতুনের অস্তিত্ব হ'ল, সম্ভাবনা। শিশু জগতে আসে। তার মধ্যে অনেক রকমের সম্ভাবনা আছে—ইন্দ্রিয়বোধের, চিন্তা করবার, কথা বলবার সম্ভাবনা। সঠিক অবস্থায় সম্ভাবনা সত্তায় পরিণত হবে। সত্তা পদটি ব্যাপকার্থে যা কিছুর বাস্তব অস্তিত্ব আছে সবগুলোকেই বোঝায়—ভ্রূণাকারে, পুষ্ট অবস্থায় ও বিলীয়মান পর্যায়ে। এটা হ'ল স্বতন্ত্র আর সার্বিকের, সারসত্তা ও তার বিভিন্ন রূপের, আবশ্যকীয় ও আকস্মিকতার ঐক্য। সংকীর্ণ অর্থে আমরা সত্তা বলতে বুঝি একটা সম্ভাবনার

পূরণ—একটা কিছু হয়েছে, কিছু বিকশিত হয়েছে। জগতে এমন কিছুই নেই যা একটা সম্ভাবনা বা সত্তা নয় বা একটা থেকে আর একটাতে "যাবার পথে" নয়।

বিকাশের প্রক্রিয়াটি সম্ভাবনা ও সত্তার ডায়ালেকটিক ঐক্য। সম্ভাবনা সত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সম্ভব ও প্রকৃত পরস্পরের মধ্যে মিলিত হয়। সম্ভাবনা শব্দটি ব্যাপকার্থে প্রকৃত সত্তারই অন্যতম রূপ; এটা অভ্যন্তরীণ, অস্ফুট প্রকৃত সত্তা। সম্ভাবনাকে কোন অতিপ্রাকৃত শক্তি সত্তার মধ্যে সঞ্চারিত করে না। এটা বিষয়গত অবস্থার মধ্যেই সৃষ্টি হয় ও অবস্থান করে এবং এর স্বকীয় গতি ও আত্মবিকাশকে প্রকাশ করে।

সম্ভাবনা ও সত্তা প্রত্যয় দুটির আন্তরসম্পর্কের মধ্যে প্রকৃত সত্তার "অগ্রাধিকার" রয়েছে, যদিও কালের দিক থেকে সম্ভাবনা প্রকৃত সত্তার পূর্ববর্তী। কিন্তু সম্ভাবনা নিজে তারই অন্যতম উপাদান যা আগে থেকেই প্রকৃত সত্তায় আছে। যা সম্ভব এমন সব জিনিসই সম্ভব হয়; কারণ এটা সত্তার মধ্যে আছে ভবিষ্যতের দিকে, পরিবর্তনের দিকে, আর একটি গুণে রূপান্তরিত হওয়ার দিকে। এরিস্টটল বলেছিলেন, বাস্তবে যে ব্যক্তি আছেন সেই তুলনায় বীজের মধ্যে তাঁর থাকবার সম্ভাবনা আগে থেকেই আছে। সময়ের দিক থেকে বহু পূর্ববর্তী জিনিসের মধ্যে বর্তমানেরটি গড়ে ওঠে। সম্ভাবনা ও সত্তার ঐক্যের ওপর জোর দিতে গিয়ে আমাদের মনে রাখা উচিত তাদের মধ্যেকার পার্থক্যকে। মানুষের সমগ্রভাবে জগৎকে জানবার সম্ভাবনা থেকে জানবার সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হওয়া মূলত পৃথক।

নানা ধরনের সম্ভাবনা আছে। সম্ভাবনা **সার্বিক** অথবা **স্বতন্ত্র** হ'তে পারে। একটা সার্বিক সম্ভাবনা স্বতন্ত্র বস্তু ও ঘটনাবলীর সাধারণ দিকগুলোর পূর্বাবস্থাকে প্রকাশ করে, আর স্বতন্ত্র সম্ভাবনা প্রকাশ করে তাদের পৃথক পৃথক দিক ও বৈশিষ্ট্যকে। একটি সার্বিক সম্ভাবনা সত্তার বিকাশের নিয়ম দ্বারা নির্ধারিত হয়, আর স্বতন্ত্র সম্ভাবনা এই সব সাধারণ নিয়মগুলোর অস্তিত্বের নির্দিষ্ট অবস্থা এবং কার্যের ওপর নির্ভর করে। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র সম্ভাবনাই অনন্য।

সম্ভাবনাগুলো হ'তে পারে **প্রকৃত** (**মূর্ত**) অথবা **নিয়মমাফিক** (বিমূর্ত)। আমরা একটা সম্ভাবনাকে প্রকৃত বলি যদি তা আলোচ্য বস্তুটির নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত বিকাশের মর্মগত ঝোঁকটিকে প্রকাশ করে এবং যদি এর বাস্তবায়নের আবশ্যকীয় পরিস্থিতি বাস্তবে পাওয়া যায়। একটা নিয়মমাফিক সম্ভাবনা বস্তুটির বিকাশের বাহ্যিক ঝোঁকগুলোকে প্রকাশ করে, যেখানে বাস্তবে এর পূরণের আবশ্যকীয় অবস্থার অস্তিত্ব নেই। কেবলমাত্র এর পক্ষে নিয়মমাফিক যুক্তি হাজির করা যায়। "এটা সম্ভব যে আজ রাতে চাঁদ পৃথিবীর ওপর পড়বে, কারণ চাঁদ হল পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন একটি বস্তুসত্তা এবং তাই এর ওপর পড়তে পারে, যেমন

শূন্যে উৎক্ষিপ্ত একটি পাথর পড়ে ; এটা সম্ভব যে তুর্কীর সুলতান পোপ হবে, কারণ তিনিও একজন মানুষ এবং খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হ'তে পারেন ও ক্যাথলিক পুরোহিত হ'তে পারেন ইত্যাদি।"[১]

নিয়মমাফিক সম্ভাবনা বস্তুগত নিয়মের বিরোধী নয়। এই অর্থে এটি অসম্ভব থেকে মূলত পৃথক, অর্থাৎ নীতিগতভাবে যা কোন অবস্থাতেই বাস্তবায়িত হবে না। উদাহরণস্বরূপ, কেউ নিরন্তর গতিসম্পন্ন যন্ত্র তৈরি করতে পারে না কারণ এটা শক্তির নিত্যতাবাদের নিয়মবিরোধী। তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক উভয় কাজকর্মে অসম্ভব থেকে সম্ভাবনাকে পৃথক করতে পারার ক্ষমতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একটা নিয়মমাফিক সম্ভাবনাকে অন্য সকল সম্ভাবনা থেকে বিমূর্ত সম্ভাবনা বলেই গণ্য করা যেতে পারে। যে-কোন পরিমাণের নিয়মমাফিক সম্ভাবনাই সত্তায় পরিণত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, বুর্জোয়া তত্ত্বজ্ঞরা জোর দিয়ে বলেন যে, পুঁজিবাদী অবস্থায় যে-কোন গরীব মানুষ লক্ষপতি হতে পারে। কিন্তু এটা নিয়মমাফিক সম্ভাবনা। কারণ লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষ গরীব মানুষই থেকে যায়, কয়েকজন লক্ষপতি হওয়ার আগেই গরীব মানুষ ভিখারীতে পরিণত হয়। প্রকৃত ও নিয়মমাফিক সম্ভাবনার মধ্যে পার্থক্যটা আপেক্ষিক। কতকগুলো বিশেষ পরিস্থিতির জন্যে একটি সম্পূর্ণ প্রকৃত সম্ভাবনা বিনষ্ট হতে পারে অথবা বিষয়গতভাবে অপূর্ণ থাকতে পারে। আবার একটা নিয়মমাফিক সম্ভাবনা প্রকৃত সম্ভাবনায় পরিণত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মানুষের মহাকাশ ভ্রমণ এক সময় ছিল নিয়মমাফিক সম্ভাবনা কিন্তু এখন তা প্রকৃত হয়েছে।

আমরা পূর্বেই বলেছি, সম্ভাবনা কালের দিক থেকে সত্তার পূর্ববর্তী। কিন্তু সত্তা পূর্ববর্তী বিকাশের ফলে একই সঙ্গে পরবর্তী বিকাশের সূচনাস্থল। একটা সত্তার মধ্যেই সম্ভাবনা জাগ্রত হয় এবং নতুন সত্তায় পূর্ণতা পায়।

যেমন একটি বস্তুর বিকাশের মধ্যে সুপ্ত ঝোঁকগুলি বিভিন্ন দিককে প্রকাশ করে, সম্ভাবনাগুলিও সত্তার বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোণ থেকে। সমস্ত সম্ভাবনাই বাস্তবায়িত হওয়ার দিকে যায় এবং তাদের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। কিন্তু ভবিষ্যতের অভিমুখিতা এটা বোঝায় না, যেমন নিয়তিবাদীরা বলেন, যে-কোন প্রক্রিয়ার শেষ পরিণতি শুরু থেকেই পূর্বনির্ধারিত এবং সম্পূর্ণ অনিবার্য। তাঁদের দৃষ্টিকোণের অর্থ হল, কোন প্রক্রিয়ার বিকাশের শেষ পরিণতি সত্তা হিসাবে ভ্রূণাকারে আগে থেকেই থাকে এবং সমগ্র বিকাশের প্রক্রিয়া কেবলমাত্র বাইরের সহায়ক উপায় রূপে এর বাস্তবায়নের জন্যে কাজ করে। একদিকে, যা কিছু আছে তা সম্পূর্ণরূপে

১ জি. ডব্লু. এফ. হেগেল, ওয়েকে, বি. ডি. ৬, বার্লিন, ১৮৪০, এস ২৮৬।

অতীতের দ্বারা পূর্বনির্ধারিত এবং অন্যদিকে যান্ত্রিক বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাদের মতে সব কিছুই নির্ধারিত হয় ভবিষ্যতের দ্বারা। কিন্তু যদি শুরুতেই এক ধাক্কায় সমস্ত সম্ভাবনা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে এবং কোন নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা না থেকে থাকে, তাহলে বিশ্বের সকল সম্ভাবনা ফুরিয়ে যেত। ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ এই তথ্য থেকে অগ্রসর হয় যে বিকাশ পূর্ব থেকেই সঞ্চিত সম্ভাবনার প্রকাশ নয়, বরং সত্তার অবয়বের মধ্যে সম্ভাবনাগুলিরই নিরন্তর সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ও নতুন সত্তায় তাদের রূপান্তরের ধারা।

সম্ভাবনা ও সত্তার মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক পরস্পরবিরোধী ও বহুমুখী। প্রত্যেকটি মূর্ত সত্তা সাধারণত গুণগতভাবে নতুন ঘটনাবলী আবির্ভাবের অসংখ্য সম্ভাবনাকে প্রকাশ করে। যেমন, যখন একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটে তখন তা দুটি সম্ভাবনাকে প্রকাশ করে: প্রগতিশীল শক্তির বিজয় অথবা প্রতিক্রিয়ার জয়। ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যখন প্রতিক্রিয়া তখনকার মতো জয়লাভ করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাল প্রগতিশীল সম্ভাবনাগুলো রূপায়ণের পক্ষেই আনুকূল্য প্রদর্শন করেছে।

জগতে সব কিছুর মতই সম্ভাবনাগুলিরও বিকাশ আছে: তাদের কিছু বৃদ্ধি পায়, অন্যেরা শুকিয়ে যায়। সম্ভাবনার সত্তায় রূপান্তরের জন্যে কতকগুলি অবস্থার প্রয়োজন।

প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যেকার সম্ভাবনাগুলো পরিপূরণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃতিতে সম্ভাবনার বাস্তবায়ন ঘটে মোটের ওপর স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে। কিন্তু মানব সমাজে তা নয়। ইতিহাস সৃষ্টি করে জনগণ। সুতরাং সমাজ-বিকাশে নিয়োজিত সম্ভাবনাগুলির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেকটাই নির্ভর করে তাদের ইচ্ছা, চেতনা ও উদ্যোগের উপর। সমাজতন্ত্রের আওতার মধ্যে সাম্যবাদ গঠনের সম্ভাবনাকে সত্তায় পরিণত করার সমস্ত আবশ্যকীয় শর্তের অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু এই শর্তগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাম্যবাদে নিয়ে যাবে না। সাম্যবাদী সমাজ গঠনের সম্ভাবনাগুলো কেবলমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চালিত সোভিয়েতের মানুষদের সৃষ্টি-শীল প্রচেষ্টার দ্বারাই পরিপূরণ করা যেতে পারে।

৬ আধেয় ও রূপ

যেকোন বাস্তব সত্তাই আধেয় ও রূপের ঐক্য। আধেয় নিজে নিজেই জগতে থাকতে পারে না, এর চাই কোন এক ধরনের রূপ বা আধার।

আধেয় বলতে বোঝায় কোন বিষয়ের মধ্যেকার সমস্ত উপাদান, তার ধর্মগুলির ঐক্য, অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলি, সংযোগসমূহ, বিরোধগুলি এবং

বিকাশের প্রবণতাসমূহকে। উদাহরণস্বরূপ, কোন জীবের আধেয় শুধু তার অঙ্গসমূহের সমষ্টি নয়, অধিকন্তু তা এর একটি নির্দিষ্ট রূপের মধ্যে জীবনক্রিয়ার সমগ্র যথাযথ প্রক্রিয়া।

রূপ বলতে বোঝায় আধেয়র বহির্মুখী প্রকাশ-ভঙ্গি, আধেয়ের উপাদান-গুলির আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী মূর্ত সংযোগগুলি, তাদের মিথস্ক্রিয়া, আধেয়র বিশেষরূপ (type) এবং কাঠামো।

রূপ ও আধেয় কোন বস্তুর গঠন বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করে, যা শুধু পৃথকই নয়, অধিকন্তু পরস্পরবিরোধী। উপরন্তু, রূপ ও আধেয়তে কোন বস্তুর পৃথক অস্তিত্ব থাকে শুধু তাদের অবিচ্ছেদ্য ঐক্যের মধ্যে, এবং তাদের ঐক্য থাকে শুধু অভ্যন্তরীণভাবে বিভক্ত কোনো কিছু হিসেবে।

রূপ ও আধেয়র মধ্যে কোনো অলঙ্ঘ্য ব্যবধান নেই। এরা একে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। যেমন, চিন্তা বিষয়গত বাস্তবতার একটি ভাবগত প্রতিবিম্ব এবং একই সঙ্গে এটা প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়াগুলির আধেয় সৃষ্টি করে। প্রত্যেকটি বিশেষ বস্তুতে রূপ ও আধেয় অবিচ্ছেদ্য। রূপ একটা বাইরের কিছু নয়, যাকে আধেয়র ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো তরল পদার্থকে ভারহীন অবস্থায় থাকতে দিলে একটা গোলাকার রূপ ধারণ করে। অত্যন্ত চমৎকার একটা ভাব কোনো শিল্প সৃষ্টি করতে পারে না, যদি তা সুসঙ্গত শৈল্পিক রূপ ও শিল্পিত ভাবমূর্তিতে সাজানো না হয়। "ইলিয়াড সম্বন্ধে এটা বলা যায় যে এর আধেয় হ'ল ট্রোজান যুদ্ধ বা আরও সুনির্দিষ্ট-ভাবে, একিলিসের ক্রোধ; এটা অনেক কিছুই আমাদের বলে কিন্তু তা সামান্যই, কারণ এর আধেয় যে-কাব্যিক রূপের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, তার ফলেই ইলিয়াড হয়ে উঠতে পেরেছে।"[১]

রূপ অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের ঐক্য। আধেয়র উপাদানগুলির সংযোগের মাধ্যম হিসেবে রূপ একটা ভেতরের কিছু। এটা বিষয়ের একটা কাঠামো গড়ে তোলে এবং তা যেন আধেয়র একটি উপাদান। একটি আধেয়র সঙ্গে অন্য আধেয়র সংযোগ হিসেবে রূপ একটা বাহ্যিক। তাই একটি শিল্পকর্মের ভেতরের রূপ হ'ল প্রধানতঃ রচনার বিষয়বস্তু, শিল্পগত রূপকল্প এবং যে ভাবগুলি নিয়ে এর আধেয় গঠিত, তার মধ্যেকার সংযোগ। বহিরঙ্গ হ'ল সেই শিল্পকর্মটির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ রূপ, এর বাইরের উপস্থাপনা। "রূপ ও আধেয়র বিরোধকে বিচার করতে হ'লে আমাদের ভোলা উচিত

১ জি. ডব্লু. এফ. হেগেল, ওয়ের্কে, বি ডি. ৬, এস. ২৬৫।

নয় যে আধেয় নিরাকার নয় এবং রূপ যুগপৎভাবে আধেয়র মধ্যেই নিহিত এবং এর বাইরেও বটে।"[১]

রূপ তার বিশ্বজনীনতার মাত্রা অনুযায়ী পৃথক। কোনো রূপ একটি স্বতন্ত্র বস্তু, এক ধরনের বস্তু-সমষ্টি বা অসংখ্য বস্তুর গঠন-মাধ্যম হতে পারে।

রূপ ও আধেয়র সম্পর্কের সমস্যাটিকে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় নানাভাবে বিচার করেছে। এরিস্টটলের মতে আধেয় ও রূপ শুরুতে অন্য-নিরপেক্ষ একটা কিছু হিসেবে থাকে এবং শুধু পরবর্তীকালেই যখন কিছু একটা গড়ে ওঠে, তখন তারা ঘনিষ্ঠ সংযোগে আবদ্ধ হয়। তাঁর মত অনুসারে আদি রূপ অথবা সকল রূপের রূপ হলো ঈশ্বর।

সমকালীন বুর্জোয়া দর্শনে রূপ ও আধেয়র সম্পর্ককে সাধারণতঃ এই অর্থে বিকৃত করা হয়েছে যে, রূপ সেখানে আধেয় থেকে বিচ্ছিন্ন এবং চরম। এই রূপসর্বস্বতা শিল্পকে নিয়ে যায় শৈলীপ্রাধান্য ও বিমূর্ততার দিকে। এখানে রূপ হয়ে ওঠে স্বয়ংসম্পূর্ণ মূল্যের অধিকারী।

যে রূপ-সর্বস্বতা রূপ ও রূপগত প্রয়োজনীয়তাকে প্রধান করে তোলে ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ সে সমস্তর বিরোধী। একথা বলার অর্থ এই নয় যে রূপের তাৎপর্যকে আমরা খাটো করে দেখতে পারি। রূপ আধেয়র গঠনে ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

রূপ ও আধেয় এক ; রূপহীন কোন আধেয় এবং আধেয়হীন কোন রূপ থাকতে পারে না। আধেয় ও রূপের মধ্যে বিপরীতের ঐক্য সৃষ্টি হয় ; এ-দুটি এক ও অভিন্ন বিষয়ের দুটি ভিন্ন মেরু। আধেয় রূপের আবরণে 'আবৃত'-এর মধ্যেই তাদের অবিচ্ছেদ্য ঐক্য প্রকাশ পায়।

আধেয় প্রাথমিক উপাদান ; যা সংগঠিত হয় তার উপরই গঠনের রূপ নির্ভর করে। কোন বাইরের শক্তির দ্বারা আধেয়র রূপারোপ ঘটেনা, এ নিজেই তার রূপ রচনা করে। রূপ ও আধেয়র মধ্যে একটা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব রয়েছে। এই দ্বন্দ্বগুলির আবির্ভাব, বিকাশ ও অতিক্রমন বিপরীত শক্তির সংগ্রামের মাধ্যমে বিকাশের একটি অন্যতম মৌল ও বিশ্বজনীন প্রকাশ। ডায়ালেকটিকস এর উপাদানগুলিকে লিপিবদ্ধ করে লেনিন লিখেছিলেন, "...রূপের সঙ্গে আধেয়র বিরোধ এবং তার বিপরীত। রূপকে বিমুক্ত করে আধেয়র রূপান্তর... ।"[২]

রূপ ও আধেয়র প্রত্যয়গুলি বিকাশের ডায়ালেকটিকসকে অনুধাবনের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে রূপ আধেয়র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা আধেয়র অগ্রগতি ঘটায় ও তাকে দ্রুতগতিসম্পন্ন করে তোলে। অবশ্য, এমন একটা সময় আসে

১ ঐ গ্রন্থ, এস. ২৬৪।

২ ভি, আই, লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ২২২ পৃঃ।

যখন পুরোনো রূপ পরিবর্তিত আধেয়র সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে এবং পরবর্তী বিকাশের প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করতে থাকে। রূপ ও আধেয়র মধ্যে একটা সংঘর্ষ সুরু হয়, যার সমাধান হয় অচল রূপের ধ্বংসের মধ্যে এবং নতুন আধেয়র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন রূপের আবির্ভাবে। এই নতুন রূপ আধেয়র ওপর সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে এবং এর বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

রূপ ও আধেয়র ঐক্যের মধ্যে তাদের আপেক্ষিক স্বাধীনতা ও আধেয়র তুলনায় রূপের সক্রিয়তাকে আগে থেকেই ধরে নেওয়া হয়। রূপ আধেয়র বিকাশের চাইতে কিছুটা পেছিয়ে থাকতে পারে—রূপের আপেক্ষিক স্বাধীনতা এই তথ্যটির মধ্যে প্রকাশ পায়। রূপের পরিবর্তন হলো বস্তুর অভ্যন্তরীণ সংযোগগুলির পুনর্গঠন। সময়ের তালে এই প্রক্রিয়া ঘটে, এটা বাস্তবায়িত হয় দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মাধ্যমে; যেমন বৈরিতামূলক সামাজিক অবস্থায় এটা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে এবং পুরোনো ব্যবস্থার রক্ষাকর্তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত।

রূপ যখন আধেয়র চেয়ে পেছিয়ে থাকে তখন আর তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। যেমন, উৎপাদন সম্পর্ক—যা একটা সমাজের উৎপাদনী শক্তির দিক থেকে রূপ বিশেষ, সেটা একটা নির্দিষ্ট সামাজিক-আর্থনীতিক গঠনের বিকাশের উত্তরণপর্বে উৎপাদনী শক্তির বিকাশের প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু ঐ ব্যবস্থার পতনের কালে (যেমন, সাম্রাজ্যবাদী স্তরের পুঁজিবাদ) তারা ঐসব শক্তির পেছনে পড়ে থাকে এবং বিকাশের গতিকে শ্লথ করে দেয়।

রূপ ও আধেয়র আপেক্ষিক স্বাধীনতা এই তথ্যের মধ্যে প্রকাশ পায় যে এক ও অভিন্ন আধেয় বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির দুটি রূপ—রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি এবং সমবায়, যৌথ খামারের সম্পত্তি। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্রীয় রূপ সোভিয়েত ও জনগণতান্ত্রিক শাসনক্ষমতা। সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি প্রকাশ পায় নানা রকমের জাতীয় রূপে। কিন্তু এক অভিন্ন রূপের ভিন্ন ভিন্ন আধেয় থাকতে পারে: যেমন পরিদৃশ্যমান ঘটনাবলীর পৃথক পৃথক প্রাকৃতিক নিয়মগুলোকে একই সূত্রে প্রকাশ করা যায়।

যখন শ্রম সংগঠন, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও মনুষ্য শক্তির বণ্টনের নিপুণ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে কোনো প্রকল্পের ধারা ও পরিণতি নির্ধারিত হয়—সেইসব বাস্তব কাজকর্মের ক্ষেত্রে আধেয় ও রূপের আন্তঃসম্পর্ক ও তাদের আপেক্ষিক স্বাধীনতার উপলব্ধি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব সংগ্রামে নমনীয় আকারের সংগঠন, যা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, তার উপর লেনিন খুব জোর দিতেন। তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন যে প্রলেতারিয়েত ও তার পার্টি

পরিচালিত সংগ্রামে শুধু পুরাতন এবং অকেজো ধরনের সংগঠনই প্রতিবন্ধক নয়, অপরিণত ও অস্থায়ী ধরনের সংগঠনও প্রগতির বাধা হতে পারে। "অচল ও অপরিণত চরিত্রের রূপ আধেয়র আরও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপকে অসম্ভব করে তোলে; এটা লজ্জাকর অচলায়তনের কারণ হয় এবং উদ্যমের অপচয় ঘটায়…।"[১]

বিপ্লবী সংগ্রামে নমনীয় রূপ বেছে নেওয়া এবং তাকে আরও বিশদ করে তোলা কমিউনিস্ট ও শ্রমিক দলগুলির একট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

৭ মর্ম ও বাহ্যরূপ

মর্ম ও বাহ্যরূপ সংক্রান্ত প্রত্যয়গুলি কোন বস্তুর সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধির বিভিন্ন দিক, জ্ঞানের নানা স্তর এবং ভিন্ন ভিন্ন গভীরতাকে প্রকাশ করে। মানুষের জ্ঞান বিষয়ের বাহ্যরূপ থেকে তার অভ্যন্তরীণ গঠনের দিকে অগ্রসর হয়। বাইরের ধর্মগুলি ও স্থানিক বস্তু-সম্পর্ক নির্ধারণ করার মধ্যে দিয়ে কোনো বিষয়ের জ্ঞান শুরু হয়। তাদের কার্য-কারণ সম্পর্ক এবং অন্যান্য গভীর নিয়মাধীন সংযোগ ও ধর্মগুলি জানার মধ্যে দিয়ে মর্ম উদ্ঘাটিত হয়। জ্ঞান-বিকাশের নিয়ম এবং সামাজিক প্রয়োগের চাহিদা মানুষকে বস্তুর মর্ম ও আমাদের কাছে তার প্রতীয়মান রূপের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানতে বাধ্য করেছে।

ভাববাদী দার্শনিকরা কখনও কখনও এটা প্রকাশ করেন যে, একজন মানুষ যা মর্মগত বলে মনে করে সেটা তার স্বার্থের ওপর নির্ভরশীল। প্রয়োগবাদী এফ. সি এস শিলার প্রশ্ন তুলেছেন—আমরা কী করে জানব মানুষের স্বরূপ কী? ধর্মবিশ্বাসীর কাছে এটা রয়েছে অমর আত্মার মধ্যে, চিকিৎসকের কাছে এটার অস্তিত্ব রয়েছে দেহে, রাঁধুনীর কাছে এই তথ্যটির মধ্যে যে মানুষের রয়েছে পাকস্থলী, ধোপানীর কাছে এই ঘটনায় যে মানুষ অন্তর্বাস পরে। এই জন্যে শিলার সিদ্ধান্ত করেছেন যে মর্ম আসলে মনোগত।

ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ এই সত্যটি মেনে নেয় যে মর্ম ও বাহ্যরূপ দুটোই সকল জিনিসের সার্বিক বিষয়গত বৈশিষ্ট্য।

কোন বিষয়ের মর্ম জানা বলতে কী বোঝায়? এটা বলতে বোঝায় যে আমরা এর উৎপত্তির কারণ, অস্তিত্বের নিয়ম, এর মধ্যেকার সহজাত অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং বিকাশের প্রবণতা ও এর নিয়ামক ধর্মগুলিকে উপলব্ধি করেছি।

পুঁজিবাদী পদ্ধতির উৎপাদনের মর্ম হ'ল উৎপাদনের উপায়ের ব্যক্তিগত

১ ভি. আই লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৭ম খণ্ড, ৩৯০ পৃঃ

মালিকানা অথবা উৎপাদনের যন্ত্রপাতি থেকে সরাসরি উৎপাদক—শ্রমিকদের বিচ্ছিন্নতা। পঁজিবাদের এই মর্ম প্রকাশ পায় মানুষের শোষণের মধ্যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতাদর্শের মধ্যে। সমাজতন্ত্রের মর্ম হ'ল উৎপাদনের উপায়গুলির সামাজিক মালিকানা, মানব-শোষণের অনস্তিত্ব, নিরন্তর উৎপাদনের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান চাহিদার পূর্ণতর তৃপ্তি, সমাজ বিকাশের পরিকল্পনা এবং জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ঐক্য।

কোন প্রক্রিয়ার মর্ম পর্যায়ক্রমে উদ্ঘাটিত হয়। আমাদের চিন্তা শুধু বহিরঙ্গ থেকে মর্মের দিকেই অগ্রসর হয় না, অগভীর থেকে আরও গভীরতার দিকেও যায়। "মানব চিন্তার গতি অনিঃশেষ ধারায় বহিরঙ্গ থেকে মর্মের গভীরে পেঁছিয়, যেন প্রথম পর্যায়ের মর্ম দ্বিতীয় পর্যায়ে এবং এই রকম অন্তহীন ধারায়।"[১]

মর্ম সংক্রান্ত প্রত্যয়টি এমন একটি সত্তাকে প্রকাশ করে, তা যেন একটি বস্তুর "বনিয়াদ", যার আধেয়র মধ্যে কিছু একটা স্থায়ী, মৌলিক উপাদান বিদ্যমান। মর্ম হল কিছু সংগঠিত করার সূত্র, কোন বস্তুর মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং দিকগুলির মধ্যেকার সংযোগসমূহের সন্ধি বিন্দু।

সার্বিক প্রত্যয়টি মর্ম প্রত্যয়টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যা একটি বিশেষ শ্রেণীর বস্তুসমূহের মর্মকে গঠন করে, তাই তাদের সার্বিকতা। বস্তুর মধ্যে যা গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ধারক (অপরিহার্য) তাই মর্ম। যখন আমরা মর্ম সম্বন্ধে বলি তখন আমাদের মনে এমন একটা কিছু থাকে যা নিয়ম অনুসারে অগ্রসর হয়: "…নিয়ম ও মর্ম একই ধরনের কিংবা একই মাত্রার প্রত্যয় (একই পর্যায়ের), এটা পরিদৃশ্যমান ঘটনাবলী ও জগৎ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের গভীরতাকে প্রকাশ করে…।"[২] উদাহরণস্বরূপ, মেন্ডেলিয়েভের মৌলিক পদার্থের আবর্তন প্রণালীর নিয়ম কোন পদার্থের পারমাণবিক ওজন ও তার রাসায়নিক ধর্মের মর্মগত অভ্যন্তরীণ সংযোগগুলিকে উদ্ঘাটিত করেছে।

তবে মর্ম ও নিয়ম কিন্তু অভিন্ন নয়। মর্ম ব্যাপক ও বিচিত্র। উদাহরণস্বরূপ, প্রাণের মর্ম কেবল একটি মাত্র নিয়মের মধ্যে নেই বরং তা রয়েছে বহু নিয়মের জটিল জালের মধ্যে। কোন বস্তুর মর্মের বর্ণনা দিতে গেলে আমরা মর্মের কাছাকাছি নিম্নোক্ত প্রত্যয়ের ব্যবহার করি কিন্তু সেগুলি এর সঙ্গে অভিন্ন নয়: বহুর মধ্যে স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্রের মধ্যে সার্বিক, পরিবর্তনশীলদের মধ্যে সুস্থিত, অভ্যন্তরীণ, নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত।

বাহ্যরূপ কি? বাহ্যরূপ হ'ল মর্মের বহির্মুখী অভিব্যক্তি, তার প্রকাশের

১. ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ২৫৩ পৃঃ।
২ ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ১৫২ পৃঃ।

রূপ। মর্ম মানুষের কাছে গুহায়িত, আর বাহ্যরূপ বস্তুর বহিরঙ্গ। অন্তর্নিহিত কোনো কিছু রূপে মর্মকে বস্তুর বাহ্যিক ও পরিবর্তনশীল দিক-গুলির বিপরীত হিসেবে দেখানো হয়। যখন আমরা বাহ্যিক রূপকে একটা কিছু বাইরের এবং মর্মকে একটা কিছু আভ্যন্তরীণ বলে মনে করি, তখন আমাদের মনে দৈশিক কোন সম্পর্ক বিরাজ করে না, বরং খোদ বস্তুটির বৈশিষ্ট্যসূচক অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের বিষয়গত তাৎপর্যের কথাই মনে হয়। বাহ্যিক রূপের মধ্যে যা প্রকাশ, সেই মর্ম ছাড়া বাহ্য রূপ অসম্ভব। "এখানেও আমরা একটি উত্তরণ, একটি প্রবাহ থেকে আর একটি প্রবাহ দেখি ঃ মর্ম প্রকাশ পায়। বাহ্যরূপ হ'ল মর্মগত।"[১] কার্যত মর্মে এমন কিছুই নেই যা কোন না কোনভাবে বাহ্যরূপে প্রকাশ পায় না। কিন্তু বাহ্যরূপ মর্মের চাইতে বেশি বৈচিত্র্যময়। এই কারণেই যে, এটা অধিকতর স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত, বাহ্যিক অবস্থার অনন্য সমষ্টির সঙ্গে জড়িত। বাহ্যিক রূপের মধ্যে সারমর্মটি অসারাত্মক ও আকস্মিকতার সঙ্গে সংযোজিত।

মর্ম ব্যাপক ঘটনা ও পৃথক পৃথক ঘটনাবলী উভয় ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায়। কতকগুলি ঘটনার মধ্যে মর্মের প্রকাশ ঘটে সম্পূর্ণ ও "স্বচ্ছভাবে", আর অন্যান্য ক্ষেত্রে এটা আবরণে ঢাকা। লেনিন নদীর দুরন্ত প্রবাহকে বেছে নিয়েছিলেন মর্ম ও বাহ্যরূপের আন্তঃসংযোগকে বিশদভাবে বোঝানোর জন্যে ঃ "···অসার, আপাত, বহিরঙ্গ ঘন ঘন অদৃশ্য হয়, মর্মের মতো তেমন 'দৃঢ়ভাবে' আঁকড়ে থাকে না, 'দৃঢ়বন্ধ নয়'। ETWA [সদৃশ কিছু] ঃ নদীর গতির মত—ওপরে ফেনা এবং নীচে গভীর স্রোত। এমনকি ফেনাও মর্মের প্রকাশ।"[২]

মর্ম ও বাহ্যরূপ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রত্যয়। এর একটি অপরটির মাধ্যমে চিহ্নিত হয়। মর্ম সামান্য লক্ষণ বিশিষ্ট, আর বাহ্যিক রূপ স্বতন্ত্র, মর্মের একটিমাত্র উপাদানের প্রকাশক। মর্ম নিগূঢ় এবং সহজাত, বাহ্যিক রূপ হল বহিরঙ্গ, কিন্তু সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় ; মর্ম সুস্থিত ও অপরিহার্য, কিন্তু বাহ্যরূপ আরও অচিরস্থায়ী, পরিবর্তনশীল ও আকস্মিক।

সার ও অসারের মধ্যে পার্থক্য চূড়ান্ত নয়, আপেক্ষিক। যেমন, একসময় এটা মনে করা হত যে রাসায়নিক মৌল পদার্থের অপরিহার্য ধর্ম হল এর পারমাণবিক ওজন। পরে এই অপরিহার্য ধর্মটি পারমাণবিক কেন্দ্রকের আধান বলে পরিগণিত হল। অবশ্য পারমাণবিক ওজন ধর্মটিও অপরিহার্য হয়েই রইল। প্রাথমিক ধারণার ক্ষেত্রে এটা এখনও অপরিহার্য, অগভীর স্তরেও এটা সঠিক। পারমাণবিক কেন্দ্রকের আধানের (charge) ভিত্তিতে একে আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

---

১ ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ২৫৩ পৃঃ।

২ ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ১৩০ পৃঃ।

বিচিত্র বহিরঙ্গের মধ্যে দিয়ে মর্ম প্রকাশ পায়। আবার, মর্ম শুধু নিজেকে প্রকাশই করে না, অধিকন্তু এইসব বহিরঙ্গের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। যখন আমরা কোন বস্তু বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান-লাভের প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকি, তখন সময় সময় আমাদের মনে হয় যে ওগুলো বাস্তবে যা, আসলে তা নয়। এই আপাত উপলব্ধি আমাদের চেতনাজাত নয়। এর সৃষ্টি হয় পর্যবেক্ষণের বাস্তব অবস্থার প্রকৃত সম্পর্কগুলি দ্বারা আমাদের প্রভাবান্বিত হওয়ার ফলে। যারা মনে করেছিলেন যে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে পরিক্রমা করছে, তাঁরা আসল জিনিসের বদলে আপাতরূপকে গ্রহণ করেছিলেন। পুঁজিবাদের আওতায় শ্রমিকের মজুরি তার সমস্ত কাজের মজুরি বলে প্রতীত হয়, কিন্তু বাস্তবে তার কাজের একটা অংশের জন্যে বেতন দেওয়া হয় মাত্র। বাকিটা পুঁজিপতিরা বিনামূল্যে বাড়তি মূল্য হিসেবে আত্মসাৎ করে, এটাই তাদের মুনাফার উৎস।

তাই কোন ঘটনা সম্বন্ধে সঠিক উপলব্ধির জন্যে, তার মূলে পৌঁছতে হলে আমাদের অবশ্যই প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের সাক্ষ্যগুলিকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে হবে এবং আপাত ও প্রকৃত, ভাসাভাসা ও অপরিহার্যতার মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য করতে হবে।

বস্তুর মর্ম উপলব্ধি করা বিজ্ঞানের মৌলিক কর্তব্য। মার্কস লিখেছিলেন যে, যদি মর্ম ও বাহ্যরূপ সরাসরি মিলে যেতো তাহলে কোনো বিজ্ঞানের আর প্রয়োজন থাকত না। বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যায় যে বিভিন্ন রূপের মধ্যে মর্ম প্রকাশ পায়, তাদের বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না। আবার এই সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপের "ভিত্তিমূলে", ও তাদের মর্মে প্রবেশ না করে এদের সঠিকভাবে বোঝা যায় না।

সপ্তম অধ্যায়

মানব-জ্ঞানের প্রকৃতি

মানুষ ও তার পরিবেশের সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক কী? কি কি নিয়মের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটে? বিষয়গত সত্য জ্ঞান সম্ভব কি আর যদি তা সম্ভব হয় তাহলে কীভাবে আমরা তাকে পেতে পারি? জ্ঞানের মধ্যে কী কী উপাদান বা বিষয় বর্তমান? কী রূপে ও কোন পদ্ধতিতে তাকে আয়ত্ত করা যায়? সত্য জ্ঞানের মাপকাঠি কী? এইগুলি ও অন্যান্য দার্শনিক প্রশ্ন দর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব বা এপিস্‌টিমলজি-তে[১] বিচার করা হয়।

১ বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞানতত্ত্ব

জ্ঞানতত্ত্বের তত্ত্বটি খোদ দর্শনের সঙ্গেই জন্ম নিয়েছিল। গ্রীক দর্শনে জ্ঞানের প্রকৃতির বিশ্লেষণ শুরু হয়েছিল ডেমোক্রিটাস, প্লেটো, এরিস্টটল, এপিকিউরাসপন্থী, সংশয়বাদী ও স্টোইকদের (সুখ-দুঃখে নির্বিকার) সঙ্গে সঙ্গে। আধুনিককালে এঁদের অনুসরণ করেছেন বেকন, দেকার্ত, লক, স্পীনোজা, লিবনিজ, কান্ট, দীদারো, হেলভিটিয়াস, হেগেল, ফয়ারবাখ, হার্জেন, চের্নিশেভস্কি ও অন্যান্য দার্শনিকগণ—যাঁরা এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

জ্ঞানের সমস্যা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনে কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে আছে। ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ সেই সব সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার দেউলিয়াপনাকে উদ্ঘাটিত করেছে যাঁরা সত্তার বিষয়গত জ্ঞানলাভে মানুষের সামর্থ্যকে অস্বীকার করেন (এটা অজ্ঞাবাদ বলে পরিচিত)।

অজ্ঞাবাদীদের ধ্যানধারণা প্রাচীন গ্রীসের এই সংশয়বাদের (পীরহো কার্নিয়েডেস্‌ ও এনেসিডেমাস্‌) মধ্যে অস্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়ঃ বাহ্যসত্তা থেকে জ্ঞানের বিচ্ছিন্নতা, বাহ্যজগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় বুদ্ধি

১ এপিস্‌টিমলজি পদটি এপিস্‌টেমি—জ্ঞান এবং লগস—তত্ত্ব বা মতবাদ—এই দুটি গ্রীক শব্দ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে।

পেয়ে খোদ বস্তুর অস্তিত্বেরই অস্বীকৃতি, ইত্যাদি। অজ্ঞাবাদের তত্ত্বগত ভিত্তি রচনা করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক হিউম। তিনি এই মত পোষণ করতেন যে সমস্ত জ্ঞানের সারমর্ম অ-জ্ঞান। "প্রাকৃতিক ধরনের সবচেয়ে নিখুঁত দর্শন শুধু আমাদের অজ্ঞতাকে আর একটু দীর্ঘায়িত করে মাত্র ঃ যেমন, নৈতিক বা পরাবিদ্যা সংক্রান্ত নিখুঁত দর্শন এর বৃহত্তর অংশকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করে। তাই মানুষের অন্ধতা ও দুর্বলতার পর্যবেক্ষণ দর্শনেরই ফল··· ।"[১] হিউম ব্যবহারিক কর্মের ভিত্তিস্বরূপ বিশ্বাস ও অভ্যাসের শক্তিকে জ্ঞানের বিকল্প হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন।

কান্টবাদ হল অজ্ঞাবাদের অপর একটি সংস্করণ। কান্ট জ্ঞান প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও পৃথক উপাদানগুলি লিপিবন্ধ করেছেন ঃ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, যুক্তি। এই বিশ্লেষণ জ্ঞানতত্ত্বে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কিন্তু তাঁর তাত্ত্বিক যুক্তি-ধারা ও সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি ভ্রমাত্মক। কান্ট জ্ঞান-জগতের জটিল ও বিরোধাত্মক প্রকৃতিকে উদ্ঘাটিত করেছিলেন, "যার মধ্যে ওগুলো (জিনিসগুলি) অন্তর্নিহিত আছে, তার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, "আমরা কেবল জানি তাদের বাহ্যিক রূপকে, অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপরে ক্রিয়াশীল হয়ে যে ধারণা তারা আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে তাদেরই আমরা জানি।"[২]

কান্ট একথা ঠিকই বলেছেন যে জ্ঞান শুরু হয় অভিজ্ঞতা ও সংবেদনের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তাঁর মতে অভিজ্ঞতা, বস্তুজগৎ যেমনটি নিজের মধ্যে আছে তার সংস্পর্শে আনার পরিবর্তে, তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়; কারণ কান্ট চেতনার মধ্যে একটা ব্যতিরেকী পূর্বজ্ঞানের (a priori) অস্তিত্ব ধরে নিয়েছেন অর্থাৎ সংবেদন ও বুদ্ধির একটা ধরণ যা অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ এবং আগে থেকেই আছে। কান্টের মতে অভিজ্ঞতা ও ঐসব ব্যতিরেকী পূর্বজ্ঞান থেকেই জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকী পূর্বজ্ঞানবাদ তাঁকে এক অনিষ্ক্রমণীয় অজ্ঞাবাদে নিয়ে গেছে।

যখন আমরা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দর্শনে আসি তখনও অজ্ঞাবাদের অবসান ঘটে নি। এটা বুর্জোয়া দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ-বাদীরা এবং মাখবাদের মতো প্রত্যক্ষবাদ ও প্রয়োগবাদের সঙ্গে যুক্ত দর্শন এটাকে গ্রহণ করেছে। সমকালীন বুর্জোয়া দর্শন অজ্ঞাবাদের সিদ্ধান্তসূত্রে "মৌলিক" কিছুই দেয় নি; সেখানে কান্ট ও হিউমের চর্বিত-চর্বন চলছে এবং প্রায়ই দর্শনে সর্বাধুনিক চিন্তা হিসেবে এই দুয়ের সংমিশ্রণ ঘটছে।

১ ডেভিড হিউম, অ্যান্ এনকোয়ারী কনসার্নিং হিউম্যান আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং, ফেলিক্স মেইনার, লিপ্‌জিগ. ১৯১৩. ২৯ পৃঃ।

২ আই. কান্ট. প্রোলেগোমেনা জু এইনার জেডেন কুনফ্‌টিজেন মেটাফিজিক. ডাই আলস ওয়েসেনশ্যাফট ওয়ার্ড আউফট্রেটেন কোনেন. লিপজিগ. ১৯১৩. ৪৩ পৃঃ।

দর্শনের মৌলিক ধারা—বস্তুবাদ ও ভাববাদকে অজ্ঞাবাদ কী চোখে দেখে? এটা ধরে নিলে অতিসরলীকরণ করা হবে যে সমস্ত ভাববাদী দার্শনিকই অজ্ঞাবাদী। দেকার্ত, লিব্‌নিজ্, হেগেল এবং আরও অনেকে অজ্ঞাবাদী ছিলেন না। এঙ্গেলস বলেছেন…"ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যতটা সম্ভব ছিল"[১] হেগেল অজ্ঞাবাদকে পরাস্ত করেছিলেন। কিন্তু ভাববাদীরা অজ্ঞাবাদকে সামঞ্জস্যহীনভাবে সমালোচনা করে, তার সঙ্গে আপসরফা করে এবং জ্ঞানতত্ত্বের অনেক মৌলিক প্রশ্ন আলোচনা করতে গিয়ে অজ্ঞাবাদের দিকেই ঝুঁকে পড়ে। অন্যদিকে প্রত্যেকটি অজ্ঞাবাদীই ভাববাদের সঙ্গতিপূর্ণ ও দৃঢ়চিত্ত প্রবক্তা নয়। প্রায়ই তারা বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যেকার সংগ্রামে একটা মাঝামাঝি আপস-মূলক অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করে। লেনিন লিখেছেন, বস্তুবাদীদের কাছে 'বাস্তবভাবে স্বীকৃত' হল বহির্জগৎ, আমাদের সংবেদন যার প্রতিরূপ। ভাববাদীদের কাছে 'বাস্তবভাবে স্বীকৃত' হল সংবেদন এবং বহির্জগৎ ঘোষিত হল 'সংবেদনের জট' বলে। অজ্ঞাবাদীদের কাছে হল বহির্জগৎ, সংবেদনই 'প্রত্যক্ষভাবে স্বীকৃত', কিন্তু অজ্ঞাবাদীরা বস্তুবাদীদের স্বীকৃত বহির্জগতের বাস্তবতা অথবা ভাববাদীদের জগৎকে সংবেদন হিসেবে স্বীকৃতি, এর কোনটার ধারেই যায় না।[২]

যখন অজ্ঞাবাদ দর্শনের মৌলিক প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশটি সমাধান করতে গিয়ে আমাদের সংবেদন, প্রত্যক্ষণ ও প্রত্যয়গুলিকে বিষয়গত বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তখন তত্ত্বগত জ্ঞানের ধারণা হিসেবে তা হয়ে দাঁড়ায় ভাববাদ। এটা ঠিক যে যাঁরাই নিজেদের অজ্ঞাবাদী বলেন তাঁরা সবাই এক নন। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক টমাস হাক্‌সলির মতো কয়েকজন প্রকৃতি বিজ্ঞানী ১৯শ শতাব্দীতে "অজ্ঞাবাদ" পদটির সূচনা করেন, তাঁরা দার্শনিক অজ্ঞাবাদের অবস্থান না নিয়েই নিজেদের অজ্ঞাবাদী বলে ঘোষণা করেছিলেন। বুর্জোয়া সমাজের পরিবেশে "অজ্ঞাবাদ" পদটি বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের বেশ সুবিধাজনক ছদ্মবেশ। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সীমাতিরিক্ত সবকিছুকেই তখন তাঁরা অজ্ঞেয় বলে ঘোষণা করতেন। তাঁদের মত মুখ্যত ঈশ্বরের অস্তিত্বভিত্তিক ধর্ম-বিশ্বাসের বিরোধী ছিল।

ডায়ালেকটিকস ও অধিবিদ্যার প্রতি অজ্ঞাবাদীদের মনোভাব জটিল। মানবজ্ঞানের ডায়ালেকটিক প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞাবাদীরা অনেক জল্পনাকল্পনা করেছিলেন। এটা সত্য যে মতান্ধতাকে জয় করার জন্যে কিছু মাত্রায় সংশয়-বাদ ও সন্দেহ জ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অপরিহার্য। গ্রীকদের কাল থেকে সংশয়বাদের মধ্যে কিছুটা ডায়ালেকটিক উপাদান রয়েছে। সত্যের দিকে

১ কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩য় খণ্ড, ৩৪৭ পৃঃ।

২ ভি. আই. লেনিন, কালেকটেড ওয়ার্কস, ১৪শ খণ্ড, ১১১-১২ পৃঃ।

জ্ঞানের অগ্রগতির বৈচিত্র্য, জটিলতা এবং বৈপরীত্যকে সংশয়বাদীরা প্রায়ই উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু অজ্ঞাবাদ জ্ঞানের গতিশীলতা ও আপেক্ষিকতাকেই চরম বলে মনে করেছে এবং এর সংশয়বাদ একটা নেতিবাচক ঝোঁক অর্জন করেছে। অজ্ঞাবাদীরা জ্ঞানের আপেক্ষিকতা ও দ্বান্দ্বিকতার ওপর জোর দিয়ে স্থিরনিশ্চয় হন এবং বস্তু জগতের নিয়মের দিকে আর অগ্রসর হতে চান না। বিষয়গত ডায়ালেকটিকস (বস্তুর গতি) থেকে আত্মগত ডায়ালেকটিকসকে (জ্ঞানের গতি) পৃথক করে দেখাটাই হল অজ্ঞাবাদী জ্ঞানতত্ত্বের মৌলিক উৎস।

অজ্ঞাবাদের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই এর সমালোচনা সঙ্গতভাবেই করা হয়েছিল। এর প্রতিদ্বন্দ্বীরা অনতিবিলম্বেই এর বক্তব্যের অসঙ্গতি এবং এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে বলতে থাকেন। কিন্তু এইসব সমালোচনায় সুদৃঢ় যুক্তির পরিবর্তে প্রায়ই থাকতো চাতুর্য। জ্ঞানের অজ্ঞাবাদী ধারণার উৎপত্তি হয় জটিল প্রকৃতির প্রতিবিম্বন, জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়ার দ্বান্দ্বিক চরিত্র ও সত্য জ্ঞানের মানদণ্ড নির্ণয়ের সঙ্গে জড়িত অসুবিধা থেকে। কিন্তু অজ্ঞাবাদ সমাজের কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর অবস্থান, তাদের বিশ্বদৃষ্টিকেও প্রতিবিম্বিত করে। অজ্ঞাবাদ খণ্ডনের পূর্বশর্ত তাই জটিল তত্ত্বগত সমস্যার সমাধান এবং এর সামাজিক ভিত্তি ধ্বংস করা (স্বরূপ প্রকাশ করা ও নির্মূল করে)। কল্পনাভিত্তিক পুরাতন বস্তুবাদ কিংবা ভাববাদী ডায়ালেকটিকস কোনটিই এই সমস্যার মীমাংসা করতে পারে না। এটা শুধুমাত্র সেই বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস-এর ভিত্তিতেই সমাধান করা যেতে পারে, যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদেরও জ্ঞানতত্ত্ব।

ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্বের মৌলিক প্রতিপাদ্যগুলো লেনিন তাঁর "মেটিরিয়্যালিজম এণ্ড এম্পিরিওক্রিটিসিজম গ্রন্থে এইভাবে সূত্রবদ্ধ করেছিলেন ঃ

"১) বস্তুসমূহ আমাদের চেতনা-নিরপেক্ষ ও সংবেদন-নিরপেক্ষভাবে, আমাদের বাইরে অবস্থান করে…

"২) নীতিগতভাবে পরিদৃশ্যমান ঘটনাবলী (বাহ্যিকরূপ) এবং নিগূঢ় বস্তুরূপের (thing-in-itself) মধ্যে নিশ্চিতভাবেই কোন তফাৎ নেই, এবং এই রকম কোন তফাৎ থাকতেও পারে না। দুটোর মধ্যে কেবলমাত্র একটাই পার্থক্য যে কী জানা গেছে আর কী এখনও জানা যায় নি…।

"৩) বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই জ্ঞানতত্ত্বে আমাদের চিন্তা করতে হবে ডায়ালেকটিকস এর পদ্ধতিতে অর্থাৎ, আমরা আমাদের জ্ঞানকে অপরিবর্তনীয়, সহজলভ্য বলে মনে করব না বরং নির্ণয় করব কেমন করে জ্ঞান অজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয়, কেমন করে অযথাযথ জ্ঞান হয়ে ওঠে আরও পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ।"[১]

১. ভি. আই. লেনিন; কালেক্টেড ওয়ার্কস; ১৪শ খণ্ড, ১০৩ পৃঃ।

জ্ঞানতত্ত্ব মার্কসবাদের কাছে দুটি জিনিসের জন্যে ঋণী যা একে মূলতঃ পরিবর্তিত করেছে ঃ ১) জ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের প্রসারণ ২) প্রয়োগকে জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তি ও মাপকাঠি হিসেবে উপস্থাপন। বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস চিন্তার নিয়ম থেকে বস্তুগত জগতের নিয়মের স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়েছে ; কারণ এই ডায়ালেকটিকস বহির্জগৎ ও মানবচিন্তা উভয়ের গতিশীলতার একেবারে সাধারণ নিয়মের বিজ্ঞান। এঙ্গেলস লিখেছেন, "দু প্রস্থ নিয়ম আছে যা সারবত্তার দিক থেকে অভিন্ন কিন্তু যতটা মানবমন সেগুলোকে সচেতনভাবে প্রয়োগ করতে পারে, ততটা প্রকাশের দিক থেকেই তারা পৃথক, প্রকৃতিতে এবং এখন পর্যন্ত মানব ইতিহাসের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই, এই নিয়মগুলি অচেতনভাবেই নিজেকে প্রকাশ করে··· ।"[১]

জ্ঞান ও তার গতির নিয়মগুলি (আত্মগত ডায়ালেকটিকস) তাই চিন্তাশীল মস্তিষ্কে বস্তুগত বহির্জগতের নিয়ম ও ধর্মাবলীর প্রতিবিম্ব। জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়ায় আমাদের জ্ঞানের আধেয়কে এর বাইরে অবস্থিত বস্তু ও প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করা হয়, যাকে মানুষের বাস্তব ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের, প্রকৃতির ঘটনাবলী ও প্রক্রিয়াগুলিকে আয়ত্ত করার জন্যে তার ব্যবহারিক প্রচেষ্টার বিষয়বস্তু করা হয়।

২ জ্ঞাতা ও বিষয়

শুরু থেকেই কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কে জ্ঞান থাকে না, এটা অর্জিত হয় জীবনের গতিপথে, তার ব্যবহারিক কাজকর্মের ফল হিসেবে। **মানুষের নতুন জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াকেই বলা হয় জ্ঞানপ্রক্রিয়া** (Cognition)।

জ্ঞান-প্রক্রিয়ার নিয়ম ও মর্মকে জানতে হ'লে কোন ব্যক্তিকে স্থির করতে হবে কে এর প্রয়োজক, অর্থাৎ বিষয়গত বহির্জগতের জ্ঞাতা কে ? মনে হ'তে পারে এটা কোন বড় সমস্যা নয় ; স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞান-প্রক্রিয়ার প্রয়োজক মানুষ। কিন্তু, প্রথমতঃ, দর্শনের ইতিহাসে আমরা এমন সব চিন্তাবিদের পরিচয় পাই যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে বস্তুর মর্মকে কোন মানুষের পক্ষে জানা মূলত অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, আজকাল একটা ব্যাপক প্রচলিত মত আছে যে জ্ঞানপ্রক্রিয়া এবং তার এই ধরনের রূপ, যেমন তত্ত্বগত চিন্তা, শুধু মানুষই করতে পারে তা নয়, অধিকন্তু মানুষের তৈরি কম্পিউটারের মত যন্ত্রও করতে পারে। আর শেষতঃ, মানুষই জ্ঞান-প্রক্রিয়ার প্রয়োজক এটা জোর দিয়ে বলাই শুধু যথেষ্ট নয়, এটাও বের করতে হবে কে তাকে প্রয়োজক করেছে এবং এই উদ্দেশ্যে তার স্বরূপকেও জানতে হবে।

১ কার্ল মার্কস এবং এফ. এঙ্গেলস; ৩য় খণ্ড, ৩৬২ পৃঃ।

লুডভিগ ফয়ারবাখ এই ভাববাদী প্রত্যয়টির সমালোচনা করেছিলেন: যেটি অনুসারে জ্ঞানপ্রক্রিয়ার প্রয়োজক হল চেতনা। তিনি এটি সঠিকভাবেই লক্ষ্য করেছিলেন যে চেতনা যেহেতু নিজেই মানুষের ধর্ম তাই তা মানুষের গুণের পরিচায়ক। ফয়ারবাখের কাছে মানুষ ছিল ভৌত ও দেহধারী সত্তা, দেশ ও কালের অধিবাসী। বস্তুগত প্রকৃতির গুণে সে বাস্তবকে জানবার সামর্থ্যের অধিকারী। মনে হয় তিনি তাঁর জ্ঞান-প্রক্রিয়াগত ধারণায় প্রাকৃতিক সারসত্তার অধিকারী নির্দিষ্ট মানুষের কথাই ভেবেছিলেন, কিন্তু, মার্কস বলেছেন, ফয়ারবাখ "কোনদিন প্রকৃত সক্রিয় মানুষের কাছে পৌঁছান নি। বিমূর্ত "মানুষে" এসে থেমে গেছেন এবং ভাবাবেগে 'সত্যিকারের দেহধারী ব্যক্তি-মানুষের' স্বীকৃতিদান ছাড়া আর বেশি দূরে এগোন নি···।"[১]

কেমন করে মানুষ তার মূর্ত, প্রকৃত মর্ম আয়ত্ত করে? মানুষ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের ক্ষমতা সমেত প্রাকৃতিক সত্তাধারীর সহজাত ধর্মাবলীর অধিকারী কিন্তু সে তার দ্বিতীয় 'সামাজিক প্রকৃতি'—সংস্কৃতি ও সভ্যতার সৃষ্টি করে, নিছক প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে আত্মসাৎ না করে বরং তার প্রয়োজন অনুসারে সেগুলিকে বদলে নিয়ে শ্রমের সাহায্যে মানুষ নিজেকে সৃষ্টি করেছে। মানুষ এটা করতে পারে কেবলমাত্র এই কারণে যে তার স্বকীয় প্রজাতির সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের সামাজিক সত্তা আছে। মার্কস লিখেছিলেন, "মানুষ কোন অপার্থিব জগতের বাসিন্দা হিসেবে নিরাবয়ব প্রাণী নয়। মানুষ হ'ল মানুষের জগৎ, রাষ্ট্র ও সমাজ।"[২]

সমাজের বাইরে কোন মানুষ নেই, তার ফলে সেখানে জ্ঞান-প্রক্রিয়ার প্রয়োজকও নেই।

কিন্তু পাঠকরা নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে পারেন, সমস্ত মানবজাতি ও সমগ্র সমাজের তো জ্ঞান হয় না, বরং জ্ঞান হয় পৃথক পৃথক ব্যক্তির। অবশ্যই, ব্যক্তি ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব অসম্ভব। এই মানুষরা ভাবনা-চিন্তা করে, তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ্য রয়েছে। কিন্তু এইসব ব্যক্তি মানুষ জ্ঞান-প্রক্রিয়ার প্রয়োজক হতে পারে এই জন্যেই যে তারা একে অপরের সঙ্গে এক ধরনের সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয় এবং সামাজিক সংগঠনের নির্দিষ্ট পর্যায় অনুসারে তাদের আয়ত্তযোগ্য যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের উপকরণগুলো লাভ করে।

জ্ঞানের মান শুধুমাত্র মানুষের স্বভাবগত ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নির্ধারিত হয় না; এক্ষেত্রে প্রধান উপাদান হ'ল সামাজিক অবস্থা ও সম্ভাবনাগুলি। যত বড় প্রতিভাশালীই নিউটন হোন না কেন, তিনি কখনই আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারতেন না। সমাজে চেতনা কোন

১ কার্ল মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, দি জার্মান আইডিওলজি, ৫৯ পৃঃ।

২ মার্কস ও এঙ্গেলস, ওয়ের্কে, বান্ড ১, ৩৭৮ পৃঃ।

ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভর করে না—এটা দেখিয়ে বিষয়গত ভাববাদ মানুষের ক্রিয়াকাণ্ডের সমষ্টিগত ফলকে চেতনাশ্রিত হিসেবে গ্রহণ করে এবং সেগুলোকে এর নিজস্ব গতিতে পরিচালিত স্বাধীন সারসত্তারূপে উপস্থিত করে বিষয়টিকে রহস্যময় করে তোলে। তাই, চিন্তা শুধু তার নির্দিষ্ট বাহন—প্রয়োজক থেকেই বিচ্ছিন্ন হয় না, বিচ্ছিন্ন হয় বিষয়বস্তু অর্থাৎ প্রয়োজকের বাইরের বস্তু ও ঘটনাবলী থেকেও।

জ্ঞান-প্রক্রিয়ায় শুধু প্রয়োজকের প্রয়োজন তা নয়, বিষয়েরও প্রয়োজন—যার সঙ্গে প্রয়োজকের (মানুষ) মিথষ্ক্রিয়া চলে। ঘটনা ও বস্তুগত প্রক্রিয়াগুলি চেতনা-নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্ববান। মানুষ স্বয়ং চেতনার প্রয়োজক, তাকে বিচার করা যেতে পারে তার জ্ঞান-প্রক্রিয়া ও ব্যবহারিক কাজকর্মের বিষয়ের দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ, ডেমোক্রিটাস ও এরিস্টটলের কালে, এমনকি গ্যালিলিও এবং নিউটনের সময়েও যে ইলেকট্রনের বাস্তব অস্তিত্ব ছিল তা মানব-জ্ঞানের সীমানার মধ্যে আসে নি; মানুষ তখন এর আবিষ্কার এবং তার চিন্তা ও কর্মের বিষয় করার সামর্থ্য লাভ করে নি। কেবলমাত্র সামাজিক প্রয়োগের অগ্রগতির পর্যায়কে জেনে আমরা অনুমান করতে পারি যে প্রকৃতির কোন বিষয় মানবজ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ সামাজিক জীবনের উপাদান হবে। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক প্রয়োগ এখন এমন একটা পর্যায়ে আছে যে আমাদের গ্রহের চারপাশের মহাশূন্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহের অনুসন্ধান ক্রমশ মানুষের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। মানুষ কমবেশি মানুষের রূপান্তরিত প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করে। সে চিরদিনই প্রকৃতির নব নব ঘটনাবলীকে তার নিজের সত্তার কক্ষপথে আনছে, সেগুলোকে তার কর্মকাণ্ডের বিষয়ে পরিণত করছে। এইভাবেই মানবজগতের বিস্তার ঘটছে ও তা গভীরতর হচ্ছে। ফয়ারবাখের সত্তার ধারণাটিকে সমালোচনা করে মার্কস লিখেছেন, "তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ অনন্তকাল থেকে সরাসরি উদ্ভূত কোনো কিছু নয়, চিরদিনই সেটা একরকমই রয়েছে, কিন্তু এগুলো শ্রমশিল্প ও সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি।...চেরীগাছ, প্রায় সমস্ত ফলের গাছের মতই সুপরিচিত কিন্তু মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে আমাদের অঞ্চলে বাণিজ্যের মাধ্যমে রোপণ করা হয়েছিল এবং সেই জন্যেই একটি নির্দিষ্ট সমাজের নির্দিষ্ট যুগে এই কাজের দ্বারা এটা ফয়ারবাখের ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় হয়েছে।"[১]

এসব থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রয়োজক ও বিষয়—যার ওপর প্রয়োজকের কাজের ফলে দুটিই একটা সামাজিক চরিত্রসম্পন্ন হয়ে ওঠে এবং মানুষের প্রয়োগগত কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভর করে। এই ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় সংস্কৃতি, জ্ঞান যার একটি উপাদান।

[১] কার্ল মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, দি জার্মান আইডিওলজি. ৫৭-৫৮ পৃঃ।

৩. প্রয়োগ। জ্ঞানের সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রকৃতি

মানুষের উপর প্রকৃতি ও সামাজিক 'প্রক্রিয়ার যে প্রভাব পড়ে সেটাই হ'ল অপরিহার্য অবস্থা, এর উপরই মানুষের জ্ঞান নির্ভরশীল, কিন্তু মানুষ কেবল তার জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে পারে বিষয়গত ঘটনাবলীর ওপর কাজ করে ও তাতে হস্তক্ষেপ ঘটিয়ে এবং সেগুলোর প্রভাব অনুভব করে তাদের রূপান্তর ঘটিয়ে। প্রয়োজক ও বিষয়ের মিথষ্ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য থেকে সিদ্ধান্ত টেনেই আমরা মানবজ্ঞানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি।

মানবজাতি এবং প্রকৃতি ভিন্ন গুণযুক্ত দুটি ব্যবস্থা কিন্তু দুটোই বাস্তব। মানুষ সামাজি ও বাস্তবসত্তাসম্পন্ন এবং সে বিষয়গত নিয়মেই কাজ করে। চেতনা ও ইচ্ছার অধিকারী হওয়ায় প্রকৃতির সঙ্গে তার মিথষ্ক্রিয়ার উপর একটা গভীর প্রভাব পড়ে কিন্তু তার দ্বারা এই মিথষ্ক্রিয়া তার বাস্তব চরিত্র হারায় না। মানুষ তার আয়ত্তাধীন প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সকল রকম উপায়-উপকরণ দিয়ে প্রকৃতির ঘটনাবলী ও বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল, সেগুলোকে সে পরিবর্তিত করে এবং এইসঙ্গে নিজেকেও পরিবর্তিত করে। মানুষের এই বিষয়গত বাস্তব ক্রিয়াকাণ্ডই প্রয়োগ বলে পরিচিত।

প্রয়োগ প্রত্যয়টি কেবল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞানতত্ত্বেই নয় অধিকন্তু সমগ্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনেরই মূল বিষয়। প্রয়োগকে শুধু উৎপাদনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ করা যায় না। যদি তা হয় তাহলে মানুষ হয়ে পড়ে অর্থনৈতিক সত্তা; শ্রমের দ্বারা মানুষ তার খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান ইত্যাদির প্রয়োজন মেটায় এবং তার চেতনা হয়ে পড়ে বিশুদ্ধ কারিগরী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। ভিত্তি হিসেবে অর্থনৈতিক উৎপাদনের স্থান প্রয়োগে আছে কিন্তু মানুষের বাস্তব কার্যকলাপকে শুধু উৎপাদন-কর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। ব্যাপকার্থে ব্যবহারিক কাজকর্ম মানুষের সমগ্র বাস্তব ক্রিয়াকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। এটা তার সামাজিক সত্তার সকল দিককে জড়িয়ে নেয় এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্যে তার বস্তুগত ও আত্মিক সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়। শ্রেণী-সংগ্রাম, শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের বিকাশও এর মধ্যে পড়ে।

তার উৎপাদনমূলক শ্রমকর্মে মানুষ প্রকৃতিকে অন্য প্রাণীর মত অর্থাৎ তারা তাদের সন্তানসন্ততিদের আশু প্রয়োজন মেটানোর কাজেই ব্যবহার করে না; মানুষ একটা সার্বিক সত্তা সে সেইসব জিনিস তৈরি করে যা প্রকৃতির মধ্যে নেই এবং নিরন্তরভাবে সৃষ্ট ও বিকাশমান লক্ষ্য অনুসারে সে তার স্বকীয় মাত্রা ও মানদণ্ডে সবকিছু সৃষ্টি করে। এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ চেতনা ছাড়া অসম্ভব।

মানুষের সমস্ত রকম ক্রিয়াকলাপ গড়ে ওঠে শ্রম ও উৎপাদনের ভিত্তির উপর এবং এই সব ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয় নানা বিষয়, প্রক্রিয়া ও বিষয়গত বাস্তবতার নিয়ম-সংক্রান্ত জ্ঞান। আদিতে জ্ঞান বাস্তব উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নিঃ একটা ছিল আর একটার অংশ। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাব-সৃষ্টি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বস্তুর উৎপাদন থেকে এবং জ্ঞান প্রক্রিয়া হ'ল মানুষের স্বতন্ত্র তত্ত্বগত কর্ম; গড়ে উঠল এর নিজস্ব বিষয়বস্তু ও নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য। এটাই পরে তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে বিরোধিতার জন্ম দিল, যা কার্যত আপেক্ষিক চরিত্রের।

তত্ত্বগত কাজ ও প্রয়োগ কর্মের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গেলে আমরা দেখি প্রয়োগের ওপর তত্ত্বের নির্ভরশীলতা এবং এর আপেক্ষিক স্বাধীনতা। জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। **প্রয়োগের ওপর জ্ঞানের নির্ভরতা আমাদের কাছে জ্ঞানের সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করে।** জ্ঞান-প্রক্রিয়ার সকল দিকই সমাজের সঙ্গে জড়িত এবং সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সামাজিক মর্মসম্পন্ন মানুষ জ্ঞান-প্রক্রিয়ার প্রয়োজক, বিষয় হ'ল প্রাকৃতিক বিষয় বা মানুষের পছন্দসই ঘটনা এবং এসব তার কর্মক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত; প্রয়োগ হল বিষয়গত, বাস্তব কাজকর্ম—যার মধ্যে মানুষের স্বরূপচ্যুতি তো ঘটেই না উপরন্তু সে স্বরূপ অর্জনই করে, এইভাবেই সৃষ্টি করে নিজেকে, তার ইতিহাসকে।

প্রকৃতি থেকে মানুষ জন্মগত সূত্রে পেয়েছে কতকগুলি জৈবিক উপাদান—যার ওপর চেতনার কাজ নির্ভর করে; এগুলি হ'ল মস্তিষ্ক ও চমৎকারভাবে বিকশিত স্নায়ুতন্ত্র। কিন্তু সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়ায় মানুষের প্রাকৃতিক অঙ্গগুলির উদ্দেশ্য এবং কর্মপ্রণালী বদলে গেছে। এঙ্গেলস লিখেছেন, "তাই হাত শুধুই শ্রমের অঙ্গ নয়, **এটাও শ্রমেরই সৃষ্টি।**"[১] সামাজিক কার্যকলাপের কল্যাণেই ইন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক ও হাত মহান শিল্পীদের অপূর্ব চিত্র ও মূর্তি, দীপ্তিমান সঙ্গীতজ্ঞদের সুরসৃষ্টি, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম, বিজ্ঞান ও দর্শন সৃষ্টি করার সামর্থ্য লাভ করেছে।

জ্ঞানের সামাজিক চরিত্র থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে মানুষের সামাজিক প্রয়োজন ও তার বাস্তব কাজকর্মের পরিবর্তনই জ্ঞান-বিকাশের কারণ। এটাই জ্ঞানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তুকে নির্ধারণ করে এবং মানুষকে আরও গভীর তত্ত্বগত জ্ঞানার্জনে প্রেরণা দেয়।

জ্ঞানের আপেক্ষিক স্বাধীনতা জ্ঞানকে প্রয়োগের তাৎক্ষণিক চাহিদা থেকে খানিকটা এগিয়ে যেতে দেয়, প্রয়োগের পূর্বোপলব্ধি, নতুন ঘটনার পূর্বানুমান

১ এফ. এঙ্গেলস: ডায়ালেকটিকস অব নেচার: ১৭২ পৃঃ

আর সক্রিয়ভাবে উৎপাদন ও মানবজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ দেয়। উদাহরণস্বরূপ, সচেতনভাবে আণবিক শক্তির ব্যবহারিক লক্ষ্য স্থির করার আগেই, পরমাণুর জটিল গঠনের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছিল।

জ্ঞান প্রয়োগের অগ্রগামী হতে পারে, কারণ এর স্বকীয় নিয়ম উৎপাদনের নিয়ম থেকে পৃথক। ব্যক্তি ও সমগ্র মানবজাতি প্রয়োগের কর্তব্যগুলির মধ্যে যে-সংযোগ নিজেরাই সৃষ্টি করেছে, তা প্রায়শই জটিল ও পরোক্ষ ধরনের। যেমন, সমকালীন গণিতের গবেষণা প্রধানতঃ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা, যথা পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন এবং পরে ইঞ্জিনিয়ারিং ও উৎপাদনের প্রযুক্তিবিজ্ঞানে প্রয়োগ করা হয়।

অবশ্য, সবসময়েই ব্যবহারিক প্রয়োগ থেকে তত্ত্বের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। জ্ঞান-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এটা এমন একটি সংকীর্ণ গোলকধাঁধার দিকে নিয়ে যেতে পারে, যেখানে আর মানুষের প্রয়োগের জগতে প্রবেশের পথ নেই। তখন জ্ঞান লক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে তার সংযোগ হারিয়ে ফেলে এবং এইভাবে জ্ঞান তার প্রধান ভূমিকা—মানুষকে নতুন জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তোলা ও বস্তুগত প্রক্রিয়াগুলোকে আয়ত্ত করে মানব-কল্যাণে ব্যবহার করার কাজ থেকে বঞ্চিত হয়। তাই ব্যবহারিক কাজে সুসংবদ্ধভাবে জ্ঞানের প্রয়োগ এর বিষয়মুখিতার এবং বিষয়ের বাস্তব প্রক্রিয়াগুলির সারসত্তার মধ্যে গভীরভাবে অনুপ্রবেশের গ্যারান্টি।

৪ জ্ঞান : বাস্তবতার বৌদ্ধিক আত্তীকরণ। প্রতিবিম্ব সূত্র

জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়ার পরিণতিই জ্ঞান। জ্ঞান প্রত্যয়টি খুবই জটিল ও ব্যঞ্জনাময়। বহু জ্ঞানতত্ত্ববিদ জ্ঞানের কোনো না কোনো দিকের উপর গুরুত্ব দিয়ে একটি দিককেই সমগ্র জ্ঞানের প্রকৃতি বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই একদেশদর্শিতা তাঁদের নিয়ে গেছে একেবারে জ্ঞানের স্বরূপযুক্ত প্রধান উপাদান বর্জনের দিকে ; ফলে জ্ঞানের কতকগুলি প্রত্যয় হয়ে পড়েছে অসম্পূর্ণ, এমনকি বিভ্রান্তিকর।

জ্ঞানের প্রথম সংজ্ঞা সমাজ-জীবনের প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজের স্থান করে নেয়। জ্ঞানে মানুষ একটি বস্তুকে তত্ত্বগতভাবে আয়ত্ত করে, তাকে একটা ভাব-রূপ দেয়। জ্ঞান তার বাইরের বস্তুর সম্পর্কের নিরিখে ভাবজাত। এটি সেই বস্তু নয় যাকে মানুষ জানে, সেই ঘটনা বা ধর্ম নয় যাকে জানা যায়, এটা

বাস্তবতাকে আত্তীকরণের একটি রূপ, তার চিন্তায়, লক্ষ্যে, আকাঙ্ক্ষায় বস্তু ও প্রক্রিয়াগুলির প্রতিরূপ নির্মাণের সামর্থ্য এবং সেগুলির ভাবরূপ ও প্রত্যয় নিয়ে মানুষের কাজ করবার ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর অর্থ এই যে জ্ঞান যেহেতু ভাবগত সেহেতু তা ইন্দ্রিয়গোচর বাস্তব পদার্থ অথবা বস্তুর ঠিক নকল হতে পারে না বরং তা বাস্তবের বিপরীত, প্রযোজক ও বিষয়ের মধ্যেকার বাস্তব মিথস্ক্রিয়ার একটা বৈশিষ্ট্য বা দিক এবং মানুষের কর্মকাণ্ডের একটি রূপ হিসেবেই তার অস্তিত্ব। একটা জ্ঞান ভাবগত হলেও—স্নায়ুতন্ত্রের গতিতে ও মানুষের সৃষ্ট চিহ্নের সঙ্গে (শব্দগত, গাণিতিক ও অন্যান্য প্রতীক ইত্যাদিতে) বাস্তব বন্ধনে আবন্ধ।

যদি আমরা বলি যে জ্ঞানের বিশেষ প্রকৃতি রয়েছে ভাবগত বন্ধনের মধ্যে, তাহলে অবশ্যই আমাদের সেগুলোর আধেয়র প্রশ্নটিকে, বাস্তবতার সঙ্গে তাদের সম্পর্কের প্রশ্নটিকে উপস্থাপিত করতে হবে। এই সমস্যার ডায়ালেকটিক সমাধান এইভাবে মার্কস সূত্রায়িত করেছিলেন "ভাবরূপ মানুষের মনে প্রতিবিম্বিত এবং চিন্তার আকারে রূপান্তরিত বস্তুজগৎ ছাড়া আর কিছুই নয়।"[১]

জ্ঞান ও বাহ্যসত্তার মধ্যেকার সম্পর্ক প্রতিবিম্ব প্রত্যয়টির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। প্রাচীনকালে দর্শনে প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছিল। আধুনিক বস্তুবাদীরা এটির ব্যাপক ব্যবহার করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব প্রক্রিয়ার ওপর একটা যান্ত্রিক রঙ চড়িয়েছেন; তখন প্রতিবিম্বকে মানুষের ওপর বস্তুর প্রভাব বলে গণ্য করা হ'ত, তাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সেগুলির ছাপ ও রূপ নাকি মোমের মতো গ্রহণ করত।

যদিও প্রতিবিম্ব সূত্র শুধু মার্কসবাদ-লেনিনবাদেরই বৈশিষ্ট্যসূচক নয়, তবুও এটা সেখানে স্থানলাভ করেছে, এ সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করা হয়েছে এবং এটা নতুন আধেয় লাভ করেছে। কেন এ ধরনের একটি প্রত্যয়ের দরকার? জ্ঞানের আধেয় এবং উৎস যে-রূপে বাহ্যসত্তার সঙ্গে সংযুক্ত তার আলোচনা করবার সময় আমরা জ্ঞানকে বাহ্যসত্তার ধর্মাবলী ও নিয়মগুলোকে না বুঝে বস্তুবাদের অবস্থানকে তুলে ধরতে পারি না।

বস্তুবাদ জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে মানুষের চেতনা-নিরপেক্ষ বাহ্যসত্তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি থেকে এবং তাকে জানার সম্ভাব্যতা থেকে অগ্রসর হয়। বাহ্যসত্তার স্বীকৃতি যা জ্ঞানের আধেয়র অংশ, সেটি প্রতিবিম্ব প্রত্যয়টির সঙ্গে যুক্ত। জ্ঞান বস্তুকে প্রতিবিম্বিত করে; এর অর্থ এই যে প্রয়োজক মানুষ চিন্তার রূপকে সৃষ্টি করে যা শেষ পর্যন্ত বস্তুর প্রকৃতি, ধর্ম ও নিয়মগুলির দ্বারা নির্ধারিত হয় অর্থাৎ এটা বলা যায় যে জ্ঞানের আধেয় বিষয়গত।

১ কার্ল মার্কস, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, ১৯ পৃঃ।

জ্ঞানতত্ত্বের ভাববাদী মতবাদে প্রতিবিম্ব প্রত্যয়টিকে পরিহার করে correspondence বা অনুরূপতা শব্দটি ব্যবহার করা হয়। জ্ঞানকে বাহ্য-সত্তার ভাবরূপ হিসেবে উপস্থিত করার বদলে তাঁরা চিহ্ন বা প্রতীক শব্দটি ব্যবহার করেন। লেনিন এর বিরুদ্ধে দৃঢ় আপত্তি তুলেছিলেন, কারণ "চিহ্ন বা প্রতীক যতটা সম্ভব কল্পিত বস্তুর ইঙ্গিত দিতে পারে এবং প্রত্যেকেই এই ধরনের চিহ্ন বা প্রতীকের উদাহরণের সঙ্গে পরিচিত।"[১] ভাববাদীরা নিজেরাই, যেমন নব্য কান্টবাদী আর্নস্ট ক্যাসিরের প্রতিবিম্ব প্রত্যয়টি সম্বন্ধে তাঁদের অপছন্দের যুক্তিকে গোপন করেন নি। জ্ঞানের প্রত্যয়টিকে বিষয়ের সাপেক্ষে প্রতীক হিসাবে সমর্থন করে তিনি লিখেছেন, "আমাদের সংবেদন ও ভাবগুলি প্রতীক ও বিষয়বস্তুর প্রতিবিম্ব নয়। একটা রূপকল্পের কাছে আমরা প্রতিবিম্বিত বস্তুর সঙ্গে কোন রকমের সাদৃশ্য খুঁজি, কিন্তু আমরা কখনই এইরূপ ক্ষেত্রে এই সাদৃশ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারি না।"[২]

প্রতিবিম্ব হিসেবে জ্ঞানের ধারণাকে আজকাল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিক, এমনকি শোধনবাদী দার্শনিকরাও বিরোধিতা করেছেন। শেষোক্তরা এই অজুহাতে প্রতিবিম্বন তত্ত্বকে বাতিল করছেন যে এটা মার্কসবাদের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং আধিবিদ্যক বস্তুবাদ ; কারণ মার্কসবাদ বস্তুকে ব্যবহারিক ও তত্ত্বগতভাবে আয়ত্ত করার প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রয়োজকের সক্রিয়তার স্বীকৃতি দেয়। তাই প্রতিবিম্ব তত্ত্বকে এইসব দার্শনিকরা মতান্ধতার ভিত্তি হিসেবে উপস্থিত করেন।

অবশ্য, প্রতিবিম্বকে বস্তু ও প্রতিক্রিয়াগুলির নিষ্প্রাণ চিত্রবৎ দেখলে এবং বিষয়ীগত, মানুষের সক্রিয় সৃষ্টিশীল প্রভাব মুক্ত বলে বিবেচনা করলে তা জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দাঁড়াতে পারে না। মানব জীবনের তাৎপর্য রয়েছে মুক্ত সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে, জগতের ব্যবহারিক রূপান্তরের মধ্যে এবং জ্ঞান এই ক্রিয়াকর্মের লক্ষ্য ও কর্তব্যের সহায়ক। কিন্তু জ্ঞান জগতের রূপান্তরের হাতিয়ার হ'তে পারে কেবল তখনই, যখন তা হয় বিষয়গত, সক্রিয় এবং বাস্তবতার প্রয়োগমুখী প্রতিবিম্বন। অস্তিত্ববান বাহ্যসত্তাকে আয়ত্ত করাই জ্ঞান, বাহ্যসত্তা জ্ঞানের আধেয় অর্থাৎ জ্ঞানে বাইরের ঘটনাবলী ও প্রক্রিয়াগুলোর বৈশিষ্ট্য এবং নিয়ম প্রতিবিম্বিত হয়।

ডায়ালেকটিক বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্ব জ্ঞানের প্রকৃতিকে প্রকাশ করে, প্রতিবিম্বনের সূত্রের দ্বারা তাকে প্রতিষ্ঠিত করে ; এই জ্ঞানতত্ত্ব মানুষের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যবহারিক সক্রিয় কর্মকাণ্ডকে তার অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিবিম্ব প্রত্যয়টিকে

১ ভি. আই. লেনিন, কালেকটেড ওয়ার্কস, ১৪শ খণ্ড, ২৩৪ পৃঃ।

২ ই. ক্যাসিরের, সাবষ্টানজবেগ্রিফ অ্যাণ্ড ফাংশনবেগ্রিফ। অনটারসাচুনজেন আবের ডাই গ্রুণ্ডফ্রাজেন ডার এরকেন্টনিসক্রিটিক, ২ তেইল, বার্লিন, ১৯১০, এস ৪০৪।

নতুন আধেয়মণ্ডিত করে তোলে। জ্ঞান ও সামাজিক প্রয়োগের দ্বারা পরীক্ষিত বাস্তবতার সঙ্গতিপূর্ণ প্রতিবিম্ব।

৫ ভাষা জ্ঞানের অস্তিত্বের রূপ : সংকেত ও অর্থ

জ্ঞান ভাবগত কিন্তু বাস্তবে অস্তিত্বের জন্যে তার অবশ্যই একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বস্তুগত রূপ প্রয়োজন। বাস্তব সত্তা হিসেবে মানুষ বিষয়গতভাবেই কাজ করে এবং তার জ্ঞানেরও একটা বাস্তব রূপ আছে। মানুষ জ্ঞানকে ততটাই ব্যবহার করতে পারে যতটা এ ভাষায়, একটা ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুগত চিহ্নের রূপ নেয়।

জ্ঞান ও তার ভাষারূপ স্থিতির মধ্যে মার্কস অঙ্গাঙ্গী যোগসূত্র লক্ষ্য করেছিলেন : "শুরু থেকেই 'চৈতন্য' বস্তুর দ্বারা ভারাক্রান্ত হওয়ার দুর্ভাগ্যে ক্লিষ্ট, যা এখানে আন্দোলিত বায়ু ও শব্দস্তরে রূপে—সংক্ষেপে—ভাষায় প্রকাশমান। ভাষা চেতনার মতই প্রাচীন, ভাষা হ'ল ব্যবহারিক চেতনা যা অন্য মানুষের জন্যেও বর্তমান এবং শুধু এই কারণেই এটি প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্যেও বর্তমান…।"[১]

আপাতরূপে জ্ঞান বস্তু, ঘটনা ও ক্রিয়ার অর্থসূচক সাংকেতিক ব্যবস্থার রূপ নেয়। সংকেত বা চিহ্নে যা প্রকাশ পায়, তা অর্থ। চিহ্ন ও অর্থ অবিচ্ছেদ্য ; অর্থহীন কোন চিহ্ন বা তদ্বিপরীত কিছু হ'তে পারে না।

ভাষাতত্ত্ব এবং অ-ভাষাতত্ত্বের চিহ্নের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে, শেষোক্ত অন্তর্ভুক্ত হয় সংকেত (সিগন্যাল), নিদর্শন (মার্কিং) ইত্যাদির মধ্যে। ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্নের মধ্যে জ্ঞানের অস্তিত্ব বিদ্যমান ; আর এই চিহ্নের অর্থ বাস্তবতার নানা ঘটনা ও প্রক্রিয়ার জ্ঞানগত ভাবরূপের মধ্যে বিধৃত।[২] চিহ্ন হিসেবে ইন্দ্রিয়গোচরীভূত বস্তু ও তার অর্থের মধ্যে কোন অন্তর্নিহিত আবশ্যকীয় সংযোগ নেই। চিহ্ন হিসেবে কাজ করছে এমন বিভিন্ন বস্তুর উপর একই অর্থ আরোপ করা যায়। উপরন্তু, বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট কৃত্রিম কোন কিছু, যেমন প্রতীকও চিহ্নের কাজ করতে পারে।

---

১. কার্ল মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, দি জার্মান আইডিওলজি, ৪১—৪২ পৃঃ।

২ আধুনিক প্রচলিত যুক্তিবিজ্ঞান "ব্যাপ্তির মধ্যে অর্থ" এবং "নিবিড়তার মধ্যে অর্থ" —এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করে। প্রথমোক্তগুলি একটি শব্দের দ্বারা এক শ্রেণীর বস্তু নির্দেশ করে শেষোক্তটি এর যুক্তিসিদ্ধ তাৎপর্য। উদাহরণস্বরূপ "ব্যাপ্তির মধ্যে অর্থ" শব্দটির অর্থ হল : তিমি বললে বোঝাবে, আজ পর্যন্ত যত তিমি ছিল, আছে ও থাকবে। "নিবিড়তার মধ্যে অর্থ" বলতে বোঝায়, মহাসাগরের বাসিন্দা একটি স্তন্যপায়ী, ইত্যাদি। এখানে অর্থ শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত—ব্যাপ্তার্থে ও নিবিড়ার্থে।

জ্ঞান বিকাশের ফলে বহু ধরনের কৃত্রিম ও প্রতীকী ভাষা-জগতের নানা শাখা সৃষ্টি হয়েছে (উদাহরণস্বরূপ, গণিত, রসায়ন ইত্যাদির প্রতীকী ভাষা)। এই ভাষাগুলো স্বাভাবিক ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত কিন্তু তারা আবার আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন চিহ্নযুক্ত ব্যবস্থাও। বিজ্ঞান ক্রমশই বেশি বেশি করে জ্ঞান-প্রক্রিয়ার ফলাফলকে প্রকাশ করার জন্যে প্রতীকের সাহায্য নিচ্ছে। স্বাভাবিক ভাষায় পদগুলি সব সময় বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়গুলোকে প্রকাশ করার উপযুক্ত নয়, কারণ তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের স্বকীয় বিশেষ বোধগ্রাহ্য অর্থের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে। সঠিক ও দ্ব্যর্থহীন চিন্তার পক্ষে অপরিহার্য সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্যে ঐসব প্রতীক ব্যবহৃত হয়।

ভাষাগত কাঠামো নিয়ে জ্ঞান নিজের এক জগৎ গড়ে তোলে। এখানে জ্ঞানের নিজের নির্দিষ্ট অবয়বের মধ্যে পৃথক পৃথক উপাদানগুলো একধরনের নিয়ম অনুসারে পরস্পর গ্রথিত। এই ব্যবস্থার কাঠামো ও কাজের নিজস্ব নিয়ম আছে, নিরন্তর নতুন উপাদানের দ্বারা তা সমৃদ্ধ হচ্ছে, নিজের কাঠামো পরিবর্তিত করছে। উপরন্তু এই ব্যবস্থার কর্মবিধি আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন এবং এই বিধিগুলো বিষয়গত বাস্তবতার উপাদান ও প্রক্রিয়া এবং মানবমনে তাদের প্রতিবিম্বের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়।

ভাববাদী ধ্যান-ধারণাকে রক্ষা করার তাগিদে প্রতীকবাদকে কয়েকটি দার্শনিক সম্প্রদায় ঢালাওভাবে ব্যবহার করছে। বাস্তবিকই, যদি জ্ঞান চিহ্ন-ব্যবস্থার আকারেই থাকে এবং এই চিহ্নগুলো আধুনিক বিজ্ঞানে বেশি বেশি করে ক্রমশই প্রতীকের দ্বারা অপসারিত হয়, তাতে কি এই ধারণাই সমর্থন পাওয়া যায় না যে জ্ঞান একটা প্রতীক এবং বাস্তবতার প্রতিবিম্ব নয়?

সমকালীন প্রত্যক্ষবাদীরা এই ধারণার উপর সর্বদাই জোর দিচ্ছেন যে বিজ্ঞানে কৃত্রিম ভাষা গ্রহণ অনিবার্যভাবেই জ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতাকে বিপন্ন করেছে। ফিলিপ ফ্রাঙ্ক লিখেছেন, "নতুন পদার্থবিদ্যা আমাদের "বস্তু" ও "চিৎশক্তি" সম্বন্ধে কিছুই শেখায় না বরং অনেকটাই শেখায় শব্দার্থ বিদ্যা (Semantics)। আমরা জানছি যে, 'পথের মানুষটা' যে ভাষায় তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়, তা পদার্থবিদ্যার সাধারণ নিয়মের সূত্রায়ন করার উপযোগী নয়।"[১] এটা ঠিক যে, পদার্থবিদ্যার একটা নিজস্ব ভাষা আছে যা কোন স্বাভাবিক ভাষার মত নয়, কিন্তু পদার্থবিদ্যা এইরকম ভাষার সৃষ্টি করে তার গবেষণারত প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরে যাবার জন্যে নয় বরং সেগুলোকে আরও গভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করার জন্যে।

জ্ঞান প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে ক্রমশ প্রতীকী হয়ে উঠছে এবং বৈজ্ঞানিক

---

১ ফি. ফ্রাঙ্ক, 'প্রেজেন্ট রোল অব সায়ান্স', ইন: আত্তিডেল XII কংগ্রেসো ইন্টারনাজিওনালে ডি ফিলোসফিয়া, ভেনেজিয়া, ১২-১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮, খণ্ড-১ ফিরেঞ্জে, ১৯৫৮, ৮ পৃঃ।

তত্ত্ব প্রায়ই প্রতীকী-ব্যবস্থার আকারে প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু এই সব প্রতীক ও সমীকরণের গুরুত্ব এইখানেই যে, ওগুলোর সাহায্যে বাহ্যসত্তার আরও যথাযথ ও গভীরতর প্রতিবিম্বন পাওয়া যায়। এই প্রতীকগুলোই জ্ঞানের ফসল নয় বরং তারা কোন বিজ্ঞান অনুশীলিত বস্তু, প্রক্রিয়া, ধর্ম ও নিয়মের ভাবার্থ। আইনস্টাইনের সূত্রের $E=mc^2$ প্রতীকগুলোই জ্ঞান নয়; জ্ঞান হ'ল এই সূত্রটির সঙ্গে যুক্ত প্রতীকগুলোর তাৎপর্য; তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক পদার্থবিদ্যার অন্যতম নিয়ম—ভর ও শক্তির মধ্যের সম্পর্ককে প্রকাশ করে। তাই এর থেকে যথার্থ জ্ঞান পাওয়া যায়।

এটা ঠিক যে কোন প্রতীক বা তত্ত্ব সামগ্রিকভাবে যে-সব শ্রেণীর বস্তুকে বোঝাতে চায়, তার অর্থ উদ্ধার করা সব সময় সহজ নয়। যখন সমস্ত জ্ঞান ছিল কার্যত স্বতঃপ্রমাণিত এবং একটা নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাবরূপ বা বস্তুকে যে কোন প্রত্যয়ের মধ্যেই অনুধাবন করা যেত, সে যুগ আর নেই। এটা তাই মোটেই আকস্মিক নয় যে আমরা এখন কমবেশি বিশেষভাবে সৃষ্ট প্রতীকী ভাষার সাহায্যে প্রকাশিত তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা ও বিশদীকরণ সমস্যার জরুরী দায়িত্বের মুখোমুখি হচ্ছি।

আগের সেই "ব্যাখ্যা" পদটিই তার চিরাচরিত অর্থ হারিয়ে ফেলছে। এটা এখন শুধু ঘটনার নিয়ম ও কারণ অনুসন্ধানের অর্থে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই শুধু নয় (বিজ্ঞান কোন সময়ই এই কাজটি পরিত্যাগ করে নি এবং এটা এখনও বৈজ্ঞানিক গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান), অধিকন্তু বিমূর্ত, প্রতীকী পদ্ধতির মাধ্যমে জ্ঞানীয় তাৎপর্যের সংজ্ঞা নির্ণয়ের যৌক্তিক কর্ম, এটা পৃথক পৃথক পদ (প্রতীক) ও বিবরণের (প্রকাশ) আধেয়কে এবং গোটা তত্ত্বকেও সূচিত করে।

বিংশ শতাব্দীর যৌক্তিক চিন্তাধারা বিমূর্ত তত্ত্বগত পদ্ধতির প্রাসঙ্গিক প্রশ্নাদির সঙ্গে যথেষ্ট জড়িত হ'য়ে পড়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এটাকে খুব একটা জটিল কাজ বলে মনে হবে না। কোন একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের নিজস্ব বিশেষ ভাষা থাকে; তত্ত্বটিকে বোঝবার জন্যে আমাদের অবশ্যই এর ভাষাটিকে আরও বিশ্বজনীন ও রীতিসম্মত অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করতে হবে, এর একটা উদাহরণ হ'ল আধুনিক প্রচলিত যুক্তি বিজ্ঞানের (formal logic) ভাষা। সাধারণভাবে দুটি ভাষার মধ্যে এই ধরনের তুলনা খুবই ফলপ্রসূ কারণ এটা একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে কঠোর ভাষাতাত্ত্বিক মানদণ্ডে যাচাই করতে, এর দ্বন্দ্বহীনতা ও ব্যবহৃত পদগুলির যাথার্থ্য প্রমাণ করতে সাহায্য করে। কিন্তু এই পদ্ধতি তত্ত্বের বস্তুগত ক্ষেত্রকে ব্যাখ্যার কাজে ব্যবহার করা যায় না অর্থাৎ এর জ্ঞানগত তাৎপর্য এবং বস্তুগত আধেয়কে ঐ পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা যায় না।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যার আর একটা উপায় আছে; সেটা হ'ল পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ভাষার সঙ্গে এর ভাষার তুলনা। এটা শুধু তত্ত্বের পদ ও প্রকাশের অন্তরালবর্তী বিমূর্ত বস্তুগুলোর সন্ধানের জন্যেই প্রয়োজনীয় নয়, যেসব অভিজ্ঞতালব্ধ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলিকে প্রকৃতই পর্যবেক্ষণ করা যায় তাদের জন্যেও প্রয়োজন। অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যাখ্যা হিসেবে পরিণত এই পন্থাটি একটা বিমূর্ত তত্ত্বগত 'প্রস্থানকে বাস্তব ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে তুলতে আমাদের সাহায্য করে। কিন্তু অভিজ্ঞতালব্ধ ভাষ্য তত্ত্বগত প্রস্থানের সামগ্রিক জ্ঞানগত তাৎপর্যকে আরও বিশদ করে তোলার চূড়ান্ত সমস্যার সমাধান করে না।

একই তত্ত্বকে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে একত্র করলেও ঘটনাবলীর যে জ্ঞান এর অন্তর্ভুক্ত তার স্থান নিতে পারে না।

সমকালীন দর্শনের কয়েকটি সম্প্রদায়, বিশেষতঃ যুক্তিবাদী প্রত্যক্ষবাদ মনে করে জ্ঞান দুটি উপাদানে গঠিত—ভাষাতত্ত্বের চিহ্নযুক্ত কাজ করার নিয়ম ও ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষণ। তাই প্রত্যক্ষবাদীরা বলেন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকেও শুধু প্রচলিত যুক্তিবিজ্ঞানের পদ্ধতি দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যায় অথবা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ভাষায় রূপান্তরিত করেও এ কাজ সম্ভব। এগুলি স্বাভাবিক ভাষার কাছাকাছি আর তাই তা আমাদের ইন্দ্রিয়জ রূপকল্পের নিকটতর। এইসব প্রত্যক্ষবাদী প্রত্যয়ের দুর্বলতা এইখানেই যে, বিজ্ঞানের ভাষা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তারা ঠিক জ্ঞানটির নির্দিষ্টরূপ নিয়ে কাজ করে না। কারণ কাণ্টের সময় থেকে এটা দর্শনে গৃহীত হয়েছে যে জ্ঞানের এমন একটি বিষয়বস্তু থাকা চাই যা প্রতীকের ব্যবহার ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক পর্যবেক্ষণের (আমাদের বাইরের বস্তু) সীমা অতিক্রম করে যায়। এর তাৎপর্য এই যে তত্ত্ব ও তার বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করতে, এর অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানকে হৃদয়ঙ্গম করতে এর ব্যাখ্যাকে প্রচলিত যুক্তি-বিজ্ঞানের ভাষার সাহায্যে ও অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ পর্যবেক্ষণের মধ্যে আমাদের সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না অধিকন্তু জ্ঞানবিকাশ ও মানব সভ্যতার সাধারণ ধারার মধ্যে একে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এই পদ্ধতিতেই আমরা মননশীলতার বিকাশে, বস্তুজগতের ঘটনা ও প্রক্রিয়াগুলোকে বৌদ্ধিকভাবে আয়ত্ত করার কাজে তত্ত্বের ভূমিকাকে এবং এটি মানব চিন্তা ও কর্মকাণ্ডকে কোথায় নিয়ে চলেছে, তাও উপলব্ধি করতে পারি। তত্ত্বের জ্ঞানগত তাৎপর্য উদ্‌ঘাটনের ক্ষেত্রে দর্শনের প্রত্যয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

উপরোক্ত বিষয় থেকে এই সিদ্ধান্ত টানা যায় যে, ব্যবহারিক কাজ-কর্মের পক্ষে অপরিহার্য জ্ঞান হ'ল বাস্তবতার মননশীল আত্তীকরণ। এই আত্তীকরণ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তত্ত্ব ও প্রত্যয়গুলো সৃষ্টি হয়। এদের সৃষ্টিশীল লক্ষ্য

রয়েছে, তারা সক্রিয়ভাবে বাস্তব জগতের ঘটনা, ধর্ম ও নিয়মগুলোকে প্রতিবিম্বিত করতে পারে এবং ভাষাতত্ত্বের পদ্ধতির মধ্যে তাদের প্রকৃত অস্তিত্ব আছে।

৬ বিষয়গত সত্য

জ্ঞান মনুষ্যকর্মের পরিণাম। জ্ঞানার্জনে মানুষ সক্রিয়, সে তার নিজের লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত এবং সে এমনসব বিশেষ যন্ত্র, হাতিয়ার এবং অন্যান্য উপকরণ সৃষ্টি করে যা তার বাস্তবতাকে জানার কাজে লাগে। যে প্রক্রিয়াগুলোকে মানুষ অনুশীলন করে সে-সব ক্ষেত্রে তার হস্তক্ষেপ ক্রমশই বাড়ছে। ব্যবহারিক কাজের জন্যে আমাদের জ্ঞানের প্রয়োজন। মনুষ্য চৈতন্য ও মানুষের কর্ম-নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্ববান বাস্তব জগৎ ঠিক যেমনটি আছে, তেমনভাবেই সর্বাধিক পূর্ণতায় ও যথাযথ মাত্রায় জ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হয়। এখানে আমরা জ্ঞানের সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্নের সম্মুখীন হই। সত্য কী? কেমন করে এটা জানা সম্ভব? কোথায় সেই নির্ণায়ক (ক্রাইটেরিয়া) যা দিয়ে আমরা সত্যজ্ঞানকে অসত্য ও মিথ্যা থেকে পৃথক করতে পারি?

দীর্ঘকালের সুপ্রাচীন দার্শনিক ঐতিহ্য থেকেই আমরা জানি যে, যা বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তাই সত্য। কিন্তু ঐ সংজ্ঞাটি এত ব্যাপক ও দ্ব্যর্থব্যঞ্জক যে প্রায় সব সম্প্রদায়ের দার্শনিকরাই একে গ্রহণ করেছেন। এমনকি অজ্ঞাবাদীরাও "সঙ্গতি" এবং "বাস্তবতা" শব্দ দুটির উপর তাদের স্বকীয় ভাষ্য আরোপ করে উপরোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে একমত। অজ্ঞাবাদীরা বলেন তাঁরা সাধারণ অর্থে জ্ঞানের বিরুদ্ধে নন, কিন্তু বস্তু ও প্রক্রিয়াগুলোর আন্তস্বস্বরূপের প্রতিবিম্ব হিসেবে জ্ঞানকে দেখার বিরুদ্ধে। সুতরাং সাধারণ সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে সমস্ত দার্শনিকই জ্ঞানের লক্ষ্য সত্য লাভ এবং সত্যের অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করেন।

এইসব কারণে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী জ্ঞানতত্ত্ব সত্যের এইরকম একটা নিরাবয়ব সংজ্ঞা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি; একে আরও অগ্রসর হতে হয়েছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিষয়গত সত্যের আরও মূর্ত প্রত্যয় গড়ে তুলেছে। এই প্রত্যয় অনুযায়ী বিষয়গত সত্য বলতে সেই জ্ঞানকে বোঝায় যার বিষয়বস্তু প্রয়োজক, ব্যক্তি-মানুষ বা সমগ্র মানবজাতির উপরও নির্ভর করে না।[১]

ইতিপূর্বে আমরা এটা উল্লেখ করেছি যে মানুষের ব্যবহারিক কাজকর্মকে বাদ দিয়ে কোন জ্ঞান এবং ফলত কোন সত্যও সম্ভব নয়। এইখানেই বিষয়গত

১ ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ১৪শ খণ্ড, ১২২-১২৩ পৃঃ।

ভাববাদীরা সত্যকে মানুষ ও মানবজাতির বাইরে এক অতীন্দ্রিয় জগতে নিয়ে গিয়ে ভুল করেছেন।

অন্যদিকে, সত্যের বিষয়গত সত্তার বাইরেও তার কোন অস্তিত্ব নেই। চেতনা-নিরপেক্ষ বহির্জগৎ যদি জ্ঞানের বিষয়বস্তু না হয়, তাহ'লে জ্ঞান তার মৌলিক গুণ অর্থাৎ বস্তু-স্বরূপকে প্রতিবিম্বিত করার ক্ষমতা হারায়। তাই এই ধরনের বক্তব্য যেমন "ইলেকট্রন কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণু-কাঠামোর অংশ" অথবা "যে কোন পুঁজিবাদী সমাজের ভিত্তি মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ" হ'ল বিষয়গত সত্য, কারণ ওগুলির আধেয় নেওয়া হয়েছে বিষয়গত বাস্তবতা থেকে, বস্তুসমূহের অবস্থা থেকে—যার অস্তিত্ব এর অন্বেষকদের চেতনা-নিরপেক্ষভাবে বর্তমান।

বিষয়গত সত্যে বিষয় ও বিষয়ীর ডায়ালেকটিকস প্রকাশ পায়। একদিকে সত্য বিষয়ীভূত (বা আত্মগত), কারণ এটা মানবিক কর্মকাণ্ডের একটা রূপ; অন্যদিকে, এটা বিষয়গত, কারণ এর আধেয় ব্যক্তি অথবা সমগ্র মানবজাতির উপর নির্ভর করে না।

বস্তুবাদীদের পক্ষে···"বিষয়গত সত্যের স্বীকৃতিদান অপরিহার্য", কিন্তু অজ্ঞাবাদীর পক্ষে, আত্মগত ভাববাদীর পক্ষে, "কোন বিষয়গত সত্য থাকতে পারে না।"[১] যেহেতু ওগুলো চিন্তাশীল ব্যক্তির চেতনা-নিরপেক্ষভাবে বর্তমান, তাই তাঁরা ঘটনা এবং প্রক্রিয়াগুলোর চিন্তায় প্রতিবিম্বিত হবার সম্ভাবনাকে বাতিল করে দেন।

বিষয়গত সত্যকে নানাভাবে অস্বীকার করা হয়। কাণ্ট ও তাঁর অনুগামীরা আবশ্যকতা এবং সার্বিকতাকেই সত্যজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করতেন, যার উৎস বিষয়গত জগতে নয় বরং সংবেদনশীলতা এবং বুদ্ধির প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে, ফলত তাঁদের মতে প্রকৃতপক্ষে কোন বিষয়গত জ্ঞান নেই। মাথবাদ সত্যজ্ঞানকে এইরূপ মনে করত—যার মধ্যে সংবেদনের বিচক্ষণতা ও সরল সংযোগ অর্জন করা যায়। মার্কসবাদ বিচক্ষণতা এবং সরলতার আকাঙ্ক্ষার গুরুত্ব অস্বীকার করে না কিন্তু লেনিন লিখেছিলেন, চিন্তা "তখনই বিচক্ষণ যখন তা সঠিকভাবে বিষয়গত সত্যকে প্রতিবিম্বিত করে···।"[২] প্রয়োগবাদ ব্যবহারিক কর্ম থেকে সত্য নির্ণয় করে। ব্যবহারিক কর্মকে সে উপযোগিতাসম্পন্ন কোন কিছু লাভের জন্যে বিষয়ীগত ক্রিয়া বলে বোঝে। এটা অবশ্যই একটা বাস্তব তথ্য যে সত্যজ্ঞান সমাজ এবং বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষেও একান্ত প্রয়োজনীয় এবং উপযোগী, কিন্তু উপযোগিতা ও ব্যবহার-যোগ্যতার বিচার সত্যের উৎস নয়; বরং জ্ঞান তখনই প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, বস্তুগুলোকে পরিবর্তন করার হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে, যখন এটি বিষয়গত-

১ ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ১৪শ খণ্ড, ১২৭ পৃঃ।
২ ঐ, ১৪শ খণ্ড, ১৭০ পৃঃ।

ভাবে সত্য হয়। ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমেই জ্ঞান বাস্তবতার সংস্পর্শে আসে এবং বাস্তবতা থেকেই আধেয়কে আহরণ করে।

বৃটিশ নব্য-প্রত্যক্ষবাদের একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি বার্ট্রান্ড রাসেল সত্যকে বিশ্বাসেরই একটা রূপ বলে মনে করতেন···"বাস্তবে বিশ্বাসই হয় সত্য না হয় মিথ্যা; বাক্যগুলোও ঐ রকম হয় এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে যে ওগুলো বিশ্বাসকে প্রকাশ করতে পারে।"[১] রাসেল সত্যকে একটা বিশ্বাস বলে মনে করেন, যার সঙ্গে কতকগুলো তথ্য মেলে; মিথ্যাও একটা বিশ্বাস, তবে সেটা তথ্যের দ্বারা সমর্থিত নয়। কিসে একটা তথ্য বা ঘটনা (fact) সৃষ্টি হয় যা বিশ্বাসকে সমর্থন করে, সেই প্রশ্নটি তর্কের বিষয়; এটা কোন বাহ্যিক সম্পর্ক হতে পারে। অন্য কথায়, সত্যের নির্ধারক মুহূর্ত হিসেবে জ্ঞানের আধেয়র বস্তুনিষ্ঠতা এই তত্ত্বে স্থান পায় নি।

পরখ করা এবং প্রমাণ করার মাধ্যম হিসেবে জ্ঞানের আধেয়র ধারণাটি প্রত্যক্ষবাদীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। এই ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিষয়গত তাৎপর্য অথবা আধেয়কে তার প্রমাণ বা পরখ করার মাধ্যমের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু প্রমাণ জ্ঞানের আধেয় নয়; এটা হল বিষয়গত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া। একটি অভিন্ন বিষয়গত আধেয়যুক্ত একই বক্তব্যকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে প্রমাণ করা যেতে পারে; এইরকম করে আমরা বক্তব্যের সেই প্রমাণযোগ্য আধেয়কে পরিবর্তন করি না, ঐ সম্পর্কে (আধেয়) আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন করি মাত্র। তাই, জ্ঞান-প্রক্রিয়ায় (আমরা কেবলমাত্র বিষয়গতভাবে সত্য জ্ঞানই পেতে চাই না, অধিকন্তু বিষয়ীগতভাবে স্থিরনিশ্চয় হ'তে চাই যে এটি ঐরূপ), প্রমাণ ও যাথার্থ্য প্রতিপাদনের তাৎপর্যকে খাটো না করে আমাদের অবশ্যই সত্য ও তার প্রমাণের মাধ্যমের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে; একটার বদলে আর একটা গ্রহণযোগ্য নয়। সত্য হ'ল জ্ঞান, যার আধেয় নির্ধারিত হয় বস্তু, তার ধর্ম ও নিয়মগুলোর দ্বারা।

বিষয়গত সত্য স্থবির নয়। এ এমন একটা প্রবাহবৎ—যার মধ্যে বিভিন্ন গুণগত পর্যায় রয়েছে। পরম ও আপেক্ষিক সত্যের মধ্যে একটা স্বীকৃত পার্থক্য রয়েছে।

"পরম সত্য" কথাটি দর্শনশাস্ত্রে নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই এর অর্থ সমগ্র জগতের পূর্ণাঙ্গ ও পরম জ্ঞান। এটা হ'ল চূড়ান্ত বিচারের সত্য, মানুষের কর্মপ্রয়াস ও বিচার শক্তির চরম অভীষ্টলাভ। কিন্তু এই ধরণের জ্ঞান লাভ কী সম্ভব? নীতিগতভাবে মানুষ জগতের সব কিছু জানার ক্ষমতা রাখে, কিন্তু বাস্তবে এই সামর্থ্য সমাজের সীমাহীন ঐতিহাসিক বিকাশ-প্রক্রিয়ার

১ বার্ট্রাণ্ড রাসেল, হিউম্যান নলেজ, ইটস স্কোপ এণ্ড লিমিট্স, সিমন এণ্ড সুষ্টার, নিউইয়র্ক, ১৯৬২, ১১২ পৃঃ।

মধ্যে বাস্তবায়িত হয়। "...চিন্তার সার্বভৌমত্ব", এঙ্গেলস লিখেছেন, "বাস্তবায়িত হয় অত্যন্ত অসার্বভৌম চিন্তাশীল মানুষের পর্যায়ক্রমের মধ্যে।"[১] যেহেতু মানুষের জ্ঞান বস্তুসত্তার জ্ঞান-প্রক্রিয়ায় একটি মুহূর্ত, তাই জ্ঞানের প্রতিটি ফলশ্রুতি সার্বভৌম (নিরপেক্ষভাবে সত্য), এবং পৃথক ক্রিয়া হিসেবে তা অসার্বভৌম, তাই এর সীমা মানবসভ্যতার বিকাশের পর্যায় দ্বারা নির্ধারিত। তাই, চূড়ান্ত বিচারে যে কোন মূল্যে সত্যলাভ করার ইচ্ছা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত।

কখনও কখনও "শেষ বিচারে সত্য" পদটি পৃথক পৃথক ঘটনা এবং প্রক্রিয়ার তথ্যগত জ্ঞানকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়, যার যাথার্থ্য বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এই ধরনের সত্যকে অনেক সময় বলা হয় চিরসত্য: "লিও তলস্তয় ১৮২৮ সালে জন্মেছিলেন", "পাখীদের ঠোঁট আছে", "রাসায়নিক মৌলিক কণাগুলির পারমাণবিক ওজন আছে" ইত্যাদি।

এই ধরনের সত্যের অস্তিত্ব আছে কি? অবশ্যই আছে। কিন্তু কেউ যদি জ্ঞান-প্রক্রিয়াকে এই ধরনের জ্ঞানার্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেন তাহলে, এঙ্গেলসের ভাষায় বলা যায়, তিনি বেশিদূর এগোবেন না। তিনি লিখেছেন, "যদি মনুষ্যজাতি এমন একটা স্তরে পৌঁছয়, যখন তারা শুধু কাজ করবে চিরসত্য নিয়ে, চিন্তার সেইসব ফসল নিয়ে—যেগুলো সার্বভৌমভাবে যুক্তিসিদ্ধ এবং নিরপেক্ষ সত্যের দাবিদার, তা'হলে এটা সেই বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছবে যেখানে মননশীল জগতের অসীমতা তার প্রকৃত ও অন্তর্নিহিত শক্তির দিক থেকে নিঃশেষিত হবে এবং এইভাবে গণনাতীতকে গণনা করার মত সেই অলৌকিক কাণ্ডটি ঘটে যাবে।"[২]

বিজ্ঞান সেইসব পরম প্রামাণিকতার দাবিদার সত্য—যা পরবর্তীকালে শুধু তাদের যুগসত্য (যেমন, পরমাণু অবিভাজ্য, সমস্ত হাঁস সাদা) বলে প্রমাণিত হয়েছে, তাদের পরাস্ত করেই অগ্রসর হয়েছে। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মধ্যে প্রায়ই কিছুটা অসত্য, কিছুটা ভ্রমজ্ঞানের অস্তিত্ব থাকে—যা পরবর্তী জ্ঞান-বিকাশের ধারা ও ব্যবহারিক প্রয়োগের অগ্রগতির মধ্যে দিয়ে উদ্ঘাটিত হয়।

কিন্তু তাহলে কি আমরা বিষয়গত সত্যকে অস্বীকার করার বিপজ্জনক পথে পা দিচ্ছি না? যদি জ্ঞান-প্রক্রিয়ায় একটা ভ্রমজ্ঞানের দিক আবিষ্কৃত হয় যাকে সত্য বলে মনে করা হয়েছিল, যদি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে বিরোধটা হয় আপেক্ষিক, তাহলে সম্ভবত তাদের মধ্যে কোন সাধারণ পার্থক্য নেই। এটাই হল কার্যত আপেক্ষিকতাবাদীদের যুক্তি, যাঁরা জ্ঞানের শর্তসাপেক্ষতাকে চূড়ান্ত বলে মনে করেন। যদি সত্য আপেক্ষিক হয়, তাহ'লে তাদের দৃষ্টি-কোণ থেকে এটা বলা যেতে পারে যে বিজ্ঞান একটি সত্য থেকে আর একটি

১. এফ. এঙ্গেলস. এ্যান্টিড্যুরিং, ১০৬ পৃঃ।
২ এফ. এঙ্গেলস, এ্যান্টিড্যুরিং, ১০৬-০৭ পৃঃ।

সত্যে পৌঁছয়, অথবা, যা একই কথা, একটি অসত্য থেকে আর একটি অসত্যে যায়।

একদিক থেকে আপেক্ষিকতাবাদ ঠিক—তাহ'ল এই যে জ্ঞান ও যা কিছু অস্তিত্ববান, তাদের তরলতা ও গতিশীলতার স্বীকৃতি এর মধ্যে রয়েছে, কিন্তু এটা জ্ঞানের বিকাশকে অধিবিদ্যাগত পদ্ধতিতে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। "মার্কস ও এঙ্গেলসের বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস-এর মধ্যে নিশ্চয়ই আপেক্ষিকতার অস্তিত্ব রয়েছে কিন্তু (এই ডায়ালেকটিকস) এটাকে আপেক্ষিকতাবাদে পর্যবসিত করে না, অর্থাৎ, এটি আমাদের সমস্ত জ্ঞানের আপেক্ষিকতাকে স্বীকার করে, কিন্তু বিষয়গত সত্যকে অস্বীকার করার জন্যে নয় বরং এই অর্থে যে, এই সত্যের দিকে আমাদের জ্ঞানের সন্নিকটবর্তিতার সীমা ঐতিহাসিকভাবে শর্তাধীন।"[১]

মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্ব মতান্ধতা ও আপেক্ষিকতাবাদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে পরম ও আপেক্ষিক সত্য উভয়ের অস্তিত্বেরই স্বীকৃতি দেয় কিন্তু এটি স্বীকার ক'রে এই জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়গত জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়ার মধ্যে পরম ও আপেক্ষিক সত্যের পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠা করে। লেনিন লিখেছেন, "বস্তুবাদী হতে হ'লে বিষয়গত সত্যকে স্বীকার করতে হয়, যা আমাদের বোধেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রকাশ পায়। বিষয়গত সত্যকে স্বীকার করার অর্থ হল, যে-সত্য ব্যক্তি-মানুষ বা মানবজাতির উপর নির্ভরশীল নয়, কোন-না-কোন ভাবে সেই সত্যকে স্বীকার করা।"[২]

পরম সত্যের অস্তিত্ব আছে কারণ আমাদের বিষয়গত সত্যজ্ঞানের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা পরবর্তী বিজ্ঞান-বিকাশের ধারায় বাতিল হয় না, বরং তা শুধু নতুন আধেয় নিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে কোন একটি মুহূর্তে আমাদের জ্ঞান আপেক্ষিক: এটা বাস্তবতাকে, মোটের উপর প্রতিবিম্বিত করে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নয়, কেবলমাত্র একটা সীমা পর্যন্ত এবং জ্ঞানের আরও অগ্রগতিতে এটা হয়ে ওঠে আরও সঠিক ও আরও গভীর।

বিষয়গত সত্য হ'ল জ্ঞানের এক স্তর থেকে আর এক স্তরে চলাচলের গতিশীল প্রক্রিয়া, যার ফলে জ্ঞান বাস্তবতার আধেয় নিয়ে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এটা সবসময়ই পরম ও আপেক্ষিকের ঐক্য। লেনিন লিখেছিলেন, "বিজ্ঞানের বিকাশে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ পরম সত্যের সমষ্টিতে নতুন কণিকা যোগ করে, কিন্তু প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক প্রতিজ্ঞার সত্যের সীমা হ'ল আপেক্ষিক, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কখনও প্রসারিত হচ্ছে, কখনও সঙ্কুচিত হচ্ছে।"[৩]

১ ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ১৪শ খণ্ড, ১৩৭ পৃঃ।

২ ঐ গ্রন্থ, ১৭৩ পৃঃ।

৩ ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ১৪শ খণ্ড, ১৩৫ পৃঃ।

প্রাচীন গ্রীসে একটা জ্যামিতি উদ্ভাবিত হয়েছিল, যা বিজ্ঞানে ইউক্লিদীয় জ্যামিতি বলে পরিচিত। এটা সত্য কি না? অবশ্যই এটা বিষয়গত এবং পরম-আপেক্ষিক সত্য, কারণ এর আধেয় গৃহীত হয়েছে বিষয়গত বাস্তবতার দৈশিক সম্পর্ক থেকে। কিন্তু এটা কিছুদূর পর্যন্ত সত্য, অর্থাৎ যতক্ষণ এটা বক্রতা থেকে নিষ্কাশিত হয় (যাকে ইউক্লিদীয় জ্যামিতিতে শূন্য বলে) ততদূর পর্যন্ত সত্য, যখনই দেশকে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক বক্রতা সমেত বিবেচনা করা হয়, তখনই বৈজ্ঞানিকরা অ-ইউক্লিদীয় জ্যামিতির আশ্রয় গ্রহণ করেন (লোবাচেভস্কি অথবা রাইম্যানের)। এই জ্যামিতি আমাদের জ্ঞানের সীমাকে প্রসারিত করেছে এবং সেই পথে জ্যামিতিক জ্ঞানের বিকাশে অবদান রেখেছে—যে-পথ আমাদের বিষয়গত বাস্তবতার গভীরে নিয়ে যায়।

৭ সত্যজ্ঞানের নির্ণায়ক

বিষয়গত সত্যের অন্বেষণে মানুষের একটা মানদণ্ডের প্রয়োজন, যা তাকে ভ্রান্তি থেকে বিষয়গত সত্যের পার্থক্য করতে সাহায্য করে।

এটা খুব সহজ ব্যাপার বলেই মনে হতে পারে। বিজ্ঞান বিষয়গত সত্যের প্রকাশ করে আর মানুষ এটাকে প্রমাণ ও পরখ করার জন্যে বহু উপায় বের করেছে। কিন্তু এটাই সব নয়। সঠিকভাবে বলতে গেলে "প্রমাণ" পদটির সঠিক অর্থ হ'ল একটি জ্ঞান থেকে অপর জ্ঞানের সিদ্ধান্ত টানা, এখানে একটি জ্ঞান অনিবার্যভাবেই অপর জ্ঞানের অনুসারী—যুক্তি থেকে প্রতিপাদ্য রচনা। তাই প্রমাণ-প্রক্রিয়ায় জ্ঞান নিজের ক্ষেত্র থেকে দূরে যায় না, যেন নিজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। এইটাই সত্য নির্ণয়ের যৌক্তিক পদ্ধতি সংক্রান্ত ধারণার জন্ম দিয়েছে, এখানে একপ্রস্থ জ্ঞানের সঙ্গে অন্য জ্ঞানকে তুলনামূলকভাবে বিচার করে সত্য প্রতিপন্ন হয়।

তথাকথিত সামঞ্জস্য (Coherence) তত্ত্ব, যাকে বিংশ শতাব্দীর নব্য প্রত্যক্ষবাদীরা খুব প্রচার করেছেন, তা সাধারণভাবে এই প্রতিজ্ঞা থেকে শুরু করে যে সত্যজ্ঞানের আর কোন মানদণ্ড নেই এবং দ্বন্দ্বের স্বীকৃতিহীন পদ্ধতিগত যুক্তির নিয়মের ভিত্তিতে একপ্রস্থ জ্ঞানের সঙ্গে আর একপ্রস্থ জ্ঞানের মিলই সত্য। কিন্তু পদ্ধতিগত যুক্তিশাস্ত্র একটি প্রতিজ্ঞামূলক বিবৃতির সত্যতা তখনই সুনিশ্চিত করতে পারে, যখন ঐ বিবৃতির সূত্রটি সত্য হয়; খ থেকে ক অনুসৃত হয়, গ থেকে অনুসৃত হয় খ এইভাবে অনন্তকাল ধরে যোগ করা যায়।

কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি কোথা থেকে আমরা সাধারণ সূত্র, স্বতঃসিদ্ধ, এমনকি যৌক্তিক সিদ্ধান্তের নিয়মগুলোকে পাই, যা কোন প্রমাণের

ভিত্তি গড়ে তোলে ? এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন এরিস্টটল। যদি আমরা সামঞ্জস্য তত্ত্বকে অনুসরণ করি তবেই সেগুলোকে প্রচলিত সামঞ্জস্য (গতানুগতিক) বলে গ্রহণ করতে পারি এবং জ্ঞানের বিষয়গত সত্যতা প্রতিপন্ন করার সকল চেষ্টা খারিজ করে দিতে পারি ; এইভাবেই আমরা জ্ঞানতত্ত্বে বিষয়ীবাদ ও অজ্ঞাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করি।

সত্যজ্ঞানের নির্ণায়কের সমস্যাটি নিয়ে নানারকম দৃষ্টিভঙ্গির কথা দর্শনের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। কিছু দার্শনিক এর সমাধান পেয়েছিলেন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পর্যবেক্ষণ, ব্যক্তির সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের মধ্যে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যবেক্ষণ অবশ্যই জ্ঞানকে পরখ করার অন্যতম উপায়। কিন্তু, প্রথমত সমস্ত তত্ত্বগত প্রত্যয়গুলোকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ দ্বারা পরখ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, এঙ্গেলস লিখেছিলেন, "শুধু পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা কখনই পর্যাপ্তভাবে আবশ্যকতাকে প্রমাণ করতে পারে না···এটা এত বেশি সঠিক যে সকালে নিয়মিত সূর্যোদয় থেকে বেরিয়ে আসে না যে, আগামীকালও এটা উঠবে···।"[১] কিন্তু যে জ্ঞান নিয়ম রচনা করবে, তার মধ্যে অবশ্যই আবশ্যকতা ও সার্বিকতা থাকতেই হবে।

অবশ্য বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ কখনও কখনও বিবরণ এবং তত্ত্বকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরখ করে। কিন্তু এটি সত্যের চরম নির্ণায়ক হতে পারে না, কারণ একটি অভিন্ন তত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ফলাফল বেরোতে পারে, যা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা পরখ করা যায়। এইরূপ একটি বা বহু ফলাফল একত্রে যদি অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলেও যায়, তা সত্ত্বেও সমগ্র তত্ত্বের বিষয়গত সত্যতার কোন নিশ্চয়তা আসে না। তাছাড়া বিজ্ঞানের সকল প্রতিজ্ঞাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরখ করা যায় না। এই কারণেই এমনকি যেসব নব্য প্রত্যক্ষবাদী সত্যতা যাচাইয়ের নীতির, (অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে জ্ঞানকে পরখ করা) মুখপাত্র, তাঁরাও সত্যতার সাধারণ মানদণ্ড হিসেবে এর উপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারেন না। বিশেষত ব্যাপক মাত্রার সার্বিকতযুক্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে কারবার করার সময় তো নয়ই। তাঁরা একদিকে সত্যাখ্যান (verification) সূত্রকে রক্ষা করার জন্যে "পরীলামূলক সত্যাখ্যানের" ব্যাপক ভাষ্য হাজির করছেন, অন্যদিকে এই সূত্রটির প্রয়োগ ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করে ফেলছেন। (সকল সত্য ধারণাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায় না)। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন বৃটিশ দার্শনিক কার্ল পপার, প্রস্তাব করেছেন যে সত্যাখানের বিকল্প হবে অলীকত্ব প্রমাণ। যার অর্থ হল তত্ত্বকে প্রতিপন্ন করার পরিবর্তে খণ্ডনযোগ্য পরীক্ষামূলক তথ্য খোঁজার চেষ্টা।

---

১ এফ. এঙ্গেলস্, ডায়ালেকটিকস অব নেচার, ২২৯ পৃঃ।

অযোগ্যতা প্রমাণের তথ্যগুলো অবশ্যই বিজ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য, বিশেষত একটি তত্ত্বগত প্রস্থানের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্যতার সীমা বেঁধে দেবার উপায় হিসেবে এগুলো খুবই প্রয়োজন। কিন্তু এই পদ্ধতি বিষয়গত সত্যকে প্রমাণ করার জন্যে ব্যবহার করা যায় না।

মার্কসবাদ সত্য নির্ণয় সমস্যার সমাধান করেছে এইভাবে যে, এটি শেষ-পর্যন্ত কর্মের মধ্যে, যা কিনা জ্ঞানের ভিত্তি, অর্থাৎ, সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রয়োগের মধ্যে নিহিত। বিষয়গত সত্যকে "মানবচিন্তার ধর্ম হিসেবে গণ্য করা যায় কিনা—এই প্রশ্নটি তত্ত্বের প্রশ্ন নয় বরং প্রয়োগের প্রশ্ন। প্রয়োগে মানুষকে প্রমাণ করতে হবে সত্যকে অর্থাৎ স্বরূপ ও শক্তিকে, তার চিন্তার তদমুখিতাকে।"[১]

সত্যের মানদণ্ড হিসেবে প্রয়োগের শক্তি কোথায়? সত্যজ্ঞানের মানদণ্ডের দুটি গুণ থাকতে হবে। প্রথমত, একে হতে হবে অবশ্যই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং বস্তুগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এ মানুষকে নিয়ে যাবে জ্ঞানের ক্ষেত্রের বাইরে বস্তুগত জগতে, কারণ জ্ঞানের বস্তুসত্তাকেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, জ্ঞান, বিশেষত বিজ্ঞানের নিয়ম বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং বিশ্বজনীনতা ও অসীমতাকে একটি স্বতন্ত্র তথ্যের দ্বারা, এমনকি বহু তথ্য একত্র করেও প্রমাণ করা যায় না। মানুষের ব্যবহারিক কাজকর্ম, যার প্রকৃতি সহজাতভাবেই বিশ্বজনীন, তা এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

লেনিন বলেছেন, মানুষ "শেষ পর্যন্ত" বিষয়গত সত্যকে আয়ত্ত করে "কেবল তখনই, যখন ধারণাটি প্রয়োগের অর্থে "স্ব-সত্তাবিশিষ্ট" হয়ে ওঠে।"[২] উপরন্তু, প্রয়োগে বিশ্বজনীনতা একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত বস্তু, একটি প্রক্রিয়ার রূপ ধারণ করে এবং তাই এর "শুধু বিশ্বজনীনতার যোগ্যতাই নেই, রয়েছে সরল বাস্তবতাও।"[৩] অন্য কথায়, ব্যবহারিক প্রয়োগে বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতা ইন্দ্রিয়গোচর প্রামাণিকতার রূপ নেয়। উদাহরণ আর তথ্যের গণনাতীত সংখ্যার অসীমতার মধ্যে গিয়ে পড়ার প্রয়োজন থাকে না। জ্ঞানের ভিত্তিতে যে বাষ্পীয় ইঞ্জিন মানুষ তৈরী করেছিল, তা তাপ শক্তির যান্ত্রিক শক্তিকে রূপান্তর সম্বন্ধীয় পদার্থবিদ্যার প্রতিজ্ঞাটিকে প্রমাণ করে। তাই এঙ্গেলস বলেছিলেন, "একটি ছাড়া ১ লক্ষ ইঞ্জিনের প্রয়োজন হয় নি এটি প্রমাণ করতে…।"[৪] কী করে পারমাণবিক শক্তিকে শিল্প, কৃষি এবং ভেষজে ব্যবহার করতে হয় তা জেনে মানুষ পরমাণুর কাঠামোর ভৌত ধারণার বিষয়গত সত্যতাকে প্রমাণ করেছে।

---

১ কার্ল মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ১৩ পৃঃ।

২ ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ২১১ পৃঃ।

৩ ঐ, ২১৩ পৃঃ।

৪ এফ. এঙ্গেলস, ডায়ালেকটিকস অব নেচার, ২২৯ পৃঃ।

অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী জ্ঞানতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেকটি প্রত্যয়কে, জ্ঞানের প্রত্যেকটি কার্যকে অবশ্যই ব্যবহারিক প্রয়োগে উৎপাদন অথবা মানুষের অন্য কোন প্রকারের বাস্তব কাজের মাধ্যমেই পরখ করে দেখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, প্রমাণ-প্রক্রিয়া এক শ্রেণীর জ্ঞান থেকে আর এক শ্রেণীর জ্ঞানের সিদ্ধান্ত টানার রূপ পরিগ্রহ করে অর্থাৎ বিচারবুদ্ধি-সঞ্জাত যুক্তি পরম্পরায় যেগুলোর কতকগুলোকে পরখ করা হয় ব্যবহারিক প্রয়োগে। কিন্তু এটা কি এই ধারণার ইঙ্গিত দেয় না যে, প্রয়োগ ছাড়াও চিন্তার যৌক্তিক পদ্ধতি-নির্ভর, একশ্রেণীর জ্ঞানের সঙ্গে আর এক শ্রেণীর জ্ঞানকে মেলানোর ভিত্তিতে পৃথক একটি মানদণ্ড রয়েছে ? অবশ্যই, যৌক্তিক সিদ্ধান্ত ব্যবহারিক কাজকর্মের পৃথক পৃথক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না, কিন্তু এ থেকে এটা বোঝায় না যে সাধারণভাবে ওগুলো ব্যবহারিক কাজকর্মের সঙ্গে সম্পর্ক-হীন এবং প্রয়োগজাত নয়। লেনিন লিখেছিলেন, "……মানুষের ব্যবহারিক কাজকর্মে চেতনাকে পরিচালিত করতে নানা প্রকারের তর্কবিদ্যার (logical) ভাষার (figure) পুনরাবৃত্তি করতে হয়েছিল লক্ষ লক্ষ বার। যাতে এই সমস্ত ভাষা স্বতঃসিদ্ধতার (axiom) তাৎপর্য লাভ করতে পারে।"[১]

প্রয়োগ একটা স্থায়ী ব্যাপার নয়, বরং স্বতন্ত্র উপাদান, স্তর এবং সংযোগের দ্বারা গঠিত একটি প্রক্রিয়া। জ্ঞান কোন একটি ঐতিহাসিক কালের প্রয়োগের সীমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলোর সত্যতা প্রতিপাদনের মত যথেষ্ট ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্ভব নাও হতে পারে। এসবই প্রয়োগের আপেক্ষিকতাকে প্রতিপন্ন করে। কিন্তু এই মানদণ্ড আবার এই সঙ্গে পরমও বটে, কারণ কেবল আজ বা আগামীকালের প্রয়োগের ভিত্তিতেই বিষয়গত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। "…প্রয়োগের মানদণ্ড কখনই বস্তুর প্রকৃতির মধ্যে, মানুষের কোন ধারণাকেই সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ বা খণ্ডন করতে পারে না। এই মানদণ্ড মানুষের জ্ঞানকে 'পরম' না হ'তে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট 'অনিশ্চিত' কিন্তু এই সঙ্গে এটি সকল রকমের ভাববাদ ও অজ্ঞাবাদের বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রাম চালাবার পক্ষে যথেষ্ট নির্দিষ্ট।"[২] প্রয়োগ তার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের মানদণ্ড হিসেবে তার সীমাবদ্ধতাকেও কাটিয়ে ওঠে। প্রয়োগের অগ্রগতির মধ্যে দিয়ে জ্ঞান থেকে মিথ্যার নির্মোক খসে পড়ে এবং আমাদের প্রয়োজনীয় নতুন ফলপ্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যেতে জ্ঞানকে অনুপ্রাণিত করে।

১ ভি, আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ১৯০ পৃঃ।

২ ঐ, ১৪শ খণ্ড, ১৪২-৪৩ পৃঃ।

অষ্টম অধ্যায়

জ্ঞান-প্রক্রিয়ার ডায়ালেকটিকস

জ্ঞান স্থিতিশীল নয় বরং বিষয়গত, পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক সত্যের দিকে অগ্রগতির একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটি অসংখ্য উপাদান ও দিক নিয়ে গঠিত; এদের মধ্যে রয়েছে একটা পারস্পরিক আবশ্যকীয় সংযোগ।

১ জ্ঞানঃ যৌক্তিকতা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার ঐক্য

যে-দুটি উপাদানে জ্ঞান রূপলাভ করে দর্শন বহু পূর্বেই তাকে নির্ণয় করেছিল। এগুলো হ'ল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, প্রতিরূপ সৃষ্টি) ও যুক্তিবাদী (চিন্তার বহুরূপঃ প্রত্যয়, সিদ্ধান্ত, অনুমান, প্রকল্প, তত্ত্ব)। এ থেকে এই প্রশ্ন ওঠে যে জ্ঞানের বিকাশে এইসব উপাদানের তাৎপর্য কী? কীভাবে তারা সম্পর্কিত? এইসব প্রশ্নের অবশ্যই নানারকম উত্তর আছে।

সংবেদন তত্ত্বের অনুগামীরা ধরে নেন যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে নির্ধারক ভূমিকা নেয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদান—সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ। এখানে আমরা একটা সঠিক ধারণা পাই; কারণ বাস্তবিকই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই কোন ব্যক্তি বাহ্যজগতের সঙ্গে যুক্ত। লেনিন লিখেছিলেন, "নিঃসন্দেহে জ্ঞানতত্ত্বের প্রথম সূত্র হ'ল এই যে আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস সংবেদন।"[১] কিন্তু মানুষের সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের প্রকৃতি, জ্ঞান-প্রক্রিয়ায় তাদের ভূমিকা, বিভিন্নভাবে বোঝা যেতে পারে।

সংবেদন জ্ঞানের উৎস; কিন্তু সংবেদনের উৎসই বা কী?

ভাববাদী সংবেদনবাদ (বার্কলে, হিউম, মাখবাদী) সংবেদন এবং প্রত্যক্ষণকেই পরমসত্তা মনে করে, যাকে আমরা জানতে পারি; এটি হয় বাহ্যসত্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে অথবা সংবেদন এবং প্রত্যক্ষণের উৎসের প্রশ্নটিকে উদ্ভট বলে বাতিল করে। উপরন্তু, ভাববাদীরা বৈজ্ঞানিক তথ্যের একপেশে ব্যাখ্যা দিয়ে প্রায়ই সংবেদনের জটিল প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুমানের আশ্রয় নেন। সংবেদন দুটো বাস্তব ব্যবস্থার পারস্পরিক

---

[১] ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ১৪শ খণ্ড, ১২৬ পৃঃ।

ক্রিয়ার ফলঃ বিষয় (উদ্দীপনা), যা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বাইরে থাকে এবং বিষয়ী (জ্ঞানেন্দ্রিয়, স্নায়ুতন্ত্র), যা সংবেদনের রূপের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে।

"শারীরবৃত্তীয়" ভাববাদ যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অঙ্গ-গঠন-তন্ত্রের তথ্যাদির একটা মতান্ধ ব্যাখ্যার সাহায্যে ধরে নিয়েছিল যে একটা বাহ্য উদ্দীপনা সংবেদনকে শুধু একটা প্রেরণা যোগায়, কিন্তু এটা কোনভাবেই নির্ধারক উপাদান নয়। নির্ধারক উপাদান হল জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোর প্রত্যেকটির বিশেষ অভ্যন্তরীণ শক্তি। এই ব্যাখ্যায় সংবেদনকে প্রকৃতপক্ষে বাহ্যজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বস্তু ও প্রক্রিয়ার নিছক প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়—যার পরিণতি ঘটে অজ্ঞাবাদে।

অপর মেরুতে আমরা পাচ্ছি "সরল বাস্তববাদ" নামে আখ্যাত সংবেদন সম্বন্ধে মতবাদ। এর অনুগামীরা ধরে নেন যে মানুষের বাইরে অসংখ্য বস্তু ও প্রক্রিয়া-যুক্ত একটা বাহ্যিক জগতের অস্তিত্ব রয়েছে, সেগুলো মানুষের অনুভূতি ও প্রত্যক্ষণের অনুরূপ। ব্যক্তি এবং তার স্নায়ুতন্ত্র নাকি সংবেদনের আকারকে প্রভাবিত করতে কোন ভূমিকাই নেয় না।

বাস্তবে জ্ঞানেন্দ্রিয় অবশ্যই সংবেদন সৃষ্টির উপর একটা প্রভাব বিস্তার করে। সংবেদন হল বাস্তব জগতের আত্মমুখী ভাবরূপ। লেনিন লিখেছেন, "...যদি শুধু অক্ষিপটের উপর নির্ভর করেই বর্ণ একটি সংবেদন হয়, (যা প্রকৃতি বিজ্ঞান আপনাকে স্বীকার করতে বাধ্য করে) তাহ'লে আলোকরশ্মি অক্ষিপটের উপর পড়ে আলোর সংবেদন সৃষ্টি করে। এর অর্থ, আমাদের বাইরে, আমাদের এবং আমাদের মন-নিরপেক্ষভাবে বস্তুর একটা গতি রয়েছে। বলা যাক একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য এবং বেগসহ ইথার তরঙ্গ রয়েছে, যা অক্ষিপটের উপর কাজ করে মানুষের মধ্যে একটা বিশেষ রংএর সংবেদন সৃষ্টি করে...এইটাই বস্তুবাদঃ বস্তু আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর কাজ করে সংবেদন সৃষ্টি করে। সংবেদন নির্ভর করে মস্তিষ্ক, স্নায়ু ও অক্ষিপটের উপর অর্থাৎ একটা বিশেষভাবে সংগঠিত বস্তুর উপর।"[১]

যেহেতু সংবেদন এবং প্রত্যক্ষণ মানুষের জ্ঞানের উৎস তাই তার যথার্থতা রয়েছে। একটা সীমা পর্যন্ত ওগুলো বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দেয় যা বাস্তবতাকে সঠিকভাবে প্রতিবিম্বিত করে অর্থাৎ বাহ্যজগৎ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তথ্যের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সমন্বয় রয়েছে, যা প্রাণীর অভিব্যক্তির, পরিবেশের সঙ্গে তাদের খাপখাওয়ানোর ফল। তাই, তত্ত্বগত জ্ঞানকে পরখ করতে আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের যাথার্থ্যকে অবহেলা করি না।

১. ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ১৪শ খণ্ড, ৫৫ পৃঃ

কিন্তু বাস্তবতার ইন্দ্রিয়জ প্রতিবিম্বজাত তথ্যাদি যদিও জ্ঞানের উৎস তবু তা সমগ্র আধেয় নয়। ইংরেজ দার্শনিক লকের সংবেদনবাদের তত্ত্বের (যুক্তির মধ্যে এমন কিছুই নেই যা আগে সংবেদনের মধ্যে ছিল না) মধ্যে আধিবিদ্যক সংকীর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে, যার নাম "অভিজ্ঞতাবাদ" (empiri-ism, গ্রীক এম্পিরিয়া—অভিজ্ঞতা)। অভিজ্ঞতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সংবেদন এবং প্রত্যক্ষণ শুধু জ্ঞানের উৎসই নয়, অধিকন্তু জ্ঞান তার বাইরেও যায় না। অভিজ্ঞতাবাদ অনুযায়ী চিন্তার কাজ শুধু সব একত্র করা ও অভিজ্ঞতার লব্ধ তথ্যকে সাজানো। যেন এটাই মানুষের সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের যোগফল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বস্তুবাদী দর্শনের অভিজ্ঞতাবাদ যে-পরিমাণে অনুমানভিত্তিক সূক্ষ্ম বিচার (specula·ive scholasticism) বর্জন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের দাবী করেছিল, ততটাই তা প্রগতিশীল ছিল। পরবর্তী সময়ে অবশ্য, অভিজ্ঞতাবাদ অজ্ঞাবাদ এবং বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারের একটি উৎস হয়ে দাঁড়াল। কারণ তত্ত্বগত চিন্তার প্রতি এদের অবজ্ঞা বিজ্ঞানকে নিয়ে গেল অকেজো প্রত্যয়গুলো নিয়ে কাজ করবার দিকে। এ প্রসঙ্গে এঙ্গেলস মন্তব্য করেছেন, "...সবচেয়ে সংযত অভিজ্ঞতাবাদীদের কয়েকজন সবচেয়ে বন্ধ্যা কুসংস্কারের মধ্যে, আধুনিক অধ্যাত্মবাদের মধ্যে পতিত হন।"[১]

সমকালীন অভিজ্ঞতাবাদ নব্য প্রত্যক্ষবাদ ও যুক্তিবাদী প্রত্যক্ষবাদের রূপ ধারণ করেছে। এটা সাধারণভাবে চিন্তার বিরোধী না হলেও একে শুধুমাত্র যুক্তিসিদ্ধ গণকের (যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ, চিহ্ন দ্বারা কাজ) আকারে মেনে নেয়। নব্য প্রত্যক্ষবাদীরা আধুনিক বিজ্ঞানে কতকগুলো প্রারম্ভিক উপাদান (বিবরণ, পদসমূহ) খোঁজবার ও বিশ্লিষ্ট করবার চেষ্টা করে, যাকে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ তথ্যের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। এই তথ্যগুলোকে জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়, অন্য সমস্ত জ্ঞান এইটিতে অথবা সিদ্ধান্তের যুক্তিসিদ্ধ নিয়মে পর্যবসিত হওয়ার ফলে সেগুলো হয়ে দাঁড়ায় প্রথাগত অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সম্মতির ব্যাপার। বিজ্ঞানের সমগ্র অগ্রগতির ধারা থেকে নিঃসন্দেহে এটা দেখা যায় যে জ্ঞানকে শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষার তথ্য এবং চিহ্নযুক্ত যুক্তিসিদ্ধ কার্যক্রম—এই দুই উপাদানে পর্যবসিত করা যায় না। এর মধ্যে রয়েছে মানুষের যুক্তির সমস্ত সংশ্লেষণমূলক কাজকর্মের সমগ্রতা।

যেখানে অভিজ্ঞতাবাদীরা ইন্দ্রিয়জাত সংবেদনকে অতিরঞ্জিত করে দেখে, যুক্তিবাদী বলে পরিচিত আর একটি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে চিন্তার ভূমিকাকে একপেশেভাবে গুরুত্ব দেন এবং চূড়ান্ত বলে মনে করেন। অভিজ্ঞতাবাদীদের জ্ঞানেন্দ্রিয়বাদী চিন্তার বিপরীতে যুক্তিবাদীরা (দেকার্ত, স্পিনোজা ও

---

১ এফ, এঙ্গেলস, ডায়ালেকটিকস অব নেচার ৬০, পৃ.।

অন্যান্যেরা) 'অতীন্দ্রিয়' বৌদ্ধিক ধ্যানমগ্নতার প্রবক্তা ছিলেন। তাঁরা বৌদ্ধিক স্বজ্ঞার প্রত্যয়টিকে উপস্থাপিত করেছিলেন, যার দ্বারা যুক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যকে অতিক্রম করে বস্তু ও প্রক্রিয়াগুলোর মর্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করতে পারে। এটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ভূমিকাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় না। অভিজ্ঞতা চিন্তা-ক্রিয়ার প্রথম প্রেরণা অথবা শুধু চিন্তাজাত ধারণার বর্ণনা দিতে সাহায্য করে। এই প্রত্যয়টিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে এগিয়ে নিয়ে কয়েকজন যুক্তিবাদী (দেকার্ত) সহজাত ধারণার অস্তিত্বে পেঁছিলেন, বিশেষত, গণিত এবং যুক্তিবিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয়রূপে সেগুলোকে সম্পূর্ণ প্রাঞ্জল ও নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নেওয়া হল।

কাণ্টের অভিজ্ঞতাপূর্ববাদ কতকটা নরম সুরের, তরল যুক্তিবাদ। কাণ্টের মতে জ্ঞান দুটি স্বাধীন উৎস থেকে উৎসারিত হয়ঃ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ করা তথ্যাদি —যা জ্ঞানের আধেয় এবং (২) জ্ঞানেন্দ্রিয়তন্ত্রতা এবং বুদ্ধি—যা অভিজ্ঞতাপূর্ব (অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ)। সংবেদন ও বুদ্ধির সংশ্লেষণে জ্ঞানের সৃষ্টি—এই ধারণার ক্ষেত্রে কাণ্ট সম্পূর্ণ সঠিক কিন্তু তিনি দুটি উপাদানের পরস্পরের মধ্যে একটা প্রাচীর তুলে দিয়েছেন ; ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিষয়গুলো জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর "স্বরূপে আবদ্ধ বস্তুগুলোর" প্রভাবের সঙ্গে জড়িত, যার অস্তিত্ব চেতনা নিরপেক্ষ—অন্যদিকে জ্ঞানের যুক্তিগ্রাহ্য রূপের (সামান্য প্রত্যয়) উৎস হল অভিজ্ঞতাপূর্ব বৌদ্ধিক ক্ষমতা। তাই, কাণ্ট সঠিকভাবে সামান্য প্রত্যয়গুলোকে জ্ঞানের রূপ হিসেবে উপলব্ধি করে এইটি বুঝতে অপারগ হলেন যে এগুলো ওরকম কারণ তারা বাস্তব জগৎকে প্রতিবিম্বিত করে। অবশ্য, চিন্তার রূপগুলো নির্দিষ্ট কোনো অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ, কিন্তু ওগুলো গোটা মানবজাতির ইন্দ্রিয়গতভাবে বিষয়গত কার্যকলাপের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে। কাণ্ট ওগুলোকে মানুষের মধ্যে সহজাতরূপে বলে বিবেচনা করে ভুল করেছেন।

সংবেদনজাত ও বুদ্ধিজাত এবং অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য ও চিন্তার মধ্যেকার সম্পর্ককে জ্ঞানজগতে সঠিকভাবে বোঝা যেতে পারে কেবল মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে।

জ্ঞানের শুরু বাস্তবতার জীবন্ত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মননে। মানুষের ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা (সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, প্রতিরূপ বা ভাবরূপ) জ্ঞানের উৎস—যা তাকে বাহ্যজগতের সঙ্গে যুক্ত করে। এর অর্থ এই নয় যে প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত জানার কাজ অভিজ্ঞতা থেকেই শুরু হয়। জ্ঞান জৈবিক অর্থে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নয় বরং এ এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে সঞ্চারিত হয়। এঙ্গেলস লিখেছেন, "...প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিকেই অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে এমন নয়, এর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিকল্প হতে পারে পূর্বপুরুষদের অনেকের অভিজ্ঞতার

ফল।"[১] জ্ঞানের অনেক রূপের মধ্যে পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ করা হয় এবং এই রূপগুলো "প্রত্যেকটি ব্যক্তির বিশেষ অভিজ্ঞতা"[২] নিরপেক্ষ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা পাওয়া যায় তাই শুধু জ্ঞান নয়। নানারূপ চিন্তার সাহায্যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়লব্ধ ভাবরূপের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এমনকি "গোলাপ ফুল লাল"—এই ধরনের সহজ সিদ্ধান্তও রং ও তার বিভাগের ধারণা-ভিত্তিক সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের মধ্যেকার সম্পর্কের রূপ। প্রত্যয় ছাড়া কেউ ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না। এই কারণেই "বিশুদ্ধ" ইন্দ্রিয়জাত মনন বলে বলে কিছু নেই। মানুষের মধ্যে এটা সব সময়েই চিন্তার দ্বারা পরিব্যাপ্ত। বিশুদ্ধ চিন্তা বলেও কিছু নেই। এমনকি ভাবরূপ ও চিহ্নের আকারে হলেও এটি সব সময়ই ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়ের সঙ্গে জড়িত।

বাস্তবতার জীবন্ত ইন্দ্রিয়জ মননকে একমাত্র এই অর্থেই প্রত্যক্ষ বা সরাসরি বলে গণ্য করা যায় যে এটি আমাদের বস্তুজগতের সঙ্গে, তাদের ধর্ম ও সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত করে কিন্তু এটি পূর্বের প্রয়োগ-কর্ম, ভাষা ইত্যাদির দ্বারা শর্তাবদ্ধ। সংবেদনের ফলাফলের ভাষ্য ব্যতিরেকে জ্ঞান অসম্ভব। লেনিন মানুষের সংবেদনকে বাইরের উদ্দীপক শক্তির চেতনার তথ্যে রূপান্তরণ বলে মনে করতেন।

তাই জ্ঞান হল **বাস্তবতার ইন্দ্রিয়লব্ধ ও যৌক্তিক প্রতিবিম্বনের ঐক্য।** ইন্দ্রিয়জ রূপকল্প ও প্রতিচ্ছবি ছাড়া মানুষ প্রকৃত জ্ঞানলাভ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক বিজ্ঞানের বহু প্রত্যয় খবই বিমূর্ত, কিন্তু সেগুলোও পুরোপুরি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আধেয় থেকে মুক্ত নয়। আর তা শুধু এই কারণেই নয় যে সেগুলোর উৎপত্তির জন্যে শেষ পর্যন্ত তারা মানুষের অভিজ্ঞতার কাছে ঋণী অধিকন্তু সেগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষণের চিহ্নযুক্ত আকারের রূপে। অন্যদিকে, অভিজ্ঞতাজাত তথ্যের যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণ এবং মানুষের বুদ্ধিগত অগ্রগতির ধারায় ও তার ফলাফলের মধ্যে সেগুলোর অন্তর্ভুক্তি ছাড়া জ্ঞান কাজ চালাতে পারে না।

২ জ্ঞানের স্তর : অভিজ্ঞতাজাত ও তত্ত্বগত, বিমূর্ত ও মূর্ত।

বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের ঐক্য

ইন্দ্রিয়গত ও যৌক্তিক এই দুটি হ'ল সমস্ত জ্ঞানের মূল উপাদান। কিন্তু জ্ঞান-প্রক্রিয়ায় আমরা গুণগতভাবে বিশিষ্ট স্তরসমূহ যা তাদের পূর্ণতায়,

---

১ এফ. এঙ্গেলস, ডায়ালেকটিকস অব নেচার, ২৬৭ পৃঃ।
২ " " এ্যান্টি-ড্যুরিং, ৫১ পৃঃ।

গভীরতায় এবং পরিসরে, যে পদ্ধতির দ্বারা তাদের মৌল আধেয়প্রাপ্ত হয় এবং তাদের প্রকাশভঙ্গির বিভিন্ন স্তরের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি।

এখানে আমরা **অভিজ্ঞতাজাত** এবং **তত্ত্বগত**—এই ধরনের স্তর দেখতে পাই।

অভিজ্ঞতাজাত বলতে আমরা বুঝি সেই স্তরের জ্ঞানকে যার আধেয় অভিজ্ঞতালব্ধ (পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ) এবং কিছুটা পরিমাণে যৌক্তিক বিচারের অধীন অর্থাৎ যা কিনা কোন ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। জ্ঞানের এই স্তরে জ্ঞানের বিষয়বস্তু তার ধর্ম এবং সম্পর্কের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়—যা ইন্দ্রিয়গত মননে আয়ত্তযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক পদার্থবিদ্যায় মৌলিক কণাও অভিজ্ঞতাজাত উপলব্ধিতে আসা সম্ভব। একটা মেঘ-কক্ষে (cloud chamber)[১] অথবা শক্তিশালী ত্বরণযন্ত্রের মধ্যে গবেষকরা কণাগুলোর গতিরেখার আলোক-চিত্রের মাধ্যমে তাদের ইন্দ্রিয়গতভাবে প্রত্যক্ষ করেন। এই পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপের ফলাফল একটা বিশেষ ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের তথ্যগুলিই হল অভিজ্ঞতার ভিত্তি যা থেকে জ্ঞান আরও বিকাশের পথে এগিয়ে যায়। এই তথ্যগুলো পাওয়ার উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয় যে কোন কোন বিজ্ঞানে এমন একটা শ্রম বিভাজন হয়েছে যার ফলে বিজ্ঞানীরা এখন পরীক্ষামূলক গবেষণা, তথ্যের বিন্যাস ইত্যাদিতে বিশেষজ্ঞ হন। এটা খুবই স্বাভাবিক যে আজকাল আমরা বলি পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি। সমাজবিজ্ঞানেও আরও বেশি বেশি করে পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।[২]

তত্ত্বগত জ্ঞান অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞান থেকে পৃথক। তত্ত্বগত স্তরে বিষয় তার সংযোগ এবং নিয়মাবলীর মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়। সেগুলো আবিষ্কার করা হয় শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারাই নয় অধিকন্তু বিমূর্ত চিন্তার মাধ্যমে। মার্কস বলেছেন, তত্ত্বগত জ্ঞানের কর্তব্য হল "…দৃশ্যমান, নিছক বাহ্যিক গতিকে প্রকৃত অন্তর্নিহিত গতিতে বিশ্লিষ্ট করা…"[৩] তত্ত্বগত জ্ঞানে ইন্দ্রিয়গত দিকটি চিন্তা-লব্ধ ফলাফলের একটি ভিত্তি এবং প্রকাশের রূপ (চিহ্নপদ্ধতি) সৃষ্টি করে।

বিজ্ঞানের যে-কোন ক্ষেত্রে আমরা এমন তত্ত্বের সম্মুখীন হই যার মধ্যে জ্ঞান শুধু যে ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার সীমা ছাড়িয়ে যায় তাই নয়, অধিকন্তু কখনও কখনও জ্ঞানকে খুবই আপাতবিরোধী বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, লোবাচেভস্কির

১ কণা বিজ্ঞানের একটি যন্ত্র। এর মধ্যে কণাদের চলার পথে জলীয় বাষ্প অথবা অ্যাল কোহলের বাষ্প বিন্দু বিন্দু আকারে ঘনীভূত হয়। অনুবাদক

২ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে নবম অধ্যায় দেখুন।

৩ কার্ল মার্কস, ক্যাপিটাল, ৩য় খণ্ড, ৩০৭ পৃঃ।

জ্যামিতি ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়। অভিজ্ঞতায় আলোর নিরন্তর বেগ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না ; যখন প্লাঙ্ক প্রস্তাব করেছিলেন, আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে কোয়াণ্টাম প্যাকেট হিসেবে, তখন এই তথ্যের কোন পরীক্ষালব্ধ যাথার্থ্য ছিল না ; যখন লোবাচেভস্কি সেই স্বতঃসিদ্ধটির প্রস্তাবনা করলেন যে, "একটি সরলরেখার উপরে নয় এমন একটি বিন্দুর মধ্যে দিয়ে অন্ততঃ দুটি সরল রেখা অতিক্রম করবে যার স্থিতি ঐ সরল রেখার মতোই ঐ একই সমতলে অবস্থিত এবং একে ছেদ করবে না"—তখন তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞাটি দেশের (space) কোন চাক্ষুষ ধারণার উপর ভিত্তি করে করেন নি ; প্রকৃতপক্ষে তখনকার প্রচলিত ধারণার তিনি বিরুদ্ধতা করেছিলেন।

অভিজ্ঞতালব্ধ এবং তত্ত্বগত স্তরের জ্ঞান ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। প্রথমত, পূর্ববর্তী জ্ঞান এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ লব্ধ জ্ঞানের সামান্যীকরণের ফলে তত্ত্বগত জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। এ থেকে এটা বোঝায় না যে সমস্ত তত্ত্বই সরাসরি অভিজ্ঞতা থেকে আসে ; তাদের মধ্যে কতকগুলো পূর্ব থেকেই বর্তমান প্রত্যয় ও তত্ত্বগুলোকে গ্রহণ করে। তাই, সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন ভৌত পরীক্ষা বা জ্যোতির্বিজ্ঞানের সরাসরি পর্যবেক্ষণের কোনো ভূমিকা নেই ; এটি সৃষ্টি হয়েছিল আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব ও লোবাচেভস্কি এবং রাইম্যানের জ্যামিতির সংশ্লেষণ হিসেবে। কিন্তু যদি আমরা কোন পৃথক পৃথক তত্ত্ব না নিয়ে তত্ত্বগত জ্ঞানকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করি, তাহলেও সেটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে জড়িত।

তত্ত্বগত জ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষার তথ্যের পূর্বাভাস দিতে পারে। তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যার পরীক্ষায় প্রমাণিত হওয়ার বহু পূর্বেই বিপরীত কণার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা হয়েছিল। কিন্তু এটা ধরে নেওয়া ভুল হবে যে, শুধু ফলাফল লিপিবদ্ধ করা ছাড়া এই ক্ষেত্রে পরীক্ষণের মতো কিছুই ছিল না। বিজ্ঞানীদের মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে পজিট্রন আবিষ্কার করার ফলে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডিরাকের আবিষ্কৃত কোয়াণ্টাম সমীকরণের চমৎকার পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ মিলেছিল। এর তাৎপর্য হলো দুটো বিপরীত আধান যুক্ত একটি ইলেকট্রনের অস্তিত্ব—ধনাত্মক ও ঋণাত্মক। কিন্তু অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণ ডিরাককে শুধরে দিল ; তিনি মনে করেছিলেন ইলেকট্রনের সাদৃশ্যযুক্ত কণিকাটি একটা প্রোটন, পজিট্রন নয়। সোভিয়েত পদার্থবিজ্ঞানী ভাভিলভ একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেছিলেন, "যে কোন ভৌত পরীক্ষা, যদি সচেতনভাবে করা হয়, তার একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। কিন্তু নতুন ও অপ্রত্যাশিত সন্ধানে বেপরোয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা কাচিৎ কখনও করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে ব্যবহার করা হয় কোন একটি তত্ত্বগত কাঠামোর সত্যতা বা ভ্রান্তি সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্যে…পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ উত্তর কখনও অপ্রত্যাশিত হতে পারে, সে ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে ওঠে নতুন তত্ত্বের উৎস (যেমন, তেজস্ক্রিয়তা

এইভাবেই আবিষ্কার হয়েছিল)। এই হল পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্যবান, অনুসন্ধানমূলক তাৎপর্য।"[১]

তাই, জ্ঞান-বিকাশের পূর্বশর্ত হল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তত্ত্বের নিরন্তর পারস্পরিক ক্রিয়া। যে কোনটিকে চূড়ান্ত মনে করা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিপর্যয়কর। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের লক্ষ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়—তত্ত্ব ; বৈজ্ঞানিক বিকাশ অভিজ্ঞালব্ধ তথ্যের পরিমাণের উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা করে এর আবিষ্কৃত পরিমাণগত ও গুণগত সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের উপর। প্রচুর পরিমাণে অভিজ্ঞতালব্ধ উপাদান সংগ্রহ করে আধুনিক কালে সামাজিক এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণায় নতুন বুনিয়াদী তত্ত্বের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে—যার ভিত্তিতে উপাদানগুলোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সামান্যীকরণ করা সম্ভব হবে এবং সেখান থেকে আবার এগোনো যাবে। পরীক্ষামূলক অথবা তত্ত্বগত প্রভৃতি যে সব পদ্ধতিতে জ্ঞানলাভ করা যায়, জ্ঞানের স্তর শুধু তার উপরই নির্ভর করে না বরং বস্তুর সমস্ত সংযোগ ও প্রকাশ বা তার একটি দিক কীভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তার উপরও নির্ভর করে, যদিও এই একটি দিকও খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানকে বিমূর্ত ও মূর্ত হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

নীতিগতভাবে জ্ঞান মূর্ত হয়ে উঠতে চায় অর্থাৎ বহুমুখী ও সমগ্র বিষয়টি তার অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। কিন্তু এই মূর্ততাই নানা ধরনের হতে পারে। একজন ব্যক্তির সংবেদনগত অভিজ্ঞতায় একটি বিষয় বহু সংযোগ ও সম্বন্ধের মধ্যে ধরা-পড়তে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে কেবল বাহ্যিক সংযোগ এবং সম্বন্ধগুলোই অন্তর্ভুক্ত হয়, তাই সংবেদনগত মূর্ততাটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ; এটি বিষয়কে গভীরতম সংযোগের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারে না এবং বিষয়ের প্রকৃত সমগ্রতাকে বুঝতে অসমর্থ হয়।

মূর্ততার উচ্চতর স্তরে উঠতে হলে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বহু বিষয়কে অর্জন করে প্রথমেই একটি বা কয়েকটি বিষয়কে বেছে নিতে হবে। এই অর্থে চিন্তা করাকে বিয়োজন বা বিমূর্তনের মাধ্যমে বাস্তবতাকে জানার একটা উপায় বলে গণ্য করা যেতে পারে।

বিমূর্তন কোন বিষয়কে চিন্তার সাহায্যে জানার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। যে কোন নির্দিষ্ট সম্বন্ধের মধ্যে থেকে মর্মকে উদ্ঘাটিত করে বিমূর্তন। উপরন্তু, বিশেষ কোন ধর্ম বা সম্বন্ধ, যেগুলো কোনো বস্তু ও ঘটনার অন্তর্ভুক্ত, তাদের আলাদা করে চিন্তা ঐসব বস্তু এবং পরিদৃশ্যমান ঘটনা থেকে নিজেকে পৃথক করে ফেলতে পারে। এইভাবে আমরা "শুভ্রতা", "সৌন্দর্য", "বংশগতি", "বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা" ইত্যাদি গুণের পরিচয় পাই। তর্কবিদ্যায় এই ধরনের বিমূর্তনগুলো বিমূর্ত বিষয় বলে পরিচিত।

---

১ এস আই ভাভিলভ, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৪র্থ খণ্ড; মস্কো; ১৯৫৬; ১৮ পৃঃ।

বিমূর্তন প্রক্রিয়ায় চিন্তা কোন বিষয়ের কোন একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষণ-জাত ধর্ম বা সম্বন্ধকে বেছে বের করা এবং বিচ্ছিন্ন করার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না (তাহলে বিমূর্তন সংবেদনজাত মূর্ততার ত্রুটিকে অতিক্রম করতে পারত না), অধিকন্তু অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞানের অনধিগম্য যে নিগূঢ় সম্পর্ক তাকেই উন্মুক্ত করবার চেষ্টা করে। তাই "বিমূর্তনের মধ্যে ডুবে যাওয়া" বিষয়কে গভীরভাবে জানার একটা পদ্ধতি। "মূর্ত থেকে বিমূর্তে অগ্রসরমান চিন্তা—যদি সঠিক হয়···সত্য থেকে দূরে সরে যায় না বরং আরও এর নিকটতর হয়। বস্তুর বিমূর্তন, প্রকৃতির নিয়মের বিমূর্তন, মূল্যের বিমূর্তন ইত্যাদি, সংক্ষেপে সমস্ত বৈজ্ঞানিক (সঠিক, গুরুত্বপূর্ণ, আজগুবী নয়) বিমূর্তন, প্রকৃতিকে আরও গভীরভাবে, সত্যানুগভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে প্রতিবিম্বিত করে।"[১] আধুনিক বিজ্ঞান বস্তু ও প্রক্রিয়াগুলোর রহস্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করার জন্যে যে বিমূর্তনকেই প্রধান হাতিয়ার করেছে, তা এই তথ্যকেই সমর্থন করে।

কিন্তু কোন বিমূর্তনই সর্বশক্তিমান নয়। এই পদ্ধতির সাহায্যে মানবচিন্তা বিষয়ের স্বতন্ত্র ধর্মগুলো এবং নিয়মকে পৃথক করে। বিমূর্তন পদ্ধতির দ্বারা বস্তুকে চিন্তার মধ্যে বিশ্লেষণ ও বিমূর্ত সংজ্ঞায় ভাগ করা হয়। এইসব সংজ্ঞার নির্মাণ নতুন মূর্ত জ্ঞানলাভের উপায়। চিন্তার এই গতিকে বলা হয় **বিমূর্ত থেকে মূর্ত স্তরে উত্তরণ**। এই উত্তরণ প্রক্রিয়ায় চিন্তার দ্বারা বিষয়কে সমগ্রভাবে পুনরায় সৃষ্টি করা হয়। এই প্রক্রিয়াটিকে প্রথম বর্ণনা করেছিলেন হেগেল। মার্কস এটিকে বস্তুবাদী পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং বুর্জোয়া সামাজিক সম্বন্ধকে অনুশীলন জন্যে তাঁর **ক্যাপিট্যাল** গ্রন্থে প্রয়োগ করেছিলেন। যেখানে হেগেল বিশ্বাস করতেন যে বিমূর্ত থেকে মূর্ত স্তরে উত্তরণ-প্রক্রিয়ায় খোদ বিষয়টিই সৃষ্টি হয়, মার্কস এটিকে দেখলেন মোটের উপর শুধু চিন্তার মধ্যে বিষয়টির পুনঃসৃষ্টি—নানা ধরনের বিমূর্ত সংজ্ঞার সংশ্লেষণের মাধ্যমে এর সম্বন্ধগুলোর পূর্ণতায়। তিনি লিখেছেন, "মূর্ত প্রত্যয়টি মূর্ত এই কারণেই যে এটি অনেকগুলো সংজ্ঞার সংশ্লেষণ, এইভাবে বিভিন্ন দিকের ঐক্য এর মধ্যে ব্যঞ্জনা পায়। যুক্তির ক্ষেত্রে এটা সংক্ষিপ্ত আকারে, ফল হিসেবে দেখা দেয়, সূচনা হিসেবে নয়, যদিও এটাই উৎপত্তির প্রকৃত ক্ষেত্র এবং সেই-জন্যেই প্রত্যক্ষ ও কল্পনারও উৎসভূমি। প্রথম পদ্ধতি অর্থব্যঞ্জক ভাবমূর্তি-গুলো বিমূর্ত সংজ্ঞায় সূক্ষ্মতা পায়, দ্বিতীয়টি যৌক্তিক পদ্ধতিতে বিমূর্ত সংজ্ঞা থেকে মূর্ত পরিস্থিতির পুনঃসৃষ্টির দিকে নিয়ে যায়।"[২]

ইন্দ্রিয়-জগতের মূর্ত স্তর থেকে বিমূর্তের মাধ্যমে চিন্তার মূর্ত স্তরে যাওয়ার

---

১ ভি. আই. লেনিন, কালেকটেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ১৭১ পৃঃ।

২ কার্ল মার্কস, এ কনট্রিবিউসান টু দি ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি, লণ্ডন ১৯৭১,

গতি তত্ত্বগত জ্ঞান-বিকাশের একটি নিয়ম। চিন্তার মধ্যে মূর্ততাই সবচেয়ে গভীর ও অর্থবহ জ্ঞান। উদাহরণস্বরূপ, মার্কস তাঁর ক্যাপিটাল গ্রন্থে বিশ্লেষণ শুরু করেছেন পণ্যের বিমূর্ত সংজ্ঞাটি থেকে এবং সেখান থেকে এগিয়ে গেছেন সমগ্র পুঁজিবাদী সম্বন্ধের চিত্র নির্মাণে।

একটি বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ ক'রে বিমূর্ত থেকে মূর্ততায় উত্তরণের অনুরূপ ধরনের প্রক্রিয়া, কিছু পরিবর্তিত আকারে জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে। যেমন, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় পদার্থবিদ্যা আলোক সম্পর্কে দুটি ধারণার পত্তন করে—কণার (ছেদযুক্ত) ধর্ম ও তরঙ্গ (নিরবচ্ছিন্ন) ধর্ম। কিছুদিন গেলে ধর্মগুলোর ব্যাখ্যাকে শুধু যে আরও যথাযথ (আলোক বিকিরণের তড়িচ্চুম্বকীয় বৈশিষ্ট্যের আবিষ্কার) করা হল তাই নয়, অধিকন্তু ছেদ ও নিরবচ্ছিন্নতার ধর্মগুলোকে কোয়াণ্টাম তত্ত্বের আরও মূর্ত জ্ঞানের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করার একটা নতুন ভিত্তিও পাওয়া গেল।

লেনিন লিখলেন "...যদি কোনো বস্তুর সত্য জ্ঞান আমরা পেতে চাই তাহলে আমাদের লক্ষ্য ও পরীক্ষা করতে হবে এর সমস্ত পার্শ্বের 'মধ্যবর্তী পর্যায়' ও সম্বন্ধগুলোকে। এটা এমনি একটা জিনিস যা আমরা কখনই সম্পূর্ণভাবে জানার আশা করতে পারি না, কিন্তু সমগ্রতার নিয়ম ভ্রান্তি ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতার বিরুদ্ধে একটা রক্ষা-ব্যবস্থা।"[১]

সত্য যদি মূর্ত না হয়, যদি তা জ্ঞানের বিকাশমান ধারা না হয়, যদি তা বস্তুর নতুন দিক ও সংযোগগুলোকে প্রকাশ করতে পারে এমন নতুন উপাদান সমেত অবিরাম নিজেকে সমৃদ্ধ না করে এবং আমাদের পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিক ধারণাকে গভীর না করে—তাহলে তা বস্তুনিষ্ঠ হতে পারে না। এই অর্থে সত্য সর্বদাই জ্ঞানের একটি তত্ত্বগত ব্যবস্থা, যা বিষয়কে সমগ্রভাবে প্রতিবিম্বিত করার চেষ্টা করে।

প্রয়োগের ভিত্তিতে সংঘটিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত বিষয় থেকে বিমূর্তের মাধ্যমে চিন্তার মধ্যে মূর্ত হওয়ার প্রক্রিয়ার ভিতরে রয়েছে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ। কোনো একটি ঘটনা বা বিষয়কে বিমূর্ত করে তুলতে আমাদের চিন্তার দিক থেকে অবশ্যই এটাকে ধর্ম, সম্বন্ধ, অংশ ও বিকাশের পর্যায় ইত্যাদিতে ভাগ করে ফেলতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞানীরা যখন সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেন, তখন তাঁরা যে-অংশগুলো নিয়ে ওটা গঠিত তাকেই পৃথক করে ফেলেন: তাঁরা দেখেন কালো গোলাকার চাকা পশ্চিম থেকে সূর্যের উপর দিয়ে যাচ্ছে, এটাকে অল্পক্ষণের জন্যে আবৃত করছে এবং ক্রমে ক্রমে তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, অথবা যখন সেটা পূবের দিকে যাচ্ছে তখন এর একটা অংশকে ঢেকে ফেলছে। এই সঙ্গে তাঁরা সূর্যের বহির্মণ্ডল ও তার জ্যোতির্বলয়ের মধ্যে

১ ভি. আই. লেনিন, কালেকটেড ওয়ার্কস, ৩২শ খণ্ড, ৯৪ পৃঃ।

পরিবর্তন এবং এর চারিদিকের ছটাকে পর্যবেক্ষণ করে, তথাকথিত বর্ণালী ক্ষেত্র, স্ফীতকায় অংশ ইত্যাদির পার্থক্য লক্ষ্য করেন। অন্যদিকে চিন্তার মধ্যে সংশ্লেষণের ভিত্তিতে বিষয়কে মূর্ত করে তোলার কাজ কোনো একটি বিষয় এবং বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যেকার নানা ধর্ম ও সম্বন্ধগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার ভিত্তিতে অগ্রসর হয়। যথা, আধুনিক বিজ্ঞান সৌর তেজ বিকীরণ ও পৃথিবীতে তাপ-পারিমাণবিক বিকীরণকে এক নীতিতে পর্যবসিত করেছে। বিভিন্ন ঘটনা, দিক ও ধর্মাবলীকে চিন্তাজগতে সংযুক্ত করাকে সম্ভব করছে বিষয়গত নিয়মগুলো। "···ভুল না করে, চিন্তা কেবল চেতনার সেই উপাদানগুলোকে একটা ঐক্যের মধ্যে আনতে পারে, যার মধ্যে বা যার সাদৃশ্যযুক্ত বিষয়ের মধ্যে ঐক্য আগে থেকেই ছিল।"[১]

চিন্তার সাংশ্লেষণিক ক্ষমতা বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিশীলতার এমন এক ভিত্তি গড়ে তোলে যার সাহায্যে বাস্তবতাকে তার সকল বস্তুনিষ্ঠতা ও মূর্ততার মধ্যে জানতে পারা যায়। জ্ঞান শুধু বিশ্লেষণ বা শুধু সংশ্লেষণ করেই যথাযথভাবে এগিয়ে যেতে পারে না। সংশ্লেষণের আগে আসে বিশ্লেষণ, কিন্তু বিশ্লেষণ সম্ভব যা আগে সংশ্লেষিত হয়েছে তার ভিত্তিতে; বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের মধ্যে সংযোগটি আঙ্গিক ও সহজভাবে অপরিহার্য।

৩ ঐতিহাসিক ও যৌক্তিক চিন্তার দ্বারা বিষয়ের প্রতিচ্ছবি সৃষ্টির রূপ

কোন বিষয়কে তার সকল বাস্তবতা ও মূর্ততার মধ্যে চিন্তায় পুনর্নির্মাণ করার অর্থ হল বিকাশের মধ্যে, ইতিহাসের মধ্যে তাকে জানা, সুতরাং জ্ঞান-লাভের নানা উপায়ের মধ্যে দুটি পদ্ধতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য : ঐতিহাসিক ও যৌক্তিক।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি বিভিন্ন বস্তুকে তাদের কালক্রম ও তাদের ঐতিহাসিক রূপের মূর্ততার মধ্যে বিভিন্ন স্তরকে সন্ধান করার সঙ্গে জড়িত। যেমন, ধরা যাক আমাদের পুঁজিবাদের বিকাশকে বিবৃত করতে হবে। ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসারে আমরা এই প্রক্রিয়াটির বর্ণনা আরম্ভ করব ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এর সূচনা ও বিকাশের প্রসঙ্গ দিয়ে। এর মধ্যে থাকবে ঐ সব দেশের বিস্তারিত বর্ণনা ও বহু নির্দিষ্ট মূর্ত বিষয়—যার মধ্যে দিয়ে বিশ্বজনীনতা, অপরিহার্যতা, বিশেষ, স্বতন্ত্র ও আকস্মিকতা প্রকাশ পায়। ইতিহাসের গতিকে তার রূপ-বৈচিত্র্য সমেত যতটা প্রকাশ করতে পারে এই পদ্ধতি ততটাই উপযোগী।

১. এফ. এঙ্গেলস, এ্যান্টিডুারিং, ৫৬ পৃঃ।

কিন্তু কোন বিষয়ের ইতিহাসকে পর্যালোচনা করতে, এর বিকাশের প্রধান স্তরগুলোকে এবং মূল ঐতিহাসিক সম্পর্কগুলোকে পৃথক করতে ঐ বিষয় ও তার মর্ম সম্পর্কে তত্ত্বগত ধারণা থাকা প্রয়োজন। সেইজন্যে আর একটি পদ্ধতি হল **যৌক্তিক পদ্ধতি**। এই পদ্ধতির লক্ষ্য হল, একটা বিমূর্ত পদ্ধতির মধ্যে তত্ত্বের আকারে মর্ম ও বিচার্য বিষয়ের মূল আধেয়কে পুনরায় সৃষ্টি করা। কোনো বিষয়ের সবচেয়ে বিকশিত অবস্থা থেকে এই ধরনের অনুসন্ধান শুরু হয়।

ঐতিহাসিক পদ্ধতির চেয়ে যৌক্তিক পদ্ধতির কতকগুলো বেশি সুযোগ আছে। প্রথমত, এটি বিষয়কে প্রকাশ করে এর একান্ত মর্মগত সম্পর্কের মধ্যে; দ্বিতীয়ত, এটি এই সঙ্গে এর ইতিহাসকে জানবার সুযোগও করে দেয়। এঙ্গেলস লিখেছিলেন, "চিন্তা-পরম্পরাকে অবশ্যই আরম্ভ করতে হবে সেই একই জিনিস থেকে—যার সঙ্গে…ইতিহাসের শুরু এবং তার গতিপথ তার বিমূর্ত ঐতিহাসিক গতিপথের ও সুসঙ্গত তত্ত্বগত রূপের প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই নয়; এ একটা সংশোধিত প্রতিবিম্ব, কিন্তু ইতিহাসের বাস্তব গতিপথে উদ্ভূত নিয়ম অনুসারেই এটা সংশোধিত। এর মধ্যে প্রত্যেকটি উপাদানকে তার সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ অবস্থাতে, তার ক্লাসিক রূপের মধ্যে বিবেচনা করা যেতে পারে।"[১] তাই যৌক্তিক পদ্ধতি তত্ত্বগত আকারে বিষয়ের মর্ম এবং অপরিহার্যতা, নিয়ম ও তার বিকাশের ইতিহাস উভয়কে একই সঙ্গে প্রতিবিম্বিত করে। কারণ বিষয়কে তার উন্নততম ও সবচেয়ে পরিণত অবস্থায় পুনঃসৃষ্টি করতে গিয়ে আমরা অবশ্যই তার পূর্ববর্তী পর্যায়কে উন্নত আকারে গ্রহণ-বর্জন করে (sublated) চিন্তার অন্তর্ভুক্ত করব। এইভাবেই আমরা ইতিহাসের প্রধান ও মূল পর্যায়গুলোর জ্ঞানে উপনীত হই।

যৌক্তিক পদ্ধতি নিছক একটি প্রত্যয় থেকে আর একটি প্রত্যয়ে অনুমানজাত অবরোহণ (deduction) নয়; এটাও বাস্তব বিষয়ের প্রতিবিম্বের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। কিন্তু এটা কেবলমাত্র এর বিকাশের মর্মগত বিষয়গুলো নিয়েই হয়ে থাকে এবং এ ক্ষেত্রে এ-সব বিষয়ের আপাত দৃশ্যমান, অস্থায়ী সংযোগগুলোকে অনুসরণ করতেই হবে এমন নয়।

ঐতিহাসিক পদ্ধতির চেয়ে যৌক্তিক পদ্ধতির এক্ষেত্রেও সুবিধা রয়েছে যে, এটি গবেষণার দুটি অপরিহার্য উপাদানকে নিজের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করে। উপাদান দুটি হল ঃ কোন বিষয় বা বস্তুর কাঠামোগত অনুশীলন এবং এর ইতিহাসের ব্যাখ্যা।

ক্যাপিটাল-এ মার্কস শুরু করেছিলেত যৌক্তিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের ভিত্তিতে। তিনি ধারাবাহিকভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ককে ব্যাখ্যা

১. কার্ল মার্কস ও.এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ১ম খণ্ড, ৫১৪ পৃঃ

করেন নি, খুঁটিনাটির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন নি বরং পুঁজিবাদের আর্থনীতিক কাঠামোর সবচেয়ে পরিণত ও আদর্শ রূপকে পরীক্ষা করেছেন। তবে, লেনিনের ভাষায় তিনি দিয়ে গেছেন "পুঁজিবাদের ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত রূপে ধারণাগুলোর বিশ্লেষণ।"[১] দৃষ্টান্ত হিসেবে যেকোন প্রত্যয় বেছে নিয়েই এটা আমরা দেখতে পারি। এইভাবে ইতিহাসের গতিপথে মূল্যের পরিবর্তনশীলতার (সরল, বিকশিত, বিশ্বজনীন, মুদ্রারূপ) বিলীয়মান রূপ প্রতিবিম্বিত হয়।

গবেষণার ঐতিহাসিক ও যৌক্তিক পদ্ধতি ঘনিষ্ঠভাবে আন্তঃসম্পর্কিত, যৌক্তিক পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অচল আর বাস্তব ইতিহাসের অধ্যয়ন ছাড়া যৌক্তিক পদ্ধতির কাজ করবার মতো কোন মালমশলা থাকে না। ঐতিহাসিক ও যৌক্তিক পদ্ধতির সমন্বয়ের ভিত্তিতে প্রয়োজন মতো কোন বিষয়ের বিকাশের ইতিহাস অথবা এর সমকালীন কাঠামো, যে কোনটিই বিশেষভাবে অনুশীলন করা যায়।

যখন শুধু বস্তুটিরই ইতিহাসকে অনুশীলন করা লক্ষ্য, তখন ঐতিহাসিক পদ্ধতি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। যদি আমরা কোন জাতির ইতিহাস বা কোন বিজ্ঞানের ইতিহাসকে অনুশীলন করতে চাই, তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমরা ঐতিহাসিক পদ্ধতিকেই ব্যবহার করব। এমনকি এখানেও কিন্তু, প্রারম্ভিক নীতি হবে যৌক্তিক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির সমন্বয়। অর্থাৎ বিষয়ের সমস্ত বৈচিত্র্য, তার সমস্ত আঁকাবাঁকা গতি ও আকস্মিকতা সহ বিষয়টির ইতিহাস অনুশীলন আমাদের নিয়ে যাবে এর যুক্তি, নিয়ম ও এর বিকাশের মৌল পর্যায়গুলোর উপলব্ধিতে। যুক্তিই শুধু ইতিহাসের দিকে নিয়ে যায় না; ঐতিহাসিক গবেষণাই অগ্রসর হয় কতকগুলো প্রত্যয় এবং ফলাফল থেকে নতুন প্রত্যয়ের গঠনে, ইতিহাসকে সামান্যীকরণ করে এবং অনুসন্ধানের বিষয়ের সারসত্তাকে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করে।

চিন্তার মধ্যে বিষয়ের যৌক্তিক প্রতিরূপ নির্মাণ চলতে থাকে কতকগুলো রূপের মধ্যে দিয়ে। লেনিন জ্ঞান-প্রক্রিয়ার ডায়ালেকটিকসকে উদ্ঘাটিত করে লিখেছিলেন, "জ্ঞান হল মানুষের দ্বারা প্রকৃতির প্রতিবিম্বন। কিন্তু এটা সরল নয়, তাৎক্ষণিক নয়, সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব নয় বরং বহু বিমূর্তনের ধারা, প্রত্যয় ও নিয়মের গঠন ও বিকাশ…এখানে রয়েছে আসলে বিষয়গতভাবে **তিনটি** জিনিস: ১) প্রকৃতি, ২) মানব-জ্ঞান (একই প্রকৃতির সৃষ্টি হিসেবে **মানব-মস্তিষ্ক**) এবং (৩) মানুষের জ্ঞানে প্রকৃতিকে প্রতিবিম্বনের রূপ। এই রূপগুলো যথাযথভাবে বলতে গেলে প্রত্যয়, নিয়ম ও মূল প্রত্যয়গুলো দ্বারা গঠিত…।"[২]

---

১. ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ৩২০ পৃঃ।
২. ঐ ১৮২ পৃঃ।

চিন্তার রূপ এমন একটা নক্সা, যার দ্বারা বাহ্যসত্তা, কোনো নির্দিষ্ট বস্তু স্বকীয় ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্যে দিয়ে একটা সঙ্গতিপূর্ণ, পরস্পর-সম্পর্কিত ও বিমূর্ত ব্যবস্থার ভিতরে প্রতিবিম্বিত হয়। বিমূর্তনের মধ্যেকার পার্থক্য এই কারণেই ঘটে না যে একজন কাজ করছেন প্রকৃতি বা সমাজের একটি দিক নিয়ে, আর অন্যজন কাজ করছেন এই ধরনের আর একটি বিষয় নিয়ে, বরং এই কারণেই ঘটে যে চিন্তার মধ্যে ওগুলোর পৃথক পৃথক ভূমিকা রয়েছে। মানুষের জ্ঞানান্বেষণের লক্ষ্য নিয়ে চিন্তার এইরকম নানা ধরনের নকশা গড়ে উঠেছে এবং এগুলোর কল্যাণেই একটি বিষয়ের বিভিন্ন অঙ্গ ও সমগ্রতাকে পুরোপুরি জানা যায়।

চিন্তার যৌক্তিক মৌল রূপ হল, সিদ্ধান্ত, প্রত্যয় ও অনুমান।

তর্কবিদ্যায় সিদ্ধান্তের প্রচলিত অর্থ হল—এটি একটি চিন্তা বা কোন বিষয় সম্বন্ধে কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা ঃ যথা—"হাইড্রোজেন একটি রাসায়নিক মৌলিক কণা", "একটি পণ্যের মূল্য আছে।" একটি সিদ্ধান্তে উত্থাপিত প্রশ্নের ভাবনা-চিন্তার সমস্ত প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। যখন আমরা বিষয়ের কোন গুণ ও ধর্মকে বেছে নিই এবং কতকগুলো প্রাথমিক বিমূর্ত ধারণা তৈরী করি তখনই চিন্তার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সমস্ত প্রকৃত জ্ঞানই সিদ্ধান্ত অথবা অনেকগুলো সিদ্ধান্তের নিয়মবদ্ধ ব্যবস্থার রূপ নেয়। এমনকি জীবন্ত, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের ফলাফলের যৌক্তিক প্রকাশও সিদ্ধান্তের আকার নেয় ; যেমন "এই বাড়ীটি ওটার চেয়ে বড়।"

যে কোন সিদ্ধান্তই বিশেষ ও সার্বিকের, অভেদ ও পার্থক্যের, আকস্মিকতা ও অপরিহার্যতা প্রভৃতির মধ্যেকার সম্পর্ককে উদ্ঘাটিত করে। "অভেদ নিজের মধ্যে পার্থক্যকে ধারণ করে এই তথ্যটি প্রত্যেকটি বাক্যেই প্রকাশিত, যেখানে উদ্দেশ্যের গুণ উদ্দেশ্য থেকে একান্তভাবেই পৃথক। লিলি একটা গাছ, গোলাপ ফুল লাল, যেখানে উদ্দেশ্যের মধ্যে অথবা উদ্দেশ্যের গুণের মধ্যে, এমন একটা কিছু আছে যা উদ্দেশ্য বা তার গুণের অন্তর্ভুক্ত হয় না…শুরু থেকেই অভিন্নতার নিজের সঙ্গে অন্য সব কিছু থেকে পার্থক্যের প্রয়োজন হয়, নিজের পরিপূরক হিসেবে, এটা স্বতঃসিদ্ধ।"[১]

চিন্তার বিকাশ-প্রক্রিয়ার মধ্যে সিদ্ধান্তের রূপ পরিবর্তিত হয়। এখানে প্রধান উপাদান হ'ল স্বতন্ত্র বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত, যা কোন তথ্যকে তালিকাবদ্ধ করে ও বর্ণনা দেয় (যথা দুটো কাঠের টুকরো ঘর্ষণ করলে উত্তপ্ত হয়)- যার থেকে বিশেষের সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে পেঁছনো যায় বিশ্বজনীন সিদ্ধান্তে। বিশেষ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের মধ্যে বস্তু বা ঘটনার নানা রূপের ভিতরে সংযোগ স্থাপন করা হয়, (যেমন, যান্ত্রিক শক্তি তাপ-শক্তিতে পরিবর্তিত হয়)

১ এফ. এঙ্গেলস. ডায়ালেকটিকস অব নেচার. ২১২ পৃঃ

আর বিশ্বজনীন সিদ্ধান্তের মধ্যে ঘটনাবলীর গতিশীলতার সার্বিক নিয়মকে প্রকাশ করা হয়। (যেমন, কোন একটি রূপের শক্তিকে অপর যে কোন রূপের শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়)।

জ্ঞান বিষয়ের মধ্যে **বিশ্বজনীনতা** ও মর্মকে পৃথক করতে গিয়ে অনিবার্য-ভাবেই একটা **প্রত্যয়ে** পেঁছয়। কোন একটি বিষয়ের মধ্যে চিন্তা-নিমগ্ন থাকার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই প্রত্যয় গড়ে ওঠে। প্রত্যয়ে বিষয়ের কোন একটি স্তরের জ্ঞান সংক্ষিপ্ত রূপ পায় এবং আয়ত্ত জ্ঞান সংহত হয়। লেনিন লিখেছিলেন "মানুষের প্রত্যয়গুলো অনড় নয়, বরং নিরন্তর গতিশীল, একটি অন্যটির মধ্যে চলে যায়, তারা পরস্পরের মধ্যে প্রবাহিত হয়, তা না হলে তারা "বাস্তব জীবনকে" প্রতিবিম্বিত করতে পারে না। প্রত্যয়গুলোর বিশ্লেষণ, তাদের অনুশীলন, ওগুলোকে নিয়ে 'কাজ চালানোর কৌশল' (এঙ্গেলস) সর্বদাই প্রত্যয়গুলোর গতি, তাদের আন্তঃসংযোগ এবং পারস্পরিক উত্তরণের বিষয়টির অনুশীলন দাবি করে…।"[১]

প্রত্যয়গুলোর গতির ডায়ালেকটিক উদ্ঘাটন করার অর্থ তাদের বিকাশের নিয়মাবলীকে আবিষ্কার করা। প্রত্যয়ের বিকাশ বহুমুখী : ১) যেসব বস্তু ও ঘটনাবলী তত্ত্বগত অনুসন্ধানের বিষয়, নতুন প্রত্যয়ে তা প্রতিবিম্বিত হয়। (২) পুরনো প্রত্যয়গুলোকে মূর্ত করে তুলে সেগুলোকে আরও উচ্চতর বিমূর্তনের পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। মৌল প্রত্যয়গুলো, যা কোন বিজ্ঞানের আসল প্রত্যয়, তাদের সম্বন্ধে নতুন চিন্তা, ব্যাখ্যা ও সেগুলোকে আরও সমৃদ্ধ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিজ্ঞানে বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই এর মূলে প্রত্যয়গুলো নিয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়, পুরানো প্রত্যয়ের আধেয়র পরিবর্তন ঘটে এবং এমন সব নতুন প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয় যা বৈজ্ঞানিকের চিন্তার কাঠামো ও পদ্ধতিকে পরিবর্তিত করে।

প্রত্যয়ের সংজ্ঞার বাইরে তার কোন অস্তিত্ব নেই, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রত্যয় আরও একটি ব্যাপকতর প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। কোন বিষয়ের মর্মকে উদ্ঘাটিত করতে অনিবার্যভাবেই সাধারণ দিকটিকেই প্রকাশ করতে হয়, কারণ কোন একটি স্বতন্ত্র ঘটনার সম্পর্কে মর্ম সবসময়েই সামান্য। একটা প্রত্যয়ের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে, তার মধ্যে সামান্য কী আছে, শুধু তার উল্লেখ করাই যথেষ্ট নয়। "সমস্ত খনিজ পদার্থ আসলে 'খনিজ', এই বিবৃতির উপরে যদি কোন খনিজ বিজ্ঞানীর সমগ্র বিজ্ঞান সৃষ্টি হত তাহলে তিনি শুধু তাঁর কল্পনাতেই খনিজ বিজ্ঞানী হতেন।"[২] সুতরাং সংজ্ঞা নির্ণয় করা সব-সময়েই বিষয়টি কোন্ প্রত্যক্ষ শাখার অন্তর্ভুক্ত, তার উল্লেখের সঙ্গে জড়িত অর্থাৎ আরও বেশি সামান্য প্রত্যয়ের সঙ্গে এবং সেই আলোচ্য শাখার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের

১. ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ২৫৬ পৃঃ।
২. কার্ল মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, দি হোলি ফ্যামিলি, ৭৯ পৃঃ।

ইঙ্গিত দেওয়ার সঙ্গে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ "নক্ষত্ররাজি" প্রত্যয়টিকে এইভাবে সংজ্ঞা দেওয়া দেওয়া যায়ঃ "নক্ষত্ররাজি হল আলোক-বিকীরণকারী মহাবাশচারী প্রাকৃতিক পদার্থ।"

আমরা সাধারণত প্রত্যয়গুলোর সংজ্ঞাকে সম্ভবত সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ করার চেষ্টা করি। কিন্তু সংক্ষিপ্ততাই প্রত্যয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক নয় বরং এটি বিষয়ের সকল দিককে কতটা গ্রহণ করেছে সেটাই এর সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। ডায়ালেকটিকসের বক্তব্য হল, কেবল ঘটনার কোন সামান্য নিয়ম আবিষ্কার করা নয় অধিকন্তু যে-নিয়ম ঘটনার পরিবর্তনকে, অন্যরূপে তার উত্তরণকে, তার বিকাশের সারমর্মকে পরিচালনা করছে তাকেই আবিষ্কার করা।

অনুমান ছাড়া কোন প্রত্যয় অথবা অনুরূপ কোন চিন্তার প্রক্রিয়া থাকতে পারে না। অনুমানগুলো এমন হাতিয়ার যাদের সাহায্যে আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার আশ্রয় না নিয়ে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন জ্ঞান আয়ত্ত করি। অনুমান হল এমন প্রক্রিয়া যার সাহায্যে আমরা কতকগুলো সিদ্ধান্ত (সাধ্য আশ্রয় বাক্য) থেকে আরও কিছু সিদ্ধান্ত টানি তাই এটাকে বলা যায় সিদ্ধান্ত-ধারা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণকে ছাড়িয়ে যাবার তত্ত্বগত চিন্তাশক্তি প্রকাশ পায় অনুমানের মধ্যে। যেমন, মানুষ যদি অনুমানের মাধ্যমে নতুন জ্ঞান লাভে অসমর্থ হত, তাহলে সে আকাশের অন্যান্য বস্তু থেকে পৃথিবীর দূরত্বকে নির্ণয় করতে পারত না, সে বলতে পারত না নক্ষত্র-গুলো কী দিয়ে তৈরী, অথবা পরমাণু জগতে বা এগুলোর গঠনকারী মৌল কণার মধ্যে প্রবেশ করতে পারত না। এঙ্গেলস বলেছেন, "যদি আমাদের আশ্রয়বাক্য (premises) সঠিক হয় এবং আমরা সঠিকভাবে চিন্তার নিয়মগুলো প্রয়োগ করি, তাহলে ফলাফল অবশ্যই বাস্তবের সঙ্গে মিলবে।"[১] কোন একটা আশ্রয় বাক্য (premise) থেকে সিদ্ধান্ত টানা হয়, কিন্তু এটি নিছক সেটার পুনরাবৃত্তি নয়; এটা এমন নতুন কিছু সৃষ্টি করে, যা জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। অনুমানের কাঠামো এবং বিন্যাস ও তাদের নানারকম রূপকে অনুশীলন করে তর্কবিদ্যা।

সিদ্ধান্ত, প্রত্যয় এবং অনুমান পরস্পর-সংযুক্ত; একটি বদলালে, অন্যগুলোও অবশ্যই বদলাবে। এই পারস্পরিক নির্ভরতা প্রকাশ পায় চিন্তার প্রক্রিয়ায়, যার মধ্যে থাকে (১) বিষয়ের ধর্মগুলোর সংজ্ঞার্থ (সিদ্ধান্ত) (২) পূর্ব-জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত এবং সুবিন্যস্ত একত্রীকরণ, বৈজ্ঞানিক প্রত্যয় গঠন (৩) পূর্বয়িত্ত এক প্রস্থ-জ্ঞান থেকে আর একপ্রস্থ জ্ঞানে উত্তরণ (অনুমান)।

এই সমস্ত উপাদানই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে থাকে। এটা তুলনামূলকভাবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও যথেষ্ট ব্যাপক জ্ঞান-প্রস্থান। এর মধ্যে এক ধরনের ঘটনাপুঞ্জের

১. এফ. এঙ্গেলস, অ্যান্টিডুরিং, ৩৯৯ পৃঃ।

বর্ণনা ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সিদ্ধান্তগুলো তত্ত্বের সূত্র ও বিবরণ দেয়. প্রত্যয় হল এর পদ এবং নানারকম অনুমান সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জ্ঞানলাভের উপায়। তত্ত্বের কাজ শুধু জ্ঞানলব্ধ ফলাফলকে বিন্যস্ত করা নয় অধিকন্তু নতুন জ্ঞান লাভের পথের ইঙ্গিত দেওয়া।

কী ধরনের বিষয়কে তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত করে, তার বর্ণিত ঘটনাবলীর পরিধির ব্যাপকতা এবং তত্ত্বে ব্যবহৃত প্রমাণ-পদ্ধতির উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানের তত্ত্ব নানা ধরনের হতে পারে। একটা অস্বাভাবিক তত্ত্ব হল তথাকথিত "অতিতত্ত্ব" (metatheory) অর্থাৎ তত্ত্ব সম্বন্ধীয় তত্ত্ব। অতিতত্ত্ব ও অতিবিজ্ঞানের (metasciences) আবির্ভাব একটা নতুন ব্যাপার এবং বিশশতকীয় জ্ঞান-বিকাশের বৈশিষ্ট্যসূচক; এটা তত্ত্বের কাঠামো ও বিকাশধারা সম্বন্ধে আগ্রহের প্রমাণ। বিভিন্ন তত্ত্বের সমন্বয়-প্রক্রিয়া, তথাকথিত একীকরণের তত্ত্ব সৃষ্টি বর্তমানকালের বৈশিষ্ট্য। নানা বিষয়কে ব্যাখ্যা করার জন্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তত্ত্বের সংযুক্তির ফলে নানা সূত্রযুক্ত যে একটি নতুন তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে তা বিষয়গত সত্যের অভিমুখে জ্ঞানের অগ্রগতির প্রমাণ। বিখ্যাত জার্মান পদার্থবিদ ম্যাকস ভন লাউই এই বিষয় সম্পর্কে লিখেছেন "...পদার্থ বিজ্ঞানের ইতিহাস চিরদিনই নতুন নতুন উদাহরণ জুগিয়ে যাচ্ছে যে কেমন করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর দ্বারা বিকশিত দুটো সম্পূর্ণ নতুন তত্ত্ব—যথা আলোকবিদ্যা (optics), তাপগতিবিজ্ঞান (thermodynamics) অথবা এক্সরে তরঙ্গতত্ত্ব, কেলাসের পরমাণু তত্ত্ব (atomic theory of crystal)—অপ্রত্যাশিতভাবে মিলে যায় এবং অবাধে সংযুক্ত হয়। যিনিই তাঁর জীবদ্দশায় এই ধরণের বিস্ময়কর ঘটনার অভিজ্ঞতালাভ করতে অথবা অন্তত্তপক্ষে এই ধরনের ঘটনার কল্পনা করতে সমর্থ, তাঁর এই ব্যাপার সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকবে না যে, সমকেন্দ্রাভিমুখিতার তত্ত্বগুলোর মধ্যে যদি সবটা সত্য নাও থাকে, অন্ততপক্ষে মানুষের ইচ্ছায় যোগ করা নয় এমন বাস্তবের কোন একটা মূল অংশ এর মধ্যে আছে। অন্যথায় এই সব তত্ত্বের সংযুক্তিকে একটা অলৌকিক কাণ্ড বলে গণ্য করতে হবে...।"[১] এমনকি বিভিন্ন বিজ্ঞানের সৃষ্ট তত্ত্বও এখন সংযুক্ত হচ্ছে। অতিতত্ত্ব ও তত্ত্বের সংযুক্তি ও সংহতির সঙ্গে যুক্ত সমস্যাবলীর সমাধানের জন্যে যুক্তিশাস্ত্রের আরও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

৪ ডায়ালেকটিকস ও আকারগত তর্কবিদ্যা

তর্কবিদ্যা চিন্তার রূপ বা আকারের অনুশীলন করে। প্রচলিত মতে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এরিস্টটল। তিনি প্রথম সমস্যাগুলোকে একত্র ও সুবিন্যস্ত করেছিলেন, তা পরবর্তীকালে তর্কবিদ্যার সমস্যা বলে পরিচিত হয়। আধুনিক কালে তর্কবিদ্যার বিকাশে বিরাট অবদান ছিল ফ্রান্সিস বেকন ও অন্যান্যদের।

১ এম. লাউই, গেশিচটে ডার ফিজিক, ১৯৫০, এস. ১৪-১৫।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে, গতানুগতিক অথবা ক্ল্যাসিকাল, আকারগত তর্কবিদ্যা হিসেবে দর্শনের একটা শাখা গড়ে উঠেছে। এর নিয়মগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল অভেদত্ব, অবিরোধ, তদাত্মতা এবং যথেষ্ট প্রমাণের নিয়ম। এটি চিন্তার আকারকে সত্তার নীতি বলে গণ্য করত।

একদিকে, আকারগত তর্কবিদ্যাকে আরও বিকশিত করা হল যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণের (logical analysis) পদ্ধতিতে এবং অন্যদিকে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিকাশের দ্বারা নির্দেশিত নতুন ধরনের প্রমাণের অনুশীলনে। গাণিতিক চিহ্নের একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হল তর্কবিদ্যার সমস্যা সমাধানের জন্যে; গণিতে আকারগত তর্কবিদ্যার প্রয়োগ; বিশেষত প্রমাণের উদ্দেশ্যে তার ব্যবহার, আকারগত তর্কবিদ্যার বিকাশ ঘটাল। এইভাবেই **প্রতীকী বা গাণিতিক তর্কবিদ্যা** বলে পরিচিত নানাপ্রকারের আকারগত তর্কবিদ্যার সৃষ্টি হল। আজকাল এই ধরনের তর্কবিদ্যা প্রধানত ব্যবহার হচ্ছে সিন্থেটিক ও ফর্মালাইজড ভাষার বিশ্লেষণে; এটি সেগুলোর সিনট্যাকস বা বাক্য গঠনপ্রকৃতি এবং সেমানটিকস বা শব্দার্থ অনুশীলন করে। লজিক্যাল সিনট্যাকস শুধু আকার-গত দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষাতাত্ত্বিক প্রকাশভঙ্গির বিন্যাস এবং রূপান্তরের নিয়ম-গুলো সূত্রায়িত করে, তাদের আধেয়কে বিবেচনা করে না; তর্কশাস্ত্রীয় শব্দার্থ বিজ্ঞান (সেমানটিকস) ভাষাতাত্ত্বিক ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করে।

তাত্ত্বিকজ্ঞানের আকারগত তর্কবিদ্যাসম্মত বিশ্লেষণ বিরাট ফলপ্রসূ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সংশ্লেষণাত্মক, ফর্মালাইজড ভাষার ভিত্তিতে জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি ছাড়া সাইবারনেটিকস অসম্ভব হত। এই পদ্ধতি আমাদের বর্তমান জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করতে, সুবিধামত তার পুনর্বিন্যাস করতে, যতটা সম্ভব কঠোর ইঙ্গিতধর্মী কোন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকাশ করতে এবং মানবচিন্তার কিছু কাজকে যন্ত্রের উপর চালান করতে সাহায্য করে। আকারগত তর্কবিদ্যার দ্বারা জ্ঞানের বিশ্লেষণ নতুন জ্ঞানের উৎপত্তিতে নিয়ে যায়। এটা কতকগুলো হারানো সূত্র ও সংযোগকে চিনতে সাহায্য করে। এইসব সূত্র ও সংযোগের প্রয়োজন হয় কঠোর ফর্মালাইজড তত্ত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং এই তর্কবিদ্যা সেগুলোর সম্ভাব্য প্রাপ্তিস্থানের সন্ধান দেয়।

তর্কবিদ্যা শুধু আকারগত তর্কবিদ্যাকে স্বতন্ত্র বিজ্ঞানহিসেবে পৃথক করার মাধ্যমেই বিকশিত হয় নি। এই তর্কবিদ্যা পরে তার নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু ও অনুশীলনপদ্ধতি নিয়ে প্রতীকী তর্কবিদ্যায় পরিণত হয়েছে। দর্শনের চৌহদ্দির মধ্যেই তাত্ত্বিক চিন্তার রূপ ও পদ্ধতির অনুশীলন বিষয়গত সত্যে উপনীত হয়েছিল। এই ধারার বিকাশকে অব্যাহত রেখে বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস জ্ঞানতত্ত্ব হিসেবে ও **ডায়ালেকটিক তর্কবিদ্যা** হিসেবে গড়ে উঠেছে।

ডায়ালেকটিক তর্কবিদ্যা বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকসের বাইরে নেই বা থাকতেও পারে না, কারণ এটি সত্যের দিকে চিন্তার অগ্রগতির জন্যে বাহ্য জগতের

বিকাশের সবচেয়ে সাধারণ নিয়মের তাৎপর্যকে উদ্ঘাটিত করে। এটি তাই অনুসন্ধান করে জ্ঞানের আধেয় কতটা পর্যন্ত অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুর সঙ্গে, সত্যের বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ডায়ালেকটিক তর্কবিদ্যা গুণগতভাবে আকারগত তর্কবিদ্যা থেকে পৃথক। ডায়ালেকটিক তর্কবিদ্যা শুধু কাঠামো-গত দৃষ্টিকোণ থেকেই চিন্তার রূপকে বিবেচনা করে না, ঐ তর্কবিদ্যা যেসব মূর্ত আধেয় প্রকাশ করে তাকে অগ্রাহ্য করে না। এটি সেগুলোকে অনড়, বিচ্ছিন্ন আকার হিসেবে না দেখে তাদের আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে, গতির মধ্যে এবং বিকাশের মধ্যে ঐগুলোকে বিবেচনা করে। সেখানে আকার-গত তর্কবিদ্যা প্রধানত প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের বিশ্লেষণের উপর জোর দেয়, যেখানে ডায়ালেকটিক তর্কবিদ্যা নতুন জ্ঞানের উত্তরণের সূত্রগুলোকে উদ্ঘাটিত করে, তত্ত্বের গঠন ও বিকাশের অনুশীলন করে।

লেনিন ডায়ালেকটিক তর্কবিদ্যার দাবি এইভাবে সূত্রায়িত করেছেন (১) বিষয়ের সকল দিককে পরীক্ষা করা (২) "বিকাশের মধ্যে, স্বকীয় গতির মধ্যে" বিষয়কে পরীক্ষা···তৃতীয়ত, কোন বিষয়ের পূর্ণ "সংজ্ঞায়" অবশ্যই মানবজাতির সমগ্র অভিজ্ঞতাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে···চতুর্থত, ডায়ালেকটিক তর্কবিদ্যা মনে করে সত্য সমসময়েই মূর্ত, কখনই বিমূর্ত নয়··· ।"[১]

ডায়ালেকটিক তর্কবিদ্যা পূর্ববর্তী তর্কবিদ্যার তত্ত্বগত ধারাবাহিকতা ও বিকাশ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল ; এটা আকারগত তর্কবিদ্যার তাৎপর্যকে অস্বীকার করে না, বরং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অনুশীলনে এর সীমা নির্দেশ করে। চিন্তার রূপকে বোঝার জন্যে আকারগত তর্কবিদ্যা একটা শক্তিশালী উপায় এবং এর উদ্ভাবিত পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়। এইসঙ্গে জ্ঞান-প্রক্রিয়ার যে-কোন বিশেষ পদ্ধতির মতই এটি সীমাবদ্ধ, সুতরাং আকারগত তর্কবিদ্যাকে জ্ঞান-প্রক্রিয়ার একটা সাধারণ দার্শনিক পদ্ধতিতে পরিণত করা ভুল এবং তা নেতিবাচক ফলাফল সৃষ্টি করে।

৫ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের গঠন ও বিকাশ। স্বজ্ঞা

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের গতিশীলতাকে অনুশীলন করে, এর রূপ এবং নিয়মগুলোকে, বুনিয়াদী প্রত্যয় ও সূত্রগুলোকে বিশ্লিষ্ট করে—যার দ্বারা চিন্তা বস্তুনিষ্ঠ সত্যে পেঁছয়। বিজ্ঞানে বুনিয়াদী প্রত্যয় ও নীতিগুলো হল জনগণের সৃষ্টিশীল কাজকর্মের ফল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিশীলতা কী? বিজ্ঞানীদের সৃষ্টিশীল ক্রিয়াকাণ্ড কোন বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করে অথবা এটা কি চূড়ান্তভাবে স্বাধীন এবং তর্কবিদ্যার দাবি মুক্ত ? অবশ্য ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, সৃষ্টিশীলতা এমন অনেক উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত যা তর্কবিদ্যার পরিধির মধ্যে পড়ে না। কিন্তু মূলগতভাবে এটা

১ ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩২শ খণ্ড, ৯৪ পৃঃ।

মানব-যুক্তির ক্রিয়াশীলতার প্রতিনিধিত্ব করে অর্থাৎ এটা যৌক্তিক, তাই তর্ক-বিদ্যার বিশ্লেষণের অধীন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হয় একটি সমস্যার বিবরণ দিয়ে। সাধারণত সমস্যার ধারণাটির মধ্যে অজানা বিষয় থাকে। তাই আমরা এইভাবে সমস্যার একটা প্রাথমিক সংজ্ঞা দিতে পারি: যেটা মানুষের জানা নেই এবং যাকে জানা উচিত। কিছুটা অসম্পূর্ণ এই সংজ্ঞার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে—বাধ্যবাধকতার উপাদান, যা অনুসন্ধান প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করছে।

যাই হোক, এটা সহজেই বোঝা যায় যে, না জানার ক্ষেত্র ও জানার বাধ্য-বাধকতার মধ্যে খানিকটা দূরত্ব আছে। অনেক কিছুই আছে যা মানুষ জানে না এবং নীতিগতভাবে, এমন কিছুই নেই যা সে জানতে চাইবে না। তবে, আমাদের অবশ্যই নির্ণয় করতে হবে সে কী জানে না কিন্তু তার বিকাশের বর্তমান পর্যায়ে কী জানতে সক্ষম। এখানেই কিছুটা জ্ঞানের দরকার এবং তাই কোন সমস্যা--যদিও আপাতবিরোধী শোনাচ্ছে—নিছক অজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত নয়, বরং অজ্ঞতা সম্বন্ধে জ্ঞানের সঙ্গেই জড়িত।

সমস্যা দেখা দেয় মানুষের ব্যবহারিক কাজকর্মের প্রয়োজন থেকে, নতুন জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার আকারে। কোন সমস্যা উপস্থাপিত করার মত পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় ভিত্তি লাভের জন্যে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, মানবজাতির কল্যাণে সহস্র নতুন সূর্য প্রজ্জ্বলিত করার দুঃসাহসী স্বপ্ন এখন একটা বৈজ্ঞানিক সমস্যা, তাপপারমাণবিক প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

একটা সমস্যা উপস্থাপিত করতে আমাদের একটা প্রাথমিক জ্ঞান, এমনকি কীভাবে তার সমাধান হবে, সে সম্পর্কে একটা অসম্পূর্ণ জ্ঞানও প্রয়োজন। সমস্যার সঠিক বিবরণ, নতুন জ্ঞানের জন্যে বাস্তব প্রয়োজনীয়তার সংজ্ঞা, যা উপযুক্ত পরিস্থিতিতে পরিপূরণ করা সম্ভব—আমাদের নতুন জ্ঞান লাভের পথে অনেকখানি এগিয়ে দেয়।

কিন্তু সমস্যার বর্ণনায় এবং আরও বেশি করে, এর সমাধানে আমাদের তথ্য পাওয়া প্রয়োজন। "তথ্য" শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা পরিদৃশ্যমান ঘটনাকে (জিনিস, বাস্তব প্রক্রিয়া) বলি তথ্য, কতকগুলো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জ্ঞানকেও বলি তথ্য। এই মুহূর্তে আমরা তথ্য শব্দটির দ্বিতীয় অর্থ সম্পর্কে আগ্রহী। কোন্ জ্ঞানকে বলা যায় তথ্যভিত্তিক? প্রাথমিকভাবে সেই জ্ঞান, যা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ থেকে অর্থাৎ অভিজ্ঞতালব্ধ উপায়ে পাওয়া যায়। এটা অবশ্য তথ্যগত ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করে ফেলে। এর অর্থ তত্ত্বকে অবশ্যই সৃষ্টি করতে হবে অভিজ্ঞতালব্ধ উপাত্তের (data) ভিত্তিতে। কিন্তু তত্ত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই এগোতে হবে প্রামাণ্য জ্ঞান থেকে, তা সে অভিজ্ঞতালব্ধই হোক, অথবা অনুমানমূলকই (তাত্ত্বিকভাবে) হোক।

একটা সমস্যার বর্ণনা করতে, সমাধান দিতে ও রচিত প্রতিজ্ঞাটিকে (proposition) পরখ করতে আমাদের এমন জ্ঞান থাকা দরকার যার বিষয়গত সত্যতা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। এই প্রামাণ্য জ্ঞানই হল তথ্য—যার উপরই অনুসন্ধান-ধারার ভিত্তি। অভিজ্ঞতালব্ধ বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ফলাফল ও নিয়মগুলো যাদের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রয়োগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—এই উভয়কেই নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্য গড়ে ওঠে। প্রামাণিকতাই হল তথ্য হিসেবে জ্ঞানের অপরিহার্য গুণ। সেইজন্য তথ্যকে প্রায়ই বলা হয় কঠিন বস্তু; আমাদের পছন্দ হোক না হোক, সেগুলো আমাদের গবেষণার পক্ষে সুবিধাজনক হোক বা না হোক, ওগুলোকে নিতেই হবে। তথ্যের গুণ তার প্রামাণিকতা থেকে বেরিয়ে আসে। তথ্যের বৈশিষ্ট্য হল এর অপরিবর্তনীয়তা অর্থাৎ যে সুসম্বদ্ধ ব্যবস্থার এটি অংশ, তার থেকে এর আপেক্ষিক স্বাধীনতা। যাকে বিষয়গতভাবে সত্য বলে প্রমাণ করা গেছে তাই তথ্য এবং তাকে যে-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তই করা হোক না কেন, এটা থেকে যাবে। কোন প্রকল্প ও অনুমান ধসে পড়তে পারে এবং প্রয়োগের পরীক্ষায় নাও টিকতে পারে কিন্তু যে তথ্যের উপর ওগুলোর ভিত্তি সেগুলো থেকে যায় এবং এক ধরনের জ্ঞান থেকে অন্য জ্ঞান-প্রস্থানে সঞ্চারিত হয়।

তথ্য সংগ্রহ বৈজ্ঞানিক গবেষণার অপরিহার্য অংশ কিন্তু এর দ্বারাই সমস্যার সমাধান হয় না। আমাদের এমন একটা জ্ঞানতত্ত্ব অবশ্যই থাকতে হবে যা আমাদের আগ্রহ উদ্দীপক ঘটনা ও প্রক্রিয়াগুলোকে বর্ণনা করবে ও ব্যাখ্যা দেবে। এই ব্যবস্থাগুলোর বিভিন্ন পর্যায় থাকতে পারে যথা অনুমান (conjecture) প্রকল্প ও প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

অনুমান হল প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা (proposition), যাকে তখনও পুরোপুরি অনুসন্ধান করা হয় নি, এমন প্রতিজ্ঞা যার যৌক্তিক ও অভিজ্ঞতাজাত ভিত্তিকে ব্যাখ্যা করা হয় নি। উদাহরণস্বরূপ, রাদারফোর্ড ও সডির তেজস্ক্রিয়তাজাত ক্ষয় সম্বন্ধীয় প্রাথমিক ধারণা ছিল কেবলমাত্র একটা অনুমান যা পরবর্তী বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের পর্যায়ে বিকশিত করা হয়।

কিভাবে অনুমান করা হয়? কেন একটা বিশেষ ধারণাই বৈজ্ঞানিকরা করেন, অন্যটা করেন না। সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত এই প্রশ্নের উত্তর হল এই যে, কেউই স্বজ্ঞা প্রত্যয়টিকে অগ্রাহ্য করতে পারে না।

যে নতুন ভাব আমাদের পূর্বেকার ধারণাকে পরিবর্তিত করে, তা সাধারণত পূর্ববর্তী জ্ঞান থেকে কঠোর যৌক্তিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আসে না, অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের সরল সামান্যীকরণের মাধ্যমেও নয় বরং চিন্তার গতির মধ্যে এক ধরনের উল্লম্ফন হিসেবে আসে। এই ধরনের উল্লম্ফন চিন্তার প্রকৃতিগত আবেশের দ্বারা, ব্যবহারিক কাজকর্মের সঙ্গে এর তাৎক্ষণিক যোগাযোগের দ্বারা সৃষ্টি হয়। এটা

ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এবং কঠোর যৌক্তিক ধারায় যুক্তি প্রদর্শনের সীমার বাইরে নতুন ফলাফল অনুসন্ধান করতে চিন্তাকে অনুপ্রাণিত করে।

প্রগতিশীল পদার্থবিদ ও দার্শনিক মারিও বানজি লিখেছেন, "প্রত্যেক গণিতবিদ এবং প্রত্যেক প্রকৃতি বিজ্ঞানী স্বীকার করবেন যে কল্পনা ছাড়া, উদ্ভাবনশীলতা ছাড়া, প্রকল্প এবং পরিকল্পনার সামর্থ্য ছাড়া "যান্ত্রিক" কাজ অর্থাৎ যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং এলগরিথিমের গণনার প্রয়োগ ব্যতীত আর কিছুই করা চলে না। প্রকল্পের উদ্ভাবন, প্রযুক্তির কৌশল এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার নক্সা কল্পনামূলক কাজ অথবা তুলনামূলকভাবে বলা যায়, 'যান্ত্রিক' কাজের বিপরীত স্বজ্ঞামূলক কাজের সুস্পষ্ট নমুনা।"[১] কিন্তু একথা বলার অর্থ এই নয় যে, স্বজ্ঞা স্বাবলম্বী এবং শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়। এটি প্রথম ধাক্কা পায় বিষয়ের পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ ও তত্ত্বগত জ্ঞান থেকে। চিন্তাশীল ব্যক্তির সামর্থ্য এবং অভিজ্ঞতা, তার চিন্তার ধরনই বরং এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর স্বজ্ঞা তাঁর জীবনের নানা ঘটনায় প্রভাবিত হতে পারে এবং এইসব আকস্মিক উপাদানের প্রভাবকে, সেগুলোর দ্রুততা ও আকস্মিকতাকে কখনও কখনও "প্রেরণা" বলে মনে হয়।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাসে এমন সব ঘটনার কাহিনী আছে যেগুলোকে অপূর্ব স্বজ্ঞার স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টিকারী বলে মনে করা হয়। "নিউটনের আপেল", "মেণ্ডেলিয়েভের স্বপ্ন" ইত্যাদির কথা আমরা সবাই শুনেছি। এইসব ঘটনাকে অস্বীকার না করেও, আমাদের অবশ্যই এইসব স্বজ্ঞার ঘটনার বাইরে মানুষের চিন্তা-প্রয়াসকে, যে সমস্যাকে এ উপস্থাপিত করেছে তার সমাধানে চিন্তার নিরবচ্ছিন্ন কঠোর অন্বেষাকে দেখতে হবে। স্বজ্ঞায় সমগ্র মানবজাতির পূর্ববর্তী সামাজিক ও মননশীল বিকাশ ঘনীভূত রূপ পায়। এর মধ্যে কোন রহস্য নেই। এর প্রত্যক্ষতা আপেক্ষিক এবং স্বজ্ঞা হিসেবে উপস্থাপিত এর তাত্ত্বিক প্রতিজ্ঞা-গুলোকে যৌক্তিক প্রক্রিয়াতে পরখ করা হয়, যার ফলে প্রাথমিক অনুমানটিকে ভিত্তিহীন বলে বাতিল করা হয় অথবা বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকল্পের রূপ নেয়।

অনুমান থেকে প্রকল্পে উত্তরণ যুক্তির অনুসন্ধানে বাধ্য করে, এটা আইন-স্টাইনের ভাষায় "অলৌকিককে জানা যায় এমন কিছুতে" পরিবর্তিত করে। এইখানেই যুক্তি আত্মপ্রকাশ করে, যা ছাড়া স্বজ্ঞা থাকে শূন্যে। বর্তমান জ্ঞানকে একত্রিত করা হয় নতুন তথ্যের অনুসন্ধান বলে, যাতে অনুমান প্রকল্পে পরিণত হতে পারে। এঙ্গেলস জ্ঞান-প্রক্রিয়ায় প্রকল্পের ভূমিকা এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "একটা নতুন তথ্যের পর্যবেক্ষণ একই শ্রেণীর ঘটনার অন্তর্ভুক্ত তথ্যগুলোকে ব্যাখ্যার পূর্ববর্তী পদ্ধতিকে অসম্ভব করে তোলে। এই মুহূর্ত থেকেই প্রথমে সীমিতসংখ্যক তথ্য ও পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে ব্যাখ্যার

১ মারিও বানজি, ইনটুইশান এণ্ড সায়েন্স, প্রেন্টিস-হল, ইনক্, এঙ্গেলউড ক্লিফস, নিউইয়র্ক, ১৯৬২, ৮০ পৃঃ।

নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পরবর্তী পর্যবেক্ষণজাত উপাদান এইসব প্রকল্পের কতকগুলোকে বাতিল ও কতকগুলোকে সংশোধন করে বাকীগুলোকে উৎখাত করে—যে পর্যন্ত না বিশুদ্ধাকারে একটি নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়।"[১]

একটি প্রকল্প হল অনুমান-নির্ভর জ্ঞান। প্রকল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণের পূর্বশর্ত হল নতুন তথ্যের সন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষার নক্সা রচনা এবং পূর্বলব্ধ ফলাফলের বিশ্লেষণ। নানাভাবে "পরীক্ষিত" কিছু প্রকল্পকে কখনও কখনও উপস্থাপিত করা হয় একই প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে। সরলতা ও বিচক্ষণতার মত উপাদান যা—সবচেয়ে প্রামাণ্য তত্ত্বগত ব্যবস্থা নির্ধারণ করার অতিরিক্ত উপায় হিসেবে সহায়ক, তা প্রকল্প বাছাই করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবতাকে প্রতিবিম্বিত করা ও তার আন্তঃসম্পর্কের সমস্ত বৈচিত্র্যের সমস্যা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে চিন্তাকে সবচেয়ে যুক্তিসম্মত, প্রাঞ্জল ও সরল পথে অগ্রসর হতে হবে। যেখানে সবকিছু সমান, সেখানে সেই প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দিতে হবে যা স্পষ্টরূপে, সরলভাবে এবং সংক্ষিপ্ত উপায়ে লক্ষ্যপূরণ করবে। কিন্তু বিচক্ষণতা ও সরলতা, সমমূল্যসম্পন্ন প্রকল্পের মধ্যে আমাদের বেছে নেওয়ার ব্যাপারেই সহায়ক মাত্র, ওগুলো কোন প্রকল্পের সত্যতা যাচাইয়ের মানদণ্ড নয়। এটার একটি মাত্র মানদণ্ড হল নানা বৈচিত্র্যমণ্ডিত প্রয়োগ। প্রকল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ তত্ত্বে পরিণত হয়।

তত্ত্বও একটা চূড়ান্ত কিছু নয়, এটি আপেক্ষিকভাবে একটি সম্পূর্ণ জ্ঞানতত্ত্ব, এ তার বিকাশধারার মধ্যে দিয়ে পরিবর্তিত হয়। একটি তথ্যের সঙ্গে নতুন তথ্য ও প্রত্যয় যুক্ত হয়ে, এবং তার সূত্রগুলো পরীক্ষিত হয়ে তত্ত্বটি পরিবর্তিত হয়। কিন্তু এমন একটা সময় আসে যখন একটা দ্বন্দ্ব আবিষ্কৃত হয়, যাকে প্রচলিত সূত্রের কাঠামোর মধ্যে সমাধান করা যায় না। মূর্ত বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়েই সন্ধিক্ষণটিব সন্ধান পাওয়া সম্ভব। এই সন্ধিক্ষণটির আবির্ভাব, ভিন্ন বা আরও যথাযথ সূত্রযুক্ত নতুন তত্ত্বের উত্তরণ সূচিত করে।

নতুন এবং পুরাতন তত্ত্বের মধ্যে একটি জটিল সম্পর্ক বর্তমান, যার একটি প্রকাশ পায় **অনুরূপতার সূত্রের** মধ্যে। এই সূত্র অনুসারে, একটা নতুন তত্ত্ব তখনই দাঁড়াতে পারে, যখন আগেকার তত্ত্বগুলো খুব কম ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়। যেমন, সাবেকী পদার্থবিদ্যা এখনকার আধুনিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে বিরল ও বিশেষ তত্ত্ব। এই সূত্রে জ্ঞানের ধারাবাহিকতা ও বিকাশ উভয়ই যুগপৎ প্রকাশ পায়। যদি কোন তত্ত্বের বিষয়গত সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে এই তত্ত্ব কোন চিহ্ন না রেখে মিলিয়ে যাবে না এবং পরবর্তী তত্ত্বটি কেবল এর প্রয়োগ-ক্ষেত্রটিকে সঙ্কুচিত করবে। পুরনো তত্ত্ব থেকে নতুন তত্ত্বে উত্তরণের সূত্রগুলোকে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব। একটা তত্ত্বকে আর একটা ব্যাপক সাধারণ তত্ত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি এর প্রামাণিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে সহায়ক হয়।

১ এফ. এঙ্গেলস, ডায়ালেকটিকস অব নেচার, ২৪০ পৃঃ।

৬ জ্ঞানের বাস্তব রূপায়ণ

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, মানুষের ব্যবহারিক কাজের ভিত্তিতে জ্ঞান সৃষ্টি ও বিকশিত হয় এবং জ্ঞান যতটা মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু ও প্রক্রিয়ার ছক নির্মাণ করতে পরে, ততটাই সে ব্যবহারিক কর্মের পক্ষে সহায়ক হয়। সুতরাং জ্ঞানকে কোন না কোনভাবে বাস্তবায়িত হতে হবে। কিন্তু এর জন্যে একে সেইভাবে রূপ দিতে হবে, আর এই জনো তার ভাব রূপ পাওয়া যাই।

দার্শনিক সাহিত্যে "ভাব" শব্দটিকে প্রায়ই যে কোন চিন্তা হিসেবে, জ্ঞানের যে কোন রূপ-প্রত্যয়, সিদ্ধান্ত, তত্ত্ব ইত্যাদি হিসাবে ব্যাপকার্থে ব্যবহার করা হয়। তবে, শব্দটির আর একটি যথাযথ অর্থ রয়েছে। ভাব এমন একটি চিন্তা যা উন্নতমানের বস্তুনিষ্ঠতা, সমগ্রতা ও নির্ভুলতা লাভ করে এবং সেই সঙ্গে তার একটা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য থাকে। তাই, বাস্তবায়িত হওয়ার জন্যে জ্ঞানকে এমন একটা ভাব হতে হবে যার মধ্যে তিনটি উপাদানের সমন্বয় ঘটবে: (১) বিষয়ের মূর্ত ও সন্নিবদ্ধ জ্ঞান, (২) এটিকে বাস্তবে রূপায়িত করার আকাঙ্ক্ষা এবং এর বাস্তব রূপ লাভ এবং (৩) কার্যের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী, বিষয়কে পরিবর্তিত করার জন্যে প্রযোজকের পরিকল্পনা। বিজ্ঞানের ধারণাগুলো এইরকম, যার মাধ্যমে উৎপাদন পুনর্গঠিত হয় এবং সমাজে গভীর পরিবর্তন ঘটে। এই অর্থেই আমরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাবধারা, মহাকাশ অনুসন্ধানের ভাবধারা এবং পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার ইত্যাদির ভাবধারার কথা বলি।

মানুষ ভাবগুলোকে শুধু বাস্তব সাজসরঞ্জামের দ্বারাই (যন্ত্রপাতি, শ্রমের হাতিয়ার) বাস্তবায়িত করে না, অধিকন্তু আত্মিক শক্তির (ইচ্ছা, ভাবাবেগ ইত্যাদি) দ্বারাও বাস্তবায়িত করে। লেনিন বলেছেন, "…জগৎ মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারে না এবং মানুষ তার কাজের দ্বারা তাকে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত করে।"[১] মানুষের এই সংকল্প জ্ঞানভিত্তিক, তার বুদ্ধি ও চিন্তার কাছ থেকে সে এটা লাভ করেছে। কিন্তু মানুষের চিন্তাকে জগৎকে পরিবর্তন করার সংকল্পের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ভাব অনুসারে কাজ করার সংকল্প সুপরিণত হওয়া চাই এবং প্রক্রিয়ায় অনেকটাই নির্ভর করে ভাবের সত্যতা সম্পর্কে ব্যক্তির বিশ্বাসের উপর, এটি অনুসারে কাজ করার প্রয়োজনীয়তার উপর, এটাও বাস্তবে পরিণত হওয়ার প্রকৃত সম্ভাবনার উপর।

জ্ঞানের ভিত্তিতে একজনের কর্মের সঠিকতায় **বিশ্বাস** বা সচেতন আস্থাকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী জ্ঞানতত্ত্ব বাতিল করে না। মার্কসবাদী জ্ঞানের বিকল্প হিসেবে আস্থা বা অভ্যাসকে গ্রহণ করার বিরোধী, মার্কসবাদ অন্ধ বিশ্বাসের বিরোধী। ধর্মভিত্তিক বিচারবুদ্ধিহীন মতবাদের উপর অন্ধ আস্থা এবং

১. ভি. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩৮শ খণ্ড, ২৯৩ পৃঃ।

বিষয়গত বাস্তবতাভিত্তিক জ্ঞান—এই দুটির মধ্যে মার্কসবাদ কঠোর সীমারেখা টানে। যে-ব্যক্তি কোন ভাবধারার সত্যতায় আস্থাশীল না হয়ে ভাবকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চায়, সে এর সাফল্যের জন্যে প্রয়োজনীয় সংকল্প, উদ্দেশ্য ও আবেগাত্মক উদ্যোগ থেকে বঞ্চিত হয়। মানুষের উদ্দীপনা ছাড়া, মানুষের যুক্তি তার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে পুরোপুরি প্রভাবান্বিত হওয়া ছাড়া কোন চমৎকার ভাব সৃষ্টি হতে পারে না, কোন চমৎকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে পারে না। বর্তমান বাস্তবতাকে পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্যে সংকল্পবদ্ধ হতে হলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মানুষের দৃঢ় ব্যক্তিগত বিশ্বাসে পরিণত হওয়া চাই।

ভাবগুলোর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, সেগুলোর বাস্তব জগতে রূপান্তরের যে-কর্তব্যভার মানুষের সামনে আসে, দর্শনে তাকে বলা হয় **"বস্তুরূপ গঠন"** (objectification)। মনুষ্য জগৎকে সমৃদ্ধ করার জন্যে, ভাবগুলোকে রূপায়িত করতে হবে, সেগুলোকে আবশ্যই বাস্তব রূপ দিতে হবে।

বস্তুরূপ গঠনের দুটি দিক আছে: (১) সামাজিক ও (২) জ্ঞানতত্ত্বগত। বস্তুরূপ গঠনের সামাজিক দিকটি, মানুষের শ্রম-জাত বিষয় ও মানুষের নিজের মধ্যেকার সম্পর্ককে খুঁজে বের করবার সঙ্গে জড়িত।[১] জ্ঞানতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুরূপ গঠনকে বিচার করার সময় আমাদের এই প্রশ্ন তুলতেই হবে যে, ব্যবহারিক প্রয়োগে লব্ধ বিষয়টির সঙ্গে রূপায়ণযোগ্য ভাবটি সঙ্গতিপূর্ণ কিনা? যখন আমরা কোন ভাবকে বিস্তারিত করি, তখন আমরা বিষয়গত সত্যের প্রশ্নটির সমাধান করি এবং যা কিছু এর মধ্যে প্রতারণাপূর্ণ ও অলীক, তা বর্জন করি। এই প্রক্রিয়ায় ভাব ও তার বাস্তবায়নের মধ্যে কিছু অসঙ্গতি প্রকাশ পায়। এটা সৃষ্টি হয় ভাবের অসম্পূর্ণতার জন্যে, এটি বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকার জন্যে অথবা বাস্তবতার মধ্যে ভাবের সম্পূর্ণ রূপায়ণের উপযোগী প্রয়োজনীয় উপাদান, আত্মিক উপকরণ ও পরিস্থিতির অভাব থাকার জন্যে। তাই বস্তুরূপ গঠন গবেষণার পরিধিকে সংক্ষেপিত করে এবং একটা নতুন কিছুকে প্রকাশ করে।

শেষ পর্যন্ত প্রয়োগলব্ধ বিষয়টিকে মানুষের যৌক্তিক লক্ষ্যের সঙ্গে সাদৃশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়।

একদিকে, যেহেতু বাস্তব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে প্রয়োগ মানুষের লক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল এবং তার ভাবের মধ্যে প্রকাশিত, অন্যদিকে নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োগ সেগুলোকে ছাড়িয়ে যায়, তাই প্রয়োগ সব সময়ই যুক্তি-সম্মত ও অযৌক্তিক উভয়ই।

১. উদাহরণস্বরূপ, কতকগুলি সামাজিক অবস্থায় মানুষের কাজকর্মের ফল মানুষের বিরুদ্ধে স্বাধীন সামাজিক শক্তি হয়ে ওঠে এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কগুলি বস্তুরূপ (reified) ধারণ করে, যেমন পণ্য বিনিময়। এই ধরণের বস্তুরূপগঠন দর্শনে বিচ্ছিন্নতা বলে পরিচিত। এটা পরের অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

যে অযৌক্তিকতাবাদ আমাদের জীবনের অযৌক্তিকতাকে চূড়ান্ত করে তোলে তাকে যৌক্তিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, একে সমস্ত বিকাশের প্রধান ঝোঁক হিসেবে বিবেচনা করে, এর বিপরীতে ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ অযৌক্তিকতাকে যৌক্তিকতার বিপরীত হিসেবে এবং প্রায়ই যৌক্তিকতার সহযোগী উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে। চিরন্তন কোন অযৌক্তিকতা নেই, কিন্তু এক ধরনের ঐতিহাসিক অবস্থার মধ্যে একটা কিছু অযৌক্তিক থাকে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যখন একটি নদীর উপর জলবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করি তখন আমরা সস্তায় বিদ্যুৎ পাওয়ার মত একটা যৌক্তিক কিছু সৃষ্টি করি—কিন্তু আমরা সেখানে পাই অব্যবহার্য জলাভূমি। কিন্তু আমাদের কাজের সহযোগী ও অচিন্তিতপূর্ব ফল হিসেবে অযৌক্তিকতা চিরদিন থাকে না, পরবর্তী জ্ঞান ও প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে একে আয়ত্তে আনা যায়।

জ্ঞানকে মানব-কর্মের একটি উপাদান হিসেবেও যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিক-কতার প্রত্যয়ের মধ্যে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। জ্ঞান স্বভাবতঃই যৌক্তিক। কারণ এ মানুষের লক্ষ্য ও প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবের সৃষ্টি করে, কারণ এটি যুক্তিশাস্ত্রের সঙ্গে—যুক্তির কতকগুলি প্রতিষ্ঠিত রূপের সঙ্গে মেলে। এইসঙ্গে জ্ঞান প্রায়ই এইসব রূপের কাঠামো অতিক্রম করে যায় এবং এসব রূপের দ্বারা তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না অর্থাৎ জ্ঞানের মধ্যে এমন উপাদান আছে যাকে আয়ত্ত করতে হয় যুক্তিশাস্ত্রকেই পরিবর্তন করে, এর ভাণ্ডারকে চিন্তার নতুন রূপ ও মূল প্রত্যয়গুলোর দ্বারা সমৃদ্ধ করে। যুক্তির প্রচলিত রূপের দ্বারা জ্ঞানের যে-অংশটুকুকে ব্যাখ্যা করা যায় নি, অযৌক্তিকতাবাদ তার উপরই মনোযোগ দেয়, তাকেই সত্যিকারের মর্ম বলে মনে করে এবং এই ভাবেই জ্ঞানের গতিধারা সম্বন্ধে একটা বিকৃত ধারণার সৃষ্টি করে।

জ্ঞান-বিকাশের প্রধান ধারা হিসেবে যৌক্তিকতা দ্বৈতরূপে বর্তমান: **যুক্তি-প্রয়োগ-প্রকরণ** (ratiocinat on) ও খোদ **যুক্তি**। যুক্তি-প্রয়োগ-প্রকরণের অর্থ হল, পদ্ধতি, তার সীমা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন না থেকে চিন্তার রূপ নিয়ে কাজ করা এবং উপস্থাপিত কর্মসূচী বা নক্সা অনুসারে বিমূর্তন করা। যুক্তি-প্রয়োগ-প্রকরণ সমগ্রতাকে, একককে পরস্পরের বিপরীতে বিভক্ত করে, কিন্তু তাদের পরস্পরের অনুপ্রবেশের ঐক্যকে গ্রহণ করতে পারে না। যুক্তি প্রয়োগ-প্রকরণের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে ভাল দেখতে পাওয়া যায় এলগরিথিম-এ যথাযথ প্রকৃতির নানারকম গণনা করবার জন্যে নিয়মাবলীর মধ্যে, যেখানে প্রত্যেকটি স্তর পরবর্তীটিকে নির্ধারিত করে। এখানে সমস্ত প্রক্রিয়াটি পৃথক স্তরে আলাদা হয়ে যায় এবং সেগুলোকে নিয়ে কাজ করবার জন্যে অনেকগুলো সংযুক্ত সাংকেতিক চিহ্নের রূপে নির্দেশ দেওয়া হয়। এর অর্থ এলগরিথিমিক ক্রিয়া একটি যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন করা যায়। তত্ত্বগত চিন্তায় যুক্তি-প্রয়োগ-প্রকরণ অপরিহার্য; এটা ছাড়া চিন্তা হয় অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট।

এ চিন্তাকে সন্নিবন্ধ ও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, তত্ত্বকে ছকবাঁধা ব্যবস্থায় পরিণত করতে চায়। কিন্তু এই যুক্তি-প্রকরণই মানব চিন্তার বৈশিষ্ট্য নয়। এটি খোদ যুক্তির দ্বারাই প্রকাশ পায়।

যুক্তি-প্রয়োগ-প্রকরণ থেকে পৃথকভাবে যুক্তি প্রত্যয়গুলোর আধেয় ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সেগুলোকে ব্যবহার করে এবং এদের সাহায্যে বস্তু ও প্রক্রিয়াগুলো একটা উদ্দেশ্যমূলক ও সক্রিয় সৃজনশীলভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। যুক্তি রূপান্তর সাধনের ও এমন একটা জগৎ সৃষ্টি করার হাতিয়ার, যা মানুষের প্রয়োজন ও সারসত্তার চাহিদা মেটায়। মানুষের যুক্তি ইতিপূর্বে রচিত জ্ঞানরাজ্যের সীমার বাইরে যেতে উৎসুক—একটা নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টিতে আগ্রহী, যার মধ্যে মানুষের গন্তব্যস্থল আরও পূর্ণতা ও বস্তুনিষ্ঠতায় উদ্ভাসিত হবে। যুক্তি-প্রয়োগ-প্রকরণের বৈশিষ্ট্য হল বিশ্লেষণ, আর যুক্তির বৈশিষ্ট্য হ'ল সংশ্লেষণ। এখানে মানুষের সৃষ্টিশীলতা আরও উচ্চতর সোপানে উত্তীর্ণ। মানব-জ্ঞান যুক্তি-প্রয়োগ-প্রকরণ ও যুক্তির মিলনস্থল: এই শীর্ষদেশ থেকে বিষয়গত বাস্তবতা পরিজ্ঞাত হয় এবং এর যুক্তিসিদ্ধ রূপান্তরের পথ নির্ধারিত হয়।

৭. জ্ঞান ও মূল্য

ভাবের বাস্তবায়ন ঘটে বৈষয়িক ও আত্মিক সংস্কৃতিতে, বিভিন্ন বিষয়ে শিল্পকলা সৃষ্টিতে, নৈতিক মান ইত্যাদির ক্ষেত্রে। সুতরাং ভাবধারা কীভাবে মানুষের সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত? মার্কস মন্তব্য করেছিলেন যে, মানুষ বাহ্য প্রকৃতির বিষয়গুলোর সঙ্গে বিশুদ্ধ একটা তাত্ত্বিক সম্পর্ক নিয়ে কিছু শুরু করে না, বরং সেগুলোকে সক্রিয়ভাবে আয়ত্ত করা থেকেই সব কিছু শুরু করে। মানুষ "এই সকল বিষয়কে একটা বিশেষ (generic) নাম দেয়, কারণ তাদের প্রয়োজনকে সন্তোষজনকভাবে মেটাবার ক্ষেত্রে এই সকল বিষয়ের শক্তির কথা তারা জানে…তারা এই সকল বিষয়কে 'জিনিসপত্র' বা অন্য কোন নাম দেয়, যার অর্থ এই যে তারা এই বস্তুগুলোকে বাস্তবে ব্যবহার করছে, এগুলো তাদের প্রয়োজনীয়।"[১]

বাহ্য জগতের বিষয়গুলোর সঙ্গে ভাবের এই সম্পর্ক উপলব্ধির মধ্যে থেকে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর উপায় হিসেবে মূল্যের দার্শনিক সমস্যা উদ্ভূত হয়েছিল। বিষয়টা এই নয় যে মানুষ যেসব বাস্তব বা আত্মিক বিষয় সৃষ্টি করে এবং যেসব প্রাকৃতিক উপাদান তার চাহিদা মেটায়—এদের কোন নামকরণ করা হবে কিনা, তাদের 'জিনিসপত্র', 'মূল্য' বলা হবে কিনা, অথবা অন্য কোন নামে বা অন্যভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে কিনা। আসল প্রশ্নটা হল

---

১ মার্কস এঙ্গেলস, ওয়েৰ্কে, ১৯শ খণ্ড, ৩৬৩ পৃঃ।

মূল্যের প্রকৃতি, বিষয় ও বিষয়ীর সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে এর সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে। মানুষ ইতিহাস ও নিজের স্রষ্টা—এই উপলব্ধির উপর দাঁড়িয়ে এবং তার সক্রিয় স্বরূপের উপর বিশ্বাস রেখে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মূল্যের প্রকৃতির সমাধান করে।

প্রাকৃতিক বস্তু, আমাদের বাস্তব ও আত্মিক সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর ক্ষমতা রয়েছে মানুষের প্রয়োজন মেটানোর, তার লক্ষ্য পূরণ করার। তাই মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের বিচার করতে হবে। কীভাবে ঐ উপাদান-গুলো এই ক্ষমতা লাভ করে? এগুলো কি প্রকৃতি বা মানুষের কাছ থেকে আসে, তার বিশেষ ক্ষমতা ও সামর্থ্য থেকে নির্গত হয়? যদি আমরা বলি মূল্য শুধু খোদ বিষয়ের মধ্যেই থাকে, তাহলে আমরা ওগুলোকে মানুষের প্রয়োজন ও লক্ষ্য পূরণের মত সহজাত গুণের অধিকারী বলে মনে করব। কিন্তু আমরা জানি, প্রকৃতি ও তার উপাদানসমূহ মানুষের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই বর্তমান ছিল। অন্যদিকে, আমরা সোজাসুজি বলতে পারি না যে সহজাত স্বভাব ব্যতিরেকেই একটি বিষয় মানুষের বাস্তব এবং আত্মিক প্রয়োজন মেটাতে পারে। যদি শস্যের মধ্যে কোন প্রয়োজনীয় পদার্থ না থাকত, তাহলে এটা খাদ্যই হত না, মানুষের কাছে কোন কাজেই আসত না।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন মূল্যকে একটা সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিষয় হিসেবে, বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার একটি উপাদান হিসাবে গণ্য করে। সামাজিক জগৎ বস্তুগত ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার একটা বাহ্যিক কোন কিছু নয়। মানুষের শ্রমের ফল প্রকৃতিরই অনুসরণ-ধারা। তাই মূল্য হ'ল বিষয়ের ধর্ম যা সমাজ-বিকাশের প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় এবং এই ধারায় এটি প্রকৃতির বিষয়গুলোর ধর্মও বটে, যা প্রাত্যহিক জীবনের শ্রম-প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং "মানব জগতের জীবন-উপাদান।"[১]

আধুনিক বুর্জোয়া দর্শনের কয়েকটি সম্প্রদায় বিষয় ও প্রক্রিয়াগুলোর মূল্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিকে তাদের বস্তুনিষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান থেকে বিচ্ছিন্ন করে। ঘটনার দিক থেকে জ্ঞান-প্রক্রিয়া এবং মূল্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, উভয়েই যেহেতু মানুষের কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক, তাই ওগুলো অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। একদিকে জ্ঞানের প্রকৃত ফলাফলকে কেবলমাত্র তাদের জ্ঞানতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যের (সত্য বা মিথ্যা, সারাত্মক বা অসারাত্মক, সম্ভাব্য, প্রামাণ্য) দিক থেকে মূল্যায়ন করলেই হবে না অধিকন্তু করতে হবে মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকেও (জ্ঞানটি সমাজের জন্যে কী প্রয়োজনে, কোন বাস্তব প্রয়োগে লাগবে—মানুষের কোন বাস্তব ও আত্মিক প্রয়োজন মেটাবে)। অন্যদিকে, মূল্যভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির একটা বিষয়গত উৎস আছে। এর পূর্বশর্ত হল বস্তু ও প্রক্রিয়াগুলোর, তাদের ধর্ম ও নিয়মগুলোর সম্বন্ধে জ্ঞান, যার

১ কার্ল মার্কস, ইকনমিক অ্যাণ্ড ফিলসফিক ম্যানাসক্রিপ্টস অব ১৮৪৪, ১০৪ পৃঃ।

ভিত্তিতে কেউ মানুষের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে কোন একটি বস্তুর সামর্থ্যকে বিচার করতে পারে।

বাস্তবতার বিষয়গুলোর প্রতি এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গিকে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ লক্ষ্যের জন্যে কেবলমাত্র বিমূর্তনের দ্বারা বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমটি আমাদের ও সাধারণভাবে মানব জাতির বাইরে অবস্থিত বিষয়ের জ্ঞানকে তালিকাবদ্ধ করতে চায়, চেতনাকে বিষয়-বিষয়ীর সম্পর্ক থেকে মুক্ত করতে চায় এবং জ্ঞানের অর্থাৎ বিষয়গত সত্যের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ণয় করতে চায়। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, বিপরীতভাবে মানব-সম্পর্কের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার জন্যে বিষয়টি এবং তার প্রতিবিম্ব উভয়কে বিবেচনা করতে সচেষ্ট হয় এবং মানুষের প্রয়োজন বিষয়টির অন্তর্নিহিত ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছুর মূল্যায়ন করতে চায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞানকে বিশুদ্ধ আকারে গ্রহণ না করে মানুষ ও তার লক্ষ্যের উপযোগী বৈষয়িক ও আত্মিক সংস্কৃতির জ্ঞান-রূপকেই গ্রহণ করে। যেমন, নৈতিক বা শিল্প-চেতনায় মূল্য-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি একটা বিরাট ভূমিকা পালন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বাস্তব জগৎ সম্পর্কে উপরোক্ত চেতনার বিশেষ দৃষ্টিকোণ অনেকখানি প্রকাশ পায়।

এই সঙ্গে মানুষের বাস্তব ক্রিয়াকাণ্ডে, বস্তুনিষ্ঠ ও আত্মিক, এই দুই দৃষ্টিকোণই (বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ এবং মূল্যভিত্তিক দৃষ্টিকোণ) মিলিত হয় এবং একটি ছাড়া অপরটি থাকতে পারে না : তারা বিষয়গত বাস্তবতার সঙ্গে মানুষের বাস্তব সম্পর্কের অভিন্ন ভিত্তিভূমি থেকে উৎসারিত।

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস তাই একটি গভীর ও সামগ্রিক দার্শনিক জ্ঞানতত্ত্ব। এটা জ্ঞানের উৎপত্তির একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়, বিষয়গত, মূর্ত, সত্যাভিমুখী গতির নিয়মগুলোকে উদ্ঘাটিত করে। এই ডায়ালেকটিকস-এর নিকট থেকে আমরা সত্য-জ্ঞানের মানদণ্ড পাই এবং কিভাবে এর বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব, তা দেখিয়ে দেয়।

———

নবম অধ্যায়

বৈজ্ঞানিক গবেষণার পদ্ধতি ও উপায়

আমরা দেখেছি, যে প্রক্রিয়ার দ্বারা মানবজাতি জ্ঞান আহরণ করে তা জটিল বৈপরীত্যপূর্ণ ও ডায়ালেকটিক প্রকৃতির ; এটা মানব চিন্তার বহুবিচিত্র গতির রূপ নেয়। বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস আমাদের জ্ঞান-প্রক্রিয়ার এই সব বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে, বাস্তবতার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাধারণ পদ্ধতিগত নীতি-গুলোকে সূত্রায়িত করে। এই সঙ্গে, বহুবিষয়ের প্রকৃত অনুশীলনের (বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ধারা) জন্যে জ্ঞানার্জনের আরও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির প্রয়োজন হয়।

১ গবেষণার পদ্ধতিগত ধারণা

যে গতানুগতিক জ্ঞান আমাদের প্রাত্যহিক ব্যাপারে পরিচালিত করার পক্ষে যথেষ্ট, বিজ্ঞান তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞান এবং দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাবলীর সমাধানে যে উপায়গুলো আমরা কাজে লাগাই—এই দুয়ের মধ্যে কোন অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান নেই। বিজ্ঞানে আমরা সকলের ব্যবহৃত পদ্ধতির উন্নত সংস্করণকে ব্যবহার করি। যে কোন জ্ঞান প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, বিমূর্তন ও মূর্তকরণ ইত্যাদি প্রাথমিক পদ্ধতির রূপে উপস্থিত করা যায়—এগুলো এই অর্থে প্রাথমিক যে ওগুলোর আর শ্রেণী-বিভাগ সম্ভব নয়।

অনুসন্ধানের সরলতম পদ্ধতি হল **ভাবমূর্তি নির্মাণ** (idealisation)। আমাদের চারদিকের বস্তুগুলো বিভিন্ন রকম গুণসম্পন্ন এবং যে সব নিয়ম তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে তা সেগুলোকে সম্পূর্ণভাবে জানার পক্ষে সাধারণতঃ খুবই জটিল। সুতরাং প্রকৃত বস্তুটিকে জানার কাজটি সহজ করতে আমরা প্রায়ই প্রকৃত বস্তুটির বদলে তার একটা ভাবমূর্তি নির্মাণ করি, যাতে কিছু নিয়মকে সরলরূপে প্রয়োগ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, পদার্থবিদ্যায় বৈজ্ঞানিকেরা আদর্শ গ্যাস, সম্পূর্ণ ঘনবস্তু অথবা সম্পূর্ণ কালো বস্তু ব্যবহার করে থাকেন।

প্রকৃত গ্যাসের মত না হয়ে আদর্শ বা নিখুঁত গ্যাসের থাকতে হবে নমনীয় অণু, কারণ প্রকৃত অণুর দ্বারা অধিকৃত আয়তনকে তুচ্ছ বা শূন্য বলে গণ্য করা হয়। নিখুঁত গ্যাসে বয়েল-মারিয়োত্তির সূত্র কঠোরভাবে অনুসৃত হয় ; এই সূত্রানুযায়ী গ্যাসের আয়তন তার ভরের উপর প্রদত্ত চাপের বিপরীত অনুপাতে পরিবর্তিত হয়। একটি নিখুঁত কালো বস্তু তার উপরে পড়া সমস্ত আলোকে শোষণ করে ; কোন নিখুঁত বস্তু বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত হলে তার সঠিক আকার ফিরে পায়। সাধারণ বস্তুর এসব ধর্ম নেই।

জ্যামিতি শাস্ত্রে ব্যবহৃত সরলরেখা, বর্গক্ষেত্র, বৃত্ত ইত্যাদিকে ভাবমূর্তি বলে গণ্য করা যেতে পারে।

ভাবমূর্তি নির্মাণকে গবেষণার প্রাথমিক পদ্ধতি—বিমূর্তন ও সংশ্লেষণের সংযুক্তি বলে মনে করা হয়। একদিকে ভাবমূর্তি নির্মাণের প্রক্রিয়ায় আমরা অনুসন্ধানের বিষয়ে কতকগুলো ধর্মকে অগ্রাহ্য করি এবং অন্যদিকে আমরা এমন সব ধর্মকে এর সঙ্গে যুক্ত করি যা প্রকৃত বিষয়ে নেই।

কিন্তু, ভাবরূপ নির্মাণের প্রকৃত মূল্য থাকে তখনই, যখন ভাবায়িত বিষয়টি প্রকৃত বিষয়ের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য যুক্ত হয়। এর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নিয়মগলোকে তখন বাস্তব বিষয়ের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করা যায় এবং আমরা বাস্তবতার একটা তুলনামূলক নিখুঁত চিত্র পাই। বহুক্ষেত্রেই এই প্রায় যথাযথ চিত্রটি ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ উপযোগী। উদাহরণস্বরূপ, একটা টেবিলের ক্ষেত্র নির্ধারণ করার জন্যে আমরা আয়তক্ষেত্রের এলাকা সম্বন্ধীয় সূত্রকে ব্যবহার করতে পারি। যদিও তথ্যের দিক থেকে টেবিলটি নিখুঁত আয়তক্ষেত্রের নয়।

বাহ্যজগতের বিষয় ও ঘটনাবলীর সঙ্গে ভাবগত বিষয়, গাণিতিক বিষয়ের (যা গাণিতিক সূত্র অনুযায়ী চলে) তুলনামূলক বিচারের উপরই গণিতশাস্ত্রের ব্যবহার নির্ভরশীল। গণিতের রাজ্যে "ইন্টিগ্রাল" বা পূর্ণসংখ্যা বলে কোন জিনিস নেই, কিন্তু এই প্রত্যয়টিকে ব্যবহার করে গণিতজ্ঞরা এক ধরণের ভাবগত বিষয় গড়ে তোলেন। আজকাল গাণিতিক পদ্ধতির আরও ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। এগুলো ইতিমধ্যে তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যায় প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এখন যতই আমরা জীববিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা ও ভাষাতত্ত্বের মত অগাণিতিক ঐতিহ্যানুসারী বিজ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করছি, ততই সুনির্দিষ্টভাবে গণিতের প্রভাব বাড়ছে।

এখনকার দিনে এটা বলা অসম্ভব হয়ে উঠেছে যে, গণিতের ব্যবহার কেবল পরিমাণগত বিষয়ের সঙ্গেই জড়িত। কিন্তু একথা বলার অর্থ এই নয় যে ঘটনাবলীর অনুশীলনে গণিতই একমাত্র সম্ভাব্য পদ্ধতি হয়ে উঠছে। গণিত যে সম্পর্কের অনুশীলন করে, যদিও তা বিশুদ্ধ পরিমাণগত বিষয় ছাড়িয়ে যায়, তবুও তা বাস্তব জগতের কতকগুলো সম্পর্ককে অনুশীলন করে মাত্র।

বিষয়গুলোর প্রকৃতি যাই হোক না কেন, গণিত কয়েকটি নির্দিষ্ট ধরনের

সম্পর্কের অনুশীলন করে মাত্র। "দুইকে দুই দিয়ে গুণ করলে চার হয়" গণিতে তা সব সময়েই এক—তা আমরা পরমাণু সম্বন্ধেই বলি বা তরমুজ সম্বন্ধেই বলি।

অন্যান্য বিজ্ঞানেও বিভিন্ন বিষয়ের নির্দিষ্ট প্রকৃতি নির্বিশেষে নানা ধরনের সম্পর্কের অনুশীলন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ব্যাকরণের একটা সাধারণ নিয়ম হল, বাক্যের মধ্যে আপতনিক শব্দ বা বাক্যাংশের উদ্ধৃতিকে (parenthetical) কমা দিয়ে পৃথক করতে হবে, এটা ঐ উদ্ধৃত শব্দগুলো—কবিতা পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা, বাজার দর বা মহাকাশ যাত্রা সম্বন্ধে যা বলতে চায় তার সম্পূর্ণ বিমূর্তন।

এখানে একটা "**বিধিবদ্ধ আকার প্রদান**" (formalisation) পদ্ধতির উদাহরণ দেওয়া হল। এই পদ্ধতির মূল কথা হল, আধেয় যাই হোক না কেন, তার থেকে রূপ বা আকারকে অনুসন্ধানের একটা বিশেষ বিষয় হিসেবে পৃথক করা হয়। এখানে আমরা পাচ্ছি গবেষণার দুটি পদ্ধতির সংযুক্তি—তুলনা ও বিমূর্তন। বিভিন্ন ধরণের বিষয়কে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাদের মধ্যেকার সম্পর্ককে আবিষ্কারের জন্যে, তারপর এই সম্পর্কগুলোকে অন্য-নিরপেক্ষ বিষয় বলে গণ্য করা হয়। এই ধরনের বিষয়ের যোগফলে গড়ে ওঠে আকার বা রূপ, যাকে কখনও কখনও বলা হয় কাঠামো। তাই বিধিবদ্ধ আকার প্রদানের পদ্ধতিকে **কাঠামোগত পদ্ধতিও** বলা হয়।

কাঠামোগত পদ্ধতির সুবিধা এই যে এখানে সম্পর্কের উপাদানগুলোর অনুশীলন (অর্থাৎ এইসব সম্পর্কের দ্বারা যুক্ত বিষয়) থেকে সম্পর্কগুলোর অনুশীলন সহজতর। কারণ সম্পর্কের উপাদানের চেয়ে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের সংখ্যা অনেক কম। শুধু এটুকু কল্পনা করলেই হবে যে, একটা মাটির বলের চাইতে যদি একটা তামার বলের আয়তন বিভিন্ন সূত্র দিয়ে হিসেব করতে হ'ত তাহলে জ্যামিতি অনুশীলনের কাজ কী পরিমাণ কঠিন হয়ে পড়ত।

আধেয়র বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করা কাঠামোগত পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষেত্রকে নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধ করে দেয়। বহু ক্ষেত্রে আমাদের শুধু একটা বিশেষ ধরনের কাঠামোকেই অনুশীলন করতে হয় না, বরং ঐ কাঠামোর অধঃস্তরকেও অনুশীলন করতে হয় অর্থাৎ তার আধেয়কেও উদ্ঘাটিত করতে হয়। অন্য কথায়, কোন বিষয়কে অনুশীলন করতে হয় তার আন্তঃসম্পর্ক সমেত। উদাহরণস্বরূপ, যে সব অংশ দিয়ে বিমান তৈরী হয় তা একটা সম্পর্ক-ব্যবস্থা সৃষ্টি করে। সুতরাং কেউ অংশের বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ বিমূর্তনের মাধ্যমে বিমানের গঠন অনুশীলন করতে পারে না।

সব সময়েই এমন একটা সম্পর্ক থাকে যার মধ্যে বিষয়গুলোর যোগফলের মধ্যে দিয়ে একটা ব্যবস্থা প্রকাশ পায়। এখানেই সিস্টেম বা বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা হিসেবে বিষয়গুলো অনুসন্ধানের সার্বিক বৈশিষ্ট্য।

ভাবমূর্তি নির্মাণ যেমন বিষয়বস্তুর অনুশীলনের ক্ষেত্রে গণিতকে কাজে লাগাতে সাহায্য করে, তেমনি **বিধিবদ্ধ ব্যবস্থাভিত্তিক** দৃষ্টিভঙ্গি নানারকম নির্দিষ্ট বিষয়ে বিধিবদ্ধ ব্যবস্থাভিত্তিক নিয়ম প্রয়োগের সুযোগ দেয়, ব্যবস্থার জটিলতা, তাদের নির্ভরযোগ্যতা ও তাদের উৎকর্ষ ইত্যাদি নির্ধারণ করে। আজকাল বিভিন্ন বিজ্ঞানে বিষয়গুলোকে বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং নানা ধরনের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার নতুন নতুন শাখা গড়ে উঠছে। যেমন সেমিওটিকস (চিহ্ন-ব্যবস্থা বিজ্ঞান), সাইবারনেটিকস (নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিজ্ঞান) ও গেম থিওরী দ্বন্দ্ব-ব্যবস্থার বিজ্ঞান) ইত্যাদি।

২ অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞানলাভের পদ্ধতি

আমরা ভাবায়িত বিষয়, কাঠামো ও বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা রূপে নানা বিষয়ের অনুশীলন পদ্ধতি বিবেচনা করেছি। কিন্তু এই ধরণের অনুশীলনের সাহায্যে ঐ সব বিষয়ের বাস্তব জ্ঞান আয়ত্ত হয় না, সেগুলো কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা থেকে ও তত্ত্বগত অনুশীলনের দ্বারাই পাওয়া সম্ভব। এখন আমরা জ্ঞানের ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার স্তরে যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করব। এই স্তরে বিজ্ঞানে জ্ঞানলাভের মৌল রূপ হল পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ।

পর্যবেক্ষণ করার বিষয়টির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষণই **হল পর্যবেক্ষণ**। আমাদের চারদিকের বিষয়গুলোকে খানিকটা অনুভব করা, প্রত্যক্ষ করা, চিন্তা করা মানুষের দৈহিক প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত এবং তার ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডের সাহায্যে এগুলোকে বিকশিত করে তোলা যায়। উদাহরণস্বরূপ, কোন কাপড়ের কলের রং বিশেষজ্ঞ একজন অনভিজ্ঞ লোকের চেয়ে বেশিসংখ্যক বর্ণবৈচিত্র্য দেখতে পান।

বিজ্ঞান যন্ত্রের সাহায্যে আমাদের প্রত্যক্ষণের এ ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে। কোন বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশকে দেখার যে ক্ষমতা প্রশিক্ষণের ফলে অর্জিত হয়, অনুবীক্ষণ যন্ত্র সেক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তিকে বহু গুণ প্রসারিত করে। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ আকাশকে পর্যবেক্ষণ করে আসছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সূর্যের উপর, বৃহস্পতির উপগ্রহের উপর ও শনির বলয়ের উপর কলঙ্ক দেখতে পায় নি। কিন্তু যখনই গ্যালিলিও তাঁর দূরবীক্ষণ যন্ত্রটিকে আকাশের দিকে তুলে ধরলেন, তক্ষুণি এইসব জিনিস মানবজ্ঞানের আয়ত্তে এসে গেল।

আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ছাড়াও যন্ত্রপাতি যেন আমাদের প্রত্যক্ষ করবার এক বাড়তি অঙ্গ যোগান দেয়। আমরা বৈদ্যুতিক বা চুম্বক ক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করতে পারি না কিন্তু যন্ত্র আমাদের তা করতে সাহায্য করে। প্রত্যক্ষবাদের প্রতিষ্ঠাতা ফরাসী দার্শনিক অগাস্ট কোং তাঁর সময়ে এই অভিমত

পোষণ করতেন যে আমরা কখনই নক্ষত্রের রাসায়নিক গঠন জানতে পারব না, কারণ ওগুলোর কাছে পেঁছনোর কোন উপায় আমাদের নেই ; আমরা চন্দ্রের অদৃশ্য পিঠ সম্বন্ধেও কোনদিন জানব না। বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভাবন নক্ষত্রগুলো কী দিয়ে তৈরী তার অনুসন্ধানে সাহায্য করেছে। এমনকি, এটি পৃথিবীতে হিলিয়াম-এর আবিষ্কারের পূর্বেই সূর্যে তার মৌলিক রাসায়নিক উপাদান আবিষ্কার করেছে। এখন মানুষ চাঁদের অপর পার্শ্বেও প্রবেশাধিকার লাভ করেছে।

আমরা সবাই রামধনু দেখেছি কিন্তু প্রত্যেকটি রামধনুর নিজের বিশেষ বাতাবরণ, নিজস্ব সূর্য-রশ্মির আবক্রপথ, নিজের দিনাঙ্ক ইত্যাদি আছে। কিন্তু কেন আমরা সুনিশ্চিত যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একই ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করছি ? ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ এই সমস্যাকে বিপরীত শক্তির ঐক্য—তাদের স্থায়িত্ব এবং পরিবর্তনশীলতা সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে। অস্থায়িত্বের মধ্যে স্থায়ীকে আবিষ্কার করার পদ্ধতি আলোচনা করে যুক্তিশাস্ত্র। এর মধ্যে সরলতমটি হল তথাকথিত অসামান্য সাদৃশ্য পদ্ধতি (method of unique similarity)। প্রকৃতপক্ষে এটা হল সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি এবং এখানে এসে ব্যাপারটা যা দাঁড়ায়, তাহল পরিস্থিতির চরম বৈচিত্র্য, যার মধ্যে কোন ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, বিজ্ঞানের কাছে পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব তখনই যখন কোন ঘটনার বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটে। কেউ ভাবতে পারে যে, সমধর্মী পরিস্থিতিতেই পর্যবেক্ষণের পুনরাবৃত্তি হওয়া উচিত কিন্তু সেক্ষেত্রে এটা বলা কঠিন হবে যে ঐসকল পরিস্থিতিতে কোন্ বিষয়টির পর্যবেক্ষণের ফলাফল খাটবে। ঐ পরিস্থিতির অন্য উপাদানগুলোকে পরিবর্তিত করেই শুধু অপরিহার্য বিষয়গুলোকে পৃথক করা যায়।

পর্যবেক্ষণের এই বৈচিত্র্যলাভের উপায়গুলো নানারকম হতে পারে। যদি বাছাই করা তথ্যরাশি অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যকে যথেষ্ট পরিমাণে চিহ্নিত করে, তখন তাকেই আমরা বলি প্রতিনিধি স্থানীয় নির্বাচন। প্রতিনিধি স্থানীয় নির্বাচনের জন্যে, আমরা তথ্য সমষ্টিকে জাতি বা নমুনা হিসেবে ভাগ করি (নমুনামূলক বাছাই) অথবা তথাকথিত আকস্মিক সংখ্যার তালিকা (tables of accidental numbers) ব্যবহার করি।

সরল পর্যবেক্ষণের বিপরীত হিসেবে **পরীক্ষণের** পূর্বশর্ত হল অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার মধ্যে সক্রিয় হস্তক্ষেপ (একটি ঘটনার "বিশুদ্ধ আকারে" প্রতিরূপ নির্মাণ করা যেতে পারে, যেমন—কৃত্রিম অবস্থা সৃষ্টি করা ইত্যাদি)। এতে ঘটনার কতকগুলি ধর্ম উদ্ঘাটিত হয় যা স্বাভাবিক অবস্থায় আবিষ্কার করা যেতে পারে না। আধুনিক পরিকল্পনা-পদ্ধতির প্রয়োগ পরীক্ষণকে আরো ফলপ্রসূ ও কম ব্যয়সাধ্য করেছে। পরীক্ষণ হল অন্য কোন বিষয়ের উপর একটা বাস্তব

প্রভাব প্রয়োগ করা। কিন্তু মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনকে মেটান এর উদ্দেশ্য নয় বরং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে আরও অগ্রসর করাই এর লক্ষ্য। মানসিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে-গবেষণা চালান হয়, তা একটা বস্তুর কল্পিত রূপকে কেন্দ্র করে। বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা অনুযায়ী গবেষণার ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পৃথক হতে পারে। ইদানীংকালে, সামাজিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সামাজিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক গবেষণা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ গুণগত বা পরিমাণগত হতে পারে। প্রথমোক্ত ধরনটি আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার গুণ সম্বন্ধে হদিস দেয়। উদাহরণস্বরূপ, জলে একটা পাথর ছুঁড়লে আমরা আবিষ্কার করি যে, কাঠের মত না হয়ে এটি ডুবে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা মোট এইটুকুই জানতে চাই। কিন্তু প্রায়ই একটি জিনিসের পরিমাণগত বিবরণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যার সঙ্গে পরিমাপের প্রশ্নটি জড়িত। সাধারণতঃ একটি বিষয়কে এমন অন্য একটি বিষয়ের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে পরিমাপ করা হয়, ইতিপূর্বে যার পরিমাপ করা হয়েছে। এই ধরনের বিষয়কে বলা হয় মান। মানের সরলতম উদাহরণ হ'ল প্রচলিত মিটার।

পরিমাণ অনেক জিনিসেই আমাদের আত্মমুখিতাকে এড়াতে সাহায্য করে। যেমন কারও কাছে সময় দ্রুতগামী, আবার কারও কাছে তা অন্তহীন মন্দগতি। ঘড়ি দিয়ে সময়ের পরিমাপ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে।

কিন্তু সবকিছুই কি পরিমাপ করা যায়? কতকগুলি জিনিসকে যেন নীতিগতভাবে বাতিল করা যায়। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের বাস্তব অগ্রগতি এমন জিনিসের পরিমাপের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর করে তুলছে, যেগুলোকে এতদিন পরিমাপযোগ্য নয় বলে মনে করা হত। উদাহরণস্বরূপ, সংবাদতত্ত্ব, (theory of information) বিজ্ঞানের একটা নতুন শাখা, যা সংবাদ বা তথ্যের পরিমাণ-পরিমাপের পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলেই গড়ে উঠেছে। নির্ভরযোগ্যতা, জটিলতা ইত্যাদি পরিমাপের পদ্ধতিও আরও বিশদ রূপ নিচ্ছে।

৩ জ্ঞান-বিকাশের পদ্ধতি

এতদিনের প্রচলিত জ্ঞান-বিকাশের পদ্ধতি আধুনিক বিজ্ঞানে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এইসব পদ্ধতির প্রত্যেকটিই কোন এক ধরনের তথ্যের বিপরীত রূপান্তরের নমুনা, যা শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতার স্তরে পাওয়া যায়। এই বিপরীত রূপান্তর নতুন জ্ঞানের জন্ম দেয় অথবা বর্তমান জ্ঞানকে উন্নত করে; সম্ভাব্যতা, অধিকতর সরলতা, আরও কার্যকারিতা ইত্যাদি নতুন নতুন মূল্যবান বৈশিষ্ট্যে একে সমৃদ্ধ করে তোলে।

তথ্যকে অবশ্যই কতকগুলো নিয়ম অনুসারে, অনুমানের সূত্রানুযায়ী রূপান্তরিত করতে হবে। এইসব সূত্র প্রাথমিক তথ্যের সত্যতার উপর রূপান্তরের ফলাফলের সত্যতার নির্ভরতা প্রতিপন্ন করে।

সকল অনুমানকে প্রাথমিক তথ্যের পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভাগ করা যেতে পারে।

যে-অনুমানের মধ্যে সিদ্ধান্ত আশ্রয়-বাক্যে উল্লিখিত বিষয়ের বাইরে যায় না সেটিকে বলা হয় **অবরোহী** (deductive) **অনুমান** অথবা **অবরোহণ**। অবরোহণকে কখনও কখনও আশ্রয়-বাক্যে অন্তর্নিহিত তথ্যকে স্পষ্ট করার জন্যে ব্যবহার করা হয়। এরিস্টটলের সময় থেকে ন্যায় (syllogism) নামে পরিচিত অবরোহী অনুমানগুলোই এর সরলতম রূপ। অবরোহণ বিজ্ঞানকে স্বতঃসিদ্ধ, অনুমানমূলক ও অবরোহণ-পদ্ধতি, গাণিতিক পদ্ধতি ইত্যাদি তত্ত্বগত বিশ্লেষণের কার্যকর পদ্ধতি দিয়েছে।

স্বতঃসিদ্ধ পদ্ধতির সারমর্ম হ'ল এই যে, যেসব বৈজ্ঞানিক প্রতিজ্ঞা প্রাঞ্জলভাবে সার্বিক, সুস্পষ্টভাবে স্বতঃসিদ্ধ অথবা অন্য কোন জ্ঞান নির্দেশক বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত, সেগুলোকেই স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরা হয়, এগুলোর কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। তখন তর্কশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী ঐগুলো থেকে অন্য প্রতিজ্ঞা টানা হয়। স্বতঃসিদ্ধ পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্র প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল গণিতে কিন্তু এই পদ্ধতি আজকাল পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, এমনকি ভাষাতত্ত্বের মত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঢুকে পড়ছে।

অনুমানমূলক-অবরোহ (hypothetical-deductitive) পদ্ধতি স্বতঃসিদ্ধ পদ্ধতির সঙ্গে তর্কশাস্ত্রগতভাবে ঘনিষ্ঠ কিন্তু তাদের পার্থক্য তত্ত্বগত প্রতিজ্ঞার মধ্যে নয়, বরং পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক উপাত্তের (data) সামগ্রিকতা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সকল উপাত্তকে ব্যাখ্যা করার জন্যে অনুমান উপস্থাপিত করা হয়, এই থেকে অবরোহণ পদ্ধতিতে জ্ঞান সৃষ্টি হয়, যা শুধু নিছক অভিজ্ঞতাজাত প্রকৃতির নয়। নিউটনীয় বলবিদ্যার সূত্র থেকে এটা বেরিয়ে এল যে পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার নয়, যা থেকে নিউটন নিজের সূত্র-গুলোকে সন্দেহ করতে শুরু করলেন। কিন্তু এটা দেখা গেল যে, তাঁর সূত্র নির্ভুল ; কারণ নতুন এবং আরও যথাযথ পরিমাপের মধ্যে দিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হ'ল যে, পৃথিবী ঠিক গোল নয় বরং কমলালেবুর মত উত্তর ও দক্ষিণে চাপা অথবা আবর্তনের উপবৃত্ত।

যদি কোন প্রকল্প একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যা প্রারম্ভিক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের (অভিজ্ঞতার উপাত্ত) বিরোধী, তার অর্থ হ'ল, হয় প্রকল্পটি কোনদিক থেকে ভুল, না হয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান যথাযথ নয়। উদাহরণস্বরূপ, তাপের ক্যালরিতত্ত্ব (তাপ হল তরল) খণ্ডিত হয়েছিল কারণ এটা পরীক্ষালব্ধ উপাত্তের সঙ্গে মিলছিল না।

কিন্তু, যদি অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অপরিবর্তনীয় থাকে, তাহলে এর সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন প্রকল্পকেই বাতিল ও পরিবর্তন করতে হবে। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা কোন প্রকল্প সমর্থিত হওয়া, বিশেষতঃ এর ভিত্তিতে নতুন ও ইতিপূর্বে অজ্ঞাত তথ্যের সম্বন্ধে পূর্বাভাস, যা পরবর্তীকালে সমর্থিত হয়, প্রকল্পের সত্যতার পক্ষে একটা যুক্তি। কিন্তু এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, যদি কোন প্রকল্প থেকে টানা সিদ্ধান্ত অভিজ্ঞতার উপাত্তের সঙ্গে মিলে যায়, তা থেকে অনিবার্যভাবেই মনে করা যায় না যে, এই সিদ্ধান্তগুলো সত্য। এইভাবে দেখা যায়, প্রকল্প প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশের একটি রূপ।

অবরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা যে-জ্ঞান আয়ত্ত করি তা আশ্রয়-বাক্যের মধ্যে পূর্বেই নিহিত ছিল। অবরোহাত্মক অনুমানের প্রক্রিয়ায় এই জ্ঞান একটা নতুন বৈশিষ্ট্য লাভ করে, যা ব্যবহারিক কাজকর্মে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—এখানে এটা সচেতন জ্ঞানে পরিণত হয়। ইউক্লিদীয় জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধগুলোর মধ্যে এর সব উপপাদ্যের অর্থ নিহিত রয়েছে—এর অর্থ এই নয় যে, যিনি এই স্বতঃসিদ্ধগুলোকে জানেন তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপপাদ্যগুলোকেও জানেন। এটা যদি এই রকমই হ'ত, তাহলে ওগুলোকে আর প্রমাণ করার প্রয়োজন থাকত না। আর্কিমিডিসের প্লবতার সূত্র প্রাচীন গ্রীস দেশে আবিষ্কৃত হয়েছিল কিন্তু ভাসানোর সময় জাহাজ জলের কতটা ভেতরে ডুববে তার হিসেব করতে জাহাজ নির্মাতাদের বহু শতাব্দী কেটে গিয়েছিল।

জ্ঞাত তথ্য এবং সাধারণ প্রতিজ্ঞা থেকে বিশুদ্ধ অবরোহাত্মক উপায়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করা যেতে পারে। ফরাসী বৈজ্ঞানিক লেভেরিয়ারের নেপচুন গ্রহ আবিষ্কার এর একটি উদাহরণ।

অন্য ধরনের অনুমান **আরোহাত্মক অনুমান** বা **আরোহ** হ'ল অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যের নতুন বিষয়ে প্রসারণ। আক্ষরিক অর্থেই আমরা প্রতি পদক্ষেপে আরোহ পদ্ধতি ব্যবহার করি। উদাহরণস্বরূপ, একজন লোকের প্রবল জ্বর হয়েছে, শরীরের তাপ নিয়ে আমরা এটা জানতে পারি। আমরা এর থেকে এই সিদ্ধান্তে পেঁছাই যে, তাপ নেবার আগেই তার দেহে বেশি তাপ ছিল।

আরোহাত্মক অনুমানের আশ্রয়-বাক্যের সহায়ক জ্ঞান সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যখন প্রশ্ন করতে শুরু করেন, তখনই আরোহের সমস্যা সৃষ্টি হয়। বস্তুবাদ সব সময়ই বলে এসেছে যে, এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে আমাদের জ্ঞানের ইন্দ্রিয়গত উৎসে। যার দ্বারা অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞানলাভ হয় আমরা ইতিপূর্বেই সেই পর্যবেক্ষণ ও পরীবেক্ষণের পদ্ধতি বিচার করেছি। এই ধরনের জ্ঞানে সামান্যীকরণের প্রয়োজন হয়। অনেক নৈয়ায়িক, বিশেষতঃ পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের প্রবল বিকাশের যুগে এমন যৌক্তিক পদ্ধতি অনুসন্ধান করেছিলেন যার দ্বারা ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের উপাত্ত থেকে সাধারণ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রতিজ্ঞার দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

নিম্নোক্ত উদাহরণটা বিচার করা যাক। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেকদিন আগেই সৌর-কলঙ্কের আবির্ভাবের পৌনঃপনিক পর্যায়কালীন পরিবর্তন সম্বন্ধে তালিকা রচনা করেছিলেন। এই সব তালিকা মিলিয়ে চিত্তাকর্ষক সমাপতনগুলোকে তারিখ সমেত লিপিবন্ধ করা হয়েছিল যা মেরুজ্যোতি (Aurona Borealis) আবির্ভাবের পৌনঃপৌনিকতাকে প্রতিপন্ন করেছে। হালে আরও চিত্তাকর্ষক সমাপতন লিপিবন্ধ করা হয়েছে। হৃদযন্ত্র বিকল হওয়ার ফলে বাৎসরিক মৃত্যুর হারের পরিবর্তন এমন একটা ঘটনা, যার সঙ্গে মনে হয় সৌর ক্রিয়ার কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু তা সৌর-কলংকের আবির্ভাবের পৌনঃপনিকতার সঙ্গে মেলে। তাই সাদৃশ্যযুক্ত পরিবর্তনের পদ্ধতিতে এটা সিদ্ধান্ত করা কঠিন নয় যে, এই ধরনের ঘটনা এবং সৌর ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক থাকতে পারে।

আরোহাত্মক অনুমানের সরলতম রূপ হল গণনার সাহায্যে আরোহী পদ্ধতিতে বিচার। এই পদ্ধতির এক শ্রেণীর ঘটনার সম্বন্ধে অনুমান করা হয় সেই শ্রেণীর অনেকগুলো পৃথক পৃথক ঘটনার পরীক্ষা থেকে। এই আরোহী পদ্ধতি থেকে যে প্রতিজ্ঞা পাওয়া যায় তা নির্ভরযোগ্য নয়, কারণ ওগুলো আমাদের তথ্যগত আশ্রয়-বাক্যের সূত্রের বাইরে নিয়ে যায়। কিন্তু ওগুলোর মধ্যে কিছুটা আপাত সম্ভাব্যতা থাকে। এটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়। সম্ভাব্যতার তত্ত্বের ভিত্তিতে আধুনিক তর্কবিদ্যা এমন পদ্ধতিকে বিশদ করে তুলেছে—যা আরোহী পদ্ধতিতে অনুমানের সম্ভাব্যতার মাত্রা প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হয়। একটি তথাকথিত সম্ভাব্যতার তর্কবিদ্যা গড়ে তোলা হয়েছে যা আধুনিক আরোহ তত্ত্বের ভিত্তি।

সম্ভাব্যতা-তত্ত্বের প্রতিজ্ঞাগুলোও আর একটি পরীক্ষালব্ধ উপাত্ত বিশ্লেষণের পদ্ধতির ভিত্তি গড়ে তুলেছে। এটা **পরিসংখ্যান পদ্ধতি**—যা আরোহ পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত। আরোহী অনুমানের আশ্রয়বাক্যে আমরা স্বতন্ত্র তথ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আর সিদ্ধান্ত হ'ল সাধারণ অবধারণ, সেখানে পরিসংখ্যান পদ্ধতি বিপুলসংখ্যক ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের মধ্যে পরিমাণগত, সংখ্যাগত সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

আজকাল পরিসংখ্যান পদ্ধতি পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি নানা ধরনের বিজ্ঞানে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এগুলো বিশেষভাবে সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। লেনিন এই ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। একটা বিশেষ গাণিতিক তত্ত্ব (গাণিতিক পরিসংখ্যান) আছে যার স্থিরীকৃত শর্তগুলো পরিসংখ্যানগত গবেষণাকে আরও যথাযথ করে তুলতে সাহায্য করে।

এঙ্গেলস তাঁর সময়ে বলেছিলেন যে, আরোহ ও অবরোহ সবরকমের অনুমানের ব্যাখ্যা দেয় না।[১] **উপমা প্রদর্শন** (Analogy) আর একটি

১. এফ. এঙ্গেলস, ডায়ালেকটিকস অব নেচার, ২২৬-২৭ পৃঃ।

মূল্যবান পদ্ধতি। উপমাকে কখনও কখনও অনুমান হিসাবে ধরা হয় যা একটি জিনিসের গুণকে অপরটিতে আরোপ করে, নিছক এই কারণেই যে দুটি বিষয়ের মধ্যেই কতকগুলো অভিন্ন দিক আছে। মঙ্গলগ্রহে বসতি আছে বলে ধরা হয় এই ভিত্তিতে যে কিছু অনুরূপ বৈশিষ্টযুক্ত আরেকটি গ্রহ পৃথিবীতেও বসতি আছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে এই ধরনের অনুমানের প্রয়োগ আপেক্ষিকভাবে সীমাবদ্ধ। প্রায়ই উপমা তুলনীয় ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে প্রকাশিত অভিন্ন সম্পর্কের ভিত্তিতে আরও বেশি অনুমান করার ইঙ্গিত দেয়। উদাহরণস্বরূপ, বোর ও রাদারফোর্ড পরমাণুর গ্রহগত নক্সা (সৌরজগতের কাঠামোর উপমা থেকে পরমাণুর গঠন বিন্যাস) তৈরি করতে এই ধরনের অনুমান ব্যবহার করেছিলেন। পদটির ব্যাপকার্থে, উপমা থেকে অনুমান করাকে কোন বিষয়ের (মডেলের) অনুসন্ধানের মাধ্যমে লব্ধ তথ্যে অন্য বিষয় বা অনুরূপ বিষয়ে (বা আসলে) প্রসারিত করা হিসাবে সংজ্ঞা দেওয়া যায়। এই ধরনের অনুমান করার অনেক ভিত্তি থাকতে পারে, যথা সাধারণ ধর্মের উপস্থিতি অথবা মডেল এবং অবিকল প্রতিরূপের উপাদানগুলোর মধ্যেঅনুরূপতা (isomorphism)। যেহেতু উপমা থেকে অনুমান জ্ঞান-প্রক্রিয়ায় মডেল ব্যবহারের জন্যে যুক্তিশাস্ত্রসম্মত ভিত্তি গড়ে তোলে, সেহেতু আমরা দুটো ভিন্ন পদ্ধতি—উপমা ও মডেলিং নিয়ে বিচার করছি না বরং করছি একটা পদ্ধতিকে নিয়ে অর্থাৎ উপমা-মডেলিং নিয়ে, যাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায়।

নমুনারূপ বা মূর্তি (মডেল) ও অবিকল প্রতিমূর্তির ভৌত (physical) প্রকৃতি অনেকটাই পৃথক। প্রথমতঃ এগুলো বিভিন্ন পদার্থে গঠিত বস্তু হতে পারে। এই ধরনের নমুনা-মূর্তি প্রযুক্তিবিদ্যায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। আসোয়ান বাঁধের আচরণ কী হবে—ওটা যথেষ্ট নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য হবে কিনা, তার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করার জন্যে খুবই ছোট্ট একটা বাঁধের নমুনা-প্রতিমূর্তি তৈরি করা হ'ল, যাতে প্রতিফলিত হ'ল অবিকল মূর্তি বা আসলে জিনিসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো।

পরীক্ষা করার নমুনা-প্রতিমূর্তি থেকে লব্ধ ফলাফলকে চালান করা হয় অবিকল মূর্তিতে এবং যন্ত্রবিজ্ঞানে নমুনা মূর্তির ব্যাপক ব্যবহার দেখিয়ে দিচ্ছে যে এই উপায়ে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় তা নির্ভরযোগ্য। একটা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নমুনা-মূর্তি তার অবিকল প্রতিমূর্তির সঙ্গে আকৃতিতে সাদৃশ্যযুক্ত কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই একটি নমুনা-মূর্তি ও অবিকল প্রতিমূর্তির মধ্যে কোন রকমের বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, একটি রেলসেতুর নমুনা-মূর্তি এমন একটা কিছুর দ্বারা করা হয় না যার সঙ্গে স্থানগত কোন মিল আছে বরং এটা করা হয় একটা প্রতিবন্ধ গঠিত বৈদ্যুতিক-বর্তনী (electronic circuit consisting of resistances) বৈদ্যুতিক আবেশনযুক্ত তার-কুণ্ডলী (inductive coils) এবং তাড়িতধারকত্ব দিয়ে (capacities)।

আমরা একটা বাস্তব পদার্থকে নমুনা-মূর্তি হিসাবে ব্যবহার করতে পারি যার অবিকল প্রতিমূর্তি হ'ল একটা আকারগত তাত্ত্বিক নক্সা (formal theoretical pattern)। তাই অবরোহাত্মক চিন্তার নক্সাকে গণকযন্ত্রে (computer) পুনঃরূপায়ণ করা যায় এবং তখন গণনকযন্ত্রের কাজ এই চিন্তার নমুনা-মূর্তিতে পরিণত হয়। এই ধরনের নমুনা-মূর্তির সাহায্যে তথ্য লাভ মানব চিন্তার আসল প্রক্রিয়াকে কতক পরিমাণে অপসারিত করে। অন্যদিকে, একটি নমুনা-মূর্তি প্রায় বিমূর্ত নক্সার আকার ধারণ করে, যেখানে অবিকল প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়ায় তার সকল গুণ ও বৈচিত্র্যসহ প্রকৃত বস্তু। উদাহরণ-স্বরূপ, এই ধরনের নমুনা মূর্তি ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হয় ভাষাতত্ত্বে, যেখানে অবিকল প্রতিমূর্তি হ'ল ভাষার মূর্ত আকার আর নমুনা-মূর্তি হ'ল এইসব তথ্যের সামান্যীকৃত বিভিন্ন ধরনের আনুষ্ঠানিক গঠন। অর্থশাস্ত্রের গাণিতিক নমুনা-মূর্তিগুলোও এই ধরনেরই। এগুলো উদ্দিষ্ট অর্থনৈতিক ঘটনার কেবল সেই দিকগুলোকেই প্রতিফলিত করে যা বিশেষ কতকগুলো দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

শেষে, তুলনীয় দুটি বিষয়—নমুনা-মূর্তি এবং অবিকল প্রতিরূপ-এই দুটি তুল্য বিষয়ই তাত্ত্বিক গঠন সম্পন্ন হতে পারে। এটা ঘটে তখনই যখন আমরা, ধরা যাক তর্কবিদ্যা ও বীজগণিতের মধ্যে অথবা নানা ধরনের ভৌত বা গাণিতিক তত্ত্বগুলোর মধ্যে, একটা উপমান খুঁজি।

যে শর্তে উপমা থেকে অনুমান সঠিক, যে শর্তগুলো কতকগুলো ঘটনার অনুসন্ধানে সামঞ্জস্যপূর্ণ নমুনা-মূর্তি ব্যবহারের যথার্থতা প্রতিপাদন করে, সেটা অত্যন্ত বাস্তব গুরুত্বসম্পন্ন।

অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই উপমা থেকে অনুমানের নির্ভরযোগ্যতাকে উন্নত করে তোলার শর্তাদিকে সবিস্তারে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। তাই, যেখানে নমুনা-মূর্তি এবং অবিকল প্রতিমূর্তিকে গাণিতিক সমীকরণে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে সাদৃশ্যতত্ত্ব বলে পরিচিত একটা বিশেষ বিদ্যা গড়ে উঠেছে,—যা ভৌত ঘটনার সদৃশতার আবশ্যকীয় ও যথেষ্ট শর্তাদির সংজ্ঞা নির্ণয় করছে। কিন্তু আবার অনেক ক্ষেত্রে উপমা থেকে অনুমানের সঠিকতার শর্তাদির সংজ্ঞা নির্ণয়ের সমাধান বাকি আছে।

জ্ঞান-প্রক্রিয়া সমেত যে-কোন প্রকারের মানব ক্রিয়াকাণ্ডকে বিভিন্ন উপাদানে ব্যবচ্ছেদ করা যায়। জ্ঞান-প্রক্রিয়ার এইসব উপাদানের সরলতম হ'ল এইসব মানসিক ক্রিয়া যথা—তুলনা, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ বিমূর্তন ও মূর্তন। এই উপাদানগুলোই আরও জটিল জ্ঞান-ক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে গড়ে তোলে। এগুলো আমরা উপরে আলোচনা করেছি।

বিজ্ঞানের প্রাথমিক ব্যবহারিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আয়ত্ত করা যেতে পারে। কিন্তু, অন্ততঃপক্ষে সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির

পর্যায়ে শুধু ব্যবহারিক অনুশীলনই বৈজ্ঞানিক গবেষণার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তত্ত্বগত অনুশীলনও একান্ত প্রয়োজন। এমন কতকগুলো নিয়ম আছে যা আমাদের ভ্রান্ত ফলাফলকে এড়াতে সাহায্য করে। এবং এইভাবে গবেষণা পদ্ধতির দক্ষতা অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। গ্রীক দর্শনে অবরোহণের খুব মামুলি নিয়মগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এরিস্টটল এবং স্টোইকরা। প্রতীকী তর্কবিদ্যা অবরোহণাত্মক যুক্তির আর জটিল নিয়ম গড়ে তুলেছে। আমাদের আলোচিত উপমা-নমুনা-মূর্তি গঠনের পদ্ধতির ও নিয়ম আছে। সমকালীন তর্কবিদ্যা তা সাফল্যের সঙ্গে সম্প্রসারিত করছে।

অধিবিদ্যা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-প্রক্রিয়ার কতকগুলো কৌশল ও পদ্ধতিকে—অন্য সবগুলোর বিপরীতে একমাত্র সঠিক বলে চরম মনে করে। এঙ্গেলস তাঁর সময়ে যে সব অধিবিদ্যাপন্থীকে "সর্বাত্মক আরোহবাদী" আখ্যা দিয়েছিলেন তাঁরা আরোহের ভূমিকাকে বাড়িয়ে দেখেন আর অন্য "সর্বাত্মক অবরোহবাদী"রা কেবলমাত্র অবরোহাত্মক যুক্তিকেই গ্রাহ্য করেন। কেউ বিশ্লেষণের ভূমিকাকে বাড়ান, কেউবা সংশ্লেষণের।

ভাববাদী দার্শনিকরা জ্ঞান-প্রক্রিয়াকে প্রয়োগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন এবং এই তথ্যকে অগ্রাহ্য করেন যে, এটা বস্তুজগৎকে প্রতিবিম্বিত করে। কিন্তু কেবলমাত্র প্রতিবিম্ব সূত্রই চিন্তার সঙ্গে সত্তার সামঞ্জস্যকে ব্যাখ্যা করে—যা আধুনিক বিজ্ঞান যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রমাণ করেছে।

বস্তুবাদী ডায়ালেকটিকস চিন্তার প্রকৃতির বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এবং বিপরীতের ঐক্য ও সংঘাতের নিয়ম থেকে অগ্রসর হয়ে মানব চেতনায় বাস্তবতার প্রতিবিম্ব প্রক্রিয়ার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিকে যুক্ত করে। বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ, বিমূর্তন ও মূর্তন, আরোহ ও অবরোহ ইত্যাদি পরস্পরের বিপরীত। কিন্তু যদিও এরা বিপরীত তবুও ওগুলো অচ্ছেদ্য ডায়ালেকটিক ঐক্যের মধ্যে রয়েছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-প্রক্রিয়ার এই সব পদ্ধতির যে কোনটির কাজকে কেবল অন্য পদ্ধতির প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত করেই উপলব্ধি করা সম্ভব এবং কতগুলো অবস্থায় প্রত্যেক পদ্ধতিই তার বিপরীতে উপনীত হয়—এইসব সূত্রের মধ্যেই এই ডায়ালেকটিক ঐক্য প্রকাশ পায়।

পরিভাষা

অভিজ্ঞতাবাদ—Empiricism
অনুমান—Inference
অনির্দেশ্যবাদ—Indeterminism
অসার, অসারাত্মক—Inessential
অন্তর্নিহিত, সহজাত—Inherent
অধিবিদ্যা—Metaphysics
অতীন্দ্রিয়বাদ, রহস্যবাদ—Mysticism
অবৈর—Non-antagonistic
অবৈর দ্বন্দ্ব— „ Contradiction
অনুরূপতার সূত্র—Principles of Correspondence
অভিজ্ঞতাপূর্ববাদ—A priorism
অজ্ঞাবাদ—Agnosticism
অনুনাদ কণা—Resonances
অস্মিতাবাদ—Solipsism
অদ্বৈতবাদ—Monism
অণু—Molecule
আত্তীকরণ, আত্মস্থকরা—Assimilation
আকস্মিকতা—Chance
আধান—Charge
আধেয়, বিষয়বস্তু—Content
আকারগত তর্কবিদ্যা—Formal Logic
আবশ্যকতা—Necessity
আলোক-বৈদ্যুতিক—Photoelectric
ইতিবাচক, ধনাত্মক—Positive
ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ—Sense-perception
উল্লম্ফন Leap
উপস্থাপন, তত্ত্ব—Thesis
উপমা প্রদর্শন—Analogy
ঋণাত্মক, নেতিবাচক—Negative
কোষ, জীবকোষ—Cell
কার্য-কারণ সম্পর্ক—Causality
কেলাস—Crystal
কার্য, পরিণাম—Effect
কেন্দ্রক—Nucleus
গতিশীল বস্তু—Matter in motion
গুণ—Quality
গুণগত পরিবর্তন—Qualitative Change
ঘটনা, পরিদৃশ্যমান জগৎ—Phenomenon
ঘূর্ণন—Spin
চিরায়ত, সাবেক—Classical
চক্রাকার—Cyclical
চৈতন্য, চেতনা—Consciousness
জ্ঞান—Cognition
জৈব সংস্থিতি—Organic System
জ্ঞান-তত্ত্ব—Theory of Knowledge, Epistemology
জ্ঞান-তন্ত্র—System of Knowledge
জ্ঞানেন্দ্রিয়—Sense-organ
জ্ঞাতা, বিষয়ী—Subject
তথ্য, উপাত্ত—Data
তথ্য, সংবাদ—Information
তড়িচ্চুম্বকীয়—Electro-magnetic

তেজোবাদ—Energism
দ্বন্দ্ব, বিরোধ—Contradiction
দর্পণ-প্রতিবিম্ব—Mirror-image
দ্বৈতবাদ—Dualism
দ্বৈতবাদী—Dualist
দেহ-মন সমান্তরালবাদ—Psycho-physical Parallelism
দ্রব্য, পদার্থ, বস্তু-সত্তা—Body
দেশ ও কাল—Space and Time
ধর্ম—Property
ধারণা, প্রত্যয়—Concept
ধ্রুবক—Constant
নিরবচ্ছিন্নতা—Continuity
নিরবচ্ছিন্নতা ও ছেদ—Continuity and Discontinuity
নির্দেশ্যবাদ—Determinism
নিয়ম, সূত্র—Law
নিয়মানুগ—Law-governed
নেতিকরণের নেতিকরণ—Negation of Negation
নিয়ম, সূত্র, নীতি—Principle
নিরপেক্ষ পরাবর্ত—Unconditioned Reflex
নির্জ্ঞান—Unconscious
নির্ণায়ক—Criterion
পরাবর্ত—Reflex
পরম, নিরপেক্ষ—Absolute
পরম ভাব, নিরপেক্ষ ধারণা—Absolute Idea
প্রত্যুপস্থাপন—Anti-thesis
প্রকল্প—Hypothesis
প্রতিরূপ, ভাবমূর্তি—Image
পক্ষাবলম্বন—Partisanship
প্রত্যক্ষণ—Perception
পর্যাবৃত্ত তালিকা—Periodic Table
প্রত্যক্ষবাদ—Positivism
প্রয়োগ—Practice
প্রয়োগবাদ—Pragmatism
প্রতিজ্ঞা—Proposition
প্রতিবিম্ব, প্রতিফলন—Reflection
প্রাণবাদ—Vitalism
বিমূর্ত—Abstract
বিপরীত কণা—Anti-particle
বাহ্যরূপ—Appearance
বৈরভাব, বৈরিতা—Antagonism
বৈরদ্বন্দ্ব—Antagonistic Contradiction
বিচ্ছিন্নতা, ছেদ—Discontinuity
বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র—Electric field
বস্তুবাদ—Materialism
বলবিদ্যা—Mechanics
বিষয়, বস্তু—Object
বিষয়গত, বিষয়মুখ—Objective
বাহ্যসত্তা, চেতনা-নিরপেক্ষ বস্তু-জগৎ—Objective Reality
বিষয়গত সত্য—Objective Truth
বিকাশের সর্পিল কুণ্ডলী—Spiral of Development
বস্তুরূপ গঠন—Objectification
বিশেষ—Particular
ব্যবস্থা, সংস্থিতি—System
বিকিরণ—Radiation
বিষয়ীগত, আত্মমুখী, আত্মগত—Subjective
বিষয়ীগত ভাববাদ, আত্মগত ভাববাদ—Subjective Idealism
বর্ণালী—Spectrum
বস্তু-স্বরূপ—Thing-in-itself
বিপরীতের ঐক্য—Unity of Opposites

ভর—Mass
ভরবেগ—Momentum
ভরবেগের ভ্রামক—Moment of Momentum
ভাববাদ—Idealism
মূল প্রত্যয়—Category
মূর্ত, বাস্তব—Concrete
মাত্রা—Dimension
মিথস্ক্রিয়া—Interaction
মৌল কণা—Elementary Particle
মেঘ-কক্ষ—Cloud Chamber
রূপ, আকার—Form
শর্ত, অবস্থা—Condition
শক্তির নিত্যতা—Conservation of Energy
শব্দার্থ বিদ্যা - Semantics
সংজ্ঞা—Definition
সত্তা—Being
সারসত্তা, মর্ম—Essential
সারাত্মক, মৌলিক—Essence
সামান্য. সাধারণ—General
সামান্যীকরণ—Generalisation
সংযোগের অপেক্ষক—Functional Connection
স্বজ্ঞা—Intuition
স্বতন্ত্র, স্বকীয়—Individual
সমরূপতা—Isomorphism
সূক্ষ্মকণার জগৎ—Micro-World
সন্ধিস্থল, সন্ধিরেখা—Nodal Line
সম্ভাব্যতা—Probability
সিদ্ধান্ত—Judgment
সংবেদন—Sensation
সংশ্লেষণ—Synthesis
স্থিতি-ভর—Rest Mass
সংশয়বাদ—Scepticism
সম্প্রদায়—School
সুষমা—Symmetry
সার্বিক, বিশ্বজনীন—Universal
সাপেক্ষ পরাবর্ত—Conditioned Reflex
স্থানাংক—Co-Ordinates
সত্যাখ্যান—Verification
সারসংগ্রহবাদ—Eclecticism
ক্ষয়—Decay
ক্ষুদ্রকণা, সূক্ষ্মকণা—Micro-Particle

———